দুই নদীর তীরে

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ভাদ্র,
১৮৮২ শকাব্দ

৬·৭৫ নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

এই উপন্যাসটির প্রথমাংশ 'অলসমায়া' নামে 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।—ভৌগোলিক দুই নদী নারীমনের দুই ধারার সমান্তরালবর্তিনী।

লেখিকা

গঙ্গার জল গেরুয়া, আর টেমসের জল ধূসর। দুই নদীরই তীরে তীরে, ইটপাথরে ইস্পাতে লোহায় গড়া রাজধানী। ছোট দেশখণ্ডটুকু দ্রুত ধাবমান কালখণ্ডগুলিকে দ্রুততর গতিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছে। টেমসের তীরে ঝাপসা কুয়াশা স্থবিরের মত অচল অনড়। বাতাসে মৃত্যুর মত শীতল স্পর্শ। শুধু মানুষের মনের মধ্যে উদ্দাম গতিবেগ। তার রক্তে উত্তাল প্রাণের তরঙ্গ। তার বুদ্ধিতে বেগের ঘূর্ণিপাক। এই বেগের ঘূর্ণিতে, অথবা ঘূর্ণির বেগে, ঘন হয়ে জমে উঠছে বস্তুরাশি। যেমন করে আদিকালে গতির ঘূর্ণাচক্রে বাষ্পরাশি জমে উঠেছিল জড় পৃথিবীতে। তবু জমে যায় নি। কঠিন জড়ের অন্তরে ছিল সেই গতির শক্তি। সেই উদ্দাম শক্তি ক্রমবিবর্তনে ঘুরে ঘুরে ছুটে চলেছিল।

"জড় প্রাণ পেয়েছিল জীবনে। সেই প্রাণশক্তি আজও এই জড়বিশ্বকে, এই জড়দেহকে বাসনার প্রচণ্ড ঝড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে লাটিমের মত ঘোরাচ্ছে। এই শক্তি এই প্রাণের গোড়ায় জড়—আবার জড়ের গোড়ায় শক্তি।"

—"কে বললে—ও দুটো একটা অন্যটার আগে পরে? জড় ও শক্তি চিরকাল আছে একই সঙ্গে। সেই বাষ্পীয় আদি পৃথিবীর অন্তরেই ত ছিল শক্তির ঘূর্ণি। শক্তি ও জড় একই সঙ্গে মেতেছে এই বিশ্বলীলায়। যেমন করে প্রণয়লীলায় মিলেছে পুরুষ ও নারী। এই যে তোমার হাতে মিলেছে আমার হাত, আর একটা অদ্ভুত সুখ আমার শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে, এই যে দুই দেহের সংঘাতে অদেহী মাধুর্য ফুটে উঠেছে, একে তুমি কি বলবে?"

—"এই ত প্রমাণ, শক্তির গোড়ায় জড়। এই মাধুরীর গোড়ায় এই দুই জড়দেহের সম্মিলন।"—

—"আবার তারও গোড়ায় যে এক বাসনার শক্তি দুই বিচ্ছিন্ন দেহকে একসঙ্গে মিলিয়েছে? এক এবং দুই একসঙ্গেই আছে এই বিশ্বতত্ত্বে।"

—"কিন্তু, শুনেছি তোমাদের সেই কি বলে জানি,—অদ্বৈতবাদ, তাতে কেবল নাকি একতত্ত্বকেই মানে—এক আত্মা।—হাসছ যে।"

—"কই হাসছি।"

—"ওই ত হাসছ। তোমার চোখ হাসছে, তোমার ঠোঁট হাসছে, তুমি আমায় ঠাট্টা করছ। কেন?"

—"চল কোথাও একটু চা খেয়ে আসি। ঠাণ্ডাটা বেশ জমে আসছে।"

—"না আমি যাব না। আগে বল, কেন তুমি হাসলে? কেন তুমি ঠাট্টা করলে?"

—"তোমায় রাগাব বলে।"

—"কেন?"

—"তা হলে তুমি বুঝবে কাকে বলে এক আত্মা, কাকে বলে দুই।"

—"কি করে? না না, অমন করে চেয়ে চেয়ে শুধু হেসো না।—হাসি দিয়ে আমাকে ভোলাবে? আসলে তুমি ভীরু!"

—"ভীরু?"

—"নয়ত কী! তোমার যত সাহস সব কথায়,"—মেরী হেসে উঠল। —হাসি দিয়ে হাল্কা করে উড়িয়ে দিতে চাইল সত্যিকথার ভার। কুমারও হাসল,—"শুধু কথায়?"

—"নিশ্চয়ই, কাজে তুমি একটি পুরোদস্তুর কাওয়ার্ড। মুখেই বল, ভালবাসো,—কিন্তু তোমার কাছে একটা চুম্বন আদায় করতে আমাকে একমাস অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

পূর্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো কুমার!—"মাত্র একমাস?"—কে ভেবেছিলো মাত্র এক মাসের মধ্যে কুমার একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতে পারে।

মেরী বলল,—"সত্যি বল?" কুমারের চোখ নীরব স্বীকৃতিতে ওর চোখে চেয়ে হাসতে লাগল।

—"মুখে এত দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর যে, শুনে মনে হয়, তুমি হ্যাভলক এলিসের চেয়েও পণ্ডিত।—কিন্তু আজ অবধি তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখোনি।"

—"এটা বাজে কথা," কুমার বললে,—মেরী, তুমি জানো না, আমি তোমাকে দেখেছি,—আমি তোমাকে চিনি।"

—"কি চেন শুনি?"

—"চিনি, তুমি নারী,—জানি তুমি ভালোবাসো।" কুমারের আধশোয়া মূর্তির গায়ে হেলান দিয়ে মেরী বললে,—"ভালোবাসার তুমি কি জানো কুমার? প্রেমের তুমি কি বোঝ? তুমি নিজেই তো স্বীকার করেছ যে, আগে আর কখনো প্রেমে পড়োনি।"

—"তবু, প্রেমের কল্পনায় আমার যৌবন দীপ্ত হয়েছিল বলেই, তোমায় দেখামাত্র চিনতে পারলুম। কিন্তু এখনো আমি প্রেমের ওপরতলায় আছি মৌরী, সবে তার প্রথম ধাপটিতে এসে দাঁড়িয়েছি,—ঘাট থেকে নেমে সবে জল ছুঁয়েছি মাত্র।"

—"উঃ কথায় তোমার সঙ্গে কে পারবে?"

—"জানো আমাদের কবি বলেছেন,—প্রেম যেন নদী,—যদি তীরে বসে শুধু চেয়ে থাক, সেও একরকমের সুখ। যদি ঘট ভরে নিতে চাও গৃহকাজের জন্যে তবে তাও পাবে। আর যদি স্নান করতে চাও, তো এসে গা ভাসিয়ে দাও।"

—"রাখো রাখো", ওকে কথা শেষ করতে দিল না মেরী।—"যেমন তুমি, তেমনি তোমার কবি।—এতে প্রাণ কোথায়?—কোথায় বাঁচার তাগিদ। রক্তমাংসের দাবী নিয়ে যে প্রেম এসে হানা দেয়,—তার ক্ষুধা মেটাবার মত শক্তি নেই তোমার কবির।"

কুমার দ্বিধাভরে ভাবতে চেষ্টা করে,—কথাটা হয়ত সত্যি। ঠিক এদিক দিয়ে আগে কখনো ভাবেনি কুমার। কিন্তু রক্তমাংসের মধ্যে থেকে যে প্রচণ্ডতার জন্ম, সুখাদ্য দিয়েই তো তাকে তৃপ্ত করতে হয়। রক্তমাংসের ক্ষুধা তো রক্তমাংসে মেটে না। কিন্তু তর্ক করতে ইচ্ছে হোল না কুমারের। তখন ওর সত্যিই ইচ্ছে করছিল, যেন কোন স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যেতে পারে।—শুধু বয়ে যাওয়া,—শুধু ভেসে যাওয়া,—মেরীর প্রেম ওকে নৌকার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাক্ না?—দূর থেকে দূরে,—পিছনে পড়ে থাক অনেক দূরের ফেলে আসা গেরুয়া গঙ্গা, পিছনে পড়ে থাক, বর্তমানের ঘাটে বাঁধা এই ধূসর টেমস্।—সামনে শোনা যাক্ কোন নূতন নদীর নূতন কলোচ্ছ্বাস।

মেরী বলল,—"চুপ করে ভাবছ কী? রাগ করলে বুঝি তোমার কবির নিন্দে করছি বলে।"

কুমার হেসে উঠল,—"চল মৌরী, উঠে পড়ি।"

—“না, আগে বল আর কি আছে সে কবিতায়? আর কি বলেছে তোমাদের কবি।—বাঁচার কথা কিছু আছে কি?”

—“না মৌরী, এ কবিতার শেষেও মৃত্যুর কথাই বলেছেন কবি।”

—“মৃত্যুর কথা?”

—“হ্যাঁ, প্রেমের চরম অনুভব মৃত্যুর মতই পূর্ণ। জীবনের অহংকার নিয়ে দুজনের অখণ্ড মিলন সম্ভব কী?”

—“আবার সেই দ্বৈতবাদের কথা। তোমাদের অদ্বৈত আত্মার সঙ্গে এর মিল নেই।—হাসছ যে আবার?”

—“দেখ, আমি তোমায় বলছি—অদ্বৈত দ্বৈতকে বাদ দিয়ে নয়, দ্বৈতকে গ্রহণ করে। দুইকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, দুইকে সম্পূর্ণ করে। বহুকে দূরে ঠেলে নয়, তার অন্তর্নিহিত সংহতিতে। তাই আমরা বহু দেবদেবীকে পূজা করি, তবু আমাদের ঈশ্বর এক। বিশ্বজোড়া বিচিত্র বিভিন্ন শক্তির দ্বৈতলীলা একটি অখণ্ড অদ্বৈত চেতনলোকের মধ্যে বিধৃত। তাই আমাদের ঈশ্বরের একনাম অর্ধনারীশ্বর। তিনি অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী! অর্ধেক স্থির আর অর্ধেক গতি। অর্ধেক প্রকাশ আর অর্ধেক মায়া। অর্ধেক সূর্য আর অর্ধেক ছায়া। কিন্তু ঐ দেখ কুয়াশার ছায়া সরিয়ে দিয়ে ফ্যাকাশে সূর্য কেমন ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে। চল উঠে পড়ি।”

—“শীত করছে বুঝি তোমার?”

—“একটু একটু।”

—“একটু নয়, বিলক্ষণ। এই ত তোমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।”

—“ওটা শীতে নয়, তোমার আদরের স্পর্শে।”

—“মিথ্যেবাদী।”

—“তোমার জন্যে মিথ্যাভাষণেই আমার গৌরব।”

ওরা কোমরে কোমরে জড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে ছুটে চলে গেল। আর শেষ নবেম্বরের হাওয়া তীক্ষ্ণ কাঁটার মত ওদের বিঁধতে বিঁধতে ছুটল। আর চেস্টনাট গাছগুলি থেকে পাতা ঝরল ঝরঝর। চলতে চলতে থমকে সেদিকে তাকিয়ে দেখল কুমার। বললে—“দেখ মৌরী, কেমন পাতা ঝরছে। ওরা খবর পেয়ে গেছে যে, শীত এলো বলে।”

—"হ্যাঁ গো খবর রটেছে অনেক আগেই। যবে থেকেই দিনগুলি শীতের ভয়ে গর্তে ঢুকতে শুরু করেছে।"

—"আচ্ছা, শীতে আমার তেমন কষ্ট হয় না ত? অথচ ছোটবেলা থেকে আমি এত শীতকাতুরে যে, সবাই ভেবেছিল বিলেতের শীতে আমি বুঝি মরেই যাব। কিন্তু আশ্চর্য!—এমন কিছু কষ্ট হয় না। এই ত দু'বছর হয়ে গেল,—তবু।"

—"হবে কি করে, তুমি যে সূর্যোদয়ের দেশ থেকে আসছ, আজন্ম কাল থেকে তোমার দেহের প্রতি রক্তকণা সূর্যালোক পান করে তাপ সঞ্চয় করে রেখেছে নিজের মধ্যে, আজ প্রয়োজনমত বোধ হয় সেগুলি কাজে লাগাচ্ছে।"

—"কেমন করে তাপ সঞ্চয় করল শুনি?"

—"যেমন করে বোধ হয় ক্লোরোফিল সঞ্চয় করে পাতা",—মেরী হেসে উঠল।

—"চমৎকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।" কুমারও হেসে উঠল, বললে,—"তা ক্লোরোফিলই বটে, তাই রঙ সব এমনি ঘন সবুজ অর্থাৎ কালো।"

—"হ্যাঁ, চমৎকার কালো।"

—"আহা কি কথাই বললে—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ'।"

—"ও কথার মানে কি?"

—"মানে এই যে, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে, মনে পড়ছে কত হাজার বছর আগে, আমার দেশের এক গৌরাঙ্গী নায়িকা তার কালো নায়কটিকে এই কথাই বলেছিল। বলেছিল—'তোমার কালো রূপে ভুবন ভোলে।' বলেছিল—'কালো মেঘে তোমার ছায়া, আর কালো জলে তোমার ছোঁয়া বলেছিল—'গাছের অন্ধকার ছায়ায় তোমার আলো'।"

—"কে সেই নায়িকা, আর কে সেই নায়ক?"

—"কৃষ্ণ সেই নায়ক, আর রাধিকা নায়িকা।"

—"বাঃ, কৃষ্ণ ত শুনেছি তোমাদের ভগবান।"

—"হ্যাঁ, তাই ত।"

—"সে কি, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম?" মেরী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—"হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গেই ত প্রেম।" কুমার দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসে।

কিন্তু সে ইঙ্গিত ধরতে পারে না মেরী, বলে ওঠে—"ছি ছি, ঈশ্বরকে দেব ভক্তি, দেব প্রাণ—তাঁর জন্যে করব ত্যাগ। তাঁর জন্যে দুঃখভোগ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন ক্রাইস্ট। সেই ঈশ্বরের সঙ্গে নারীর প্রণয়কল্পনা? এ গর্হিত, অন্যায়।"

অচেনা সংশয়ের অন্ধকার ছায়া হঠাৎ মেরীর চোখের মধ্যে ঘন হয়ে জলে উঠল। এত দিনের বন্ধুকে হঠাৎ মনে হ'ল যেন একান্ত অপরিচিত। কোথায় সে দেশ, কত দূরে? কে জানে কেমন সেখানকার আকাশ-বাতাস প্রকৃতি, কেমন সেখানকার মানুষজন? তারা কি ভাষায় কথা কয়, কত আজগুবি কথা ভাবে? সেখানে নাকি মানুষ সাপের সঙ্গে এক ঘরে ভাগাভাগি করে বাস করে? সেখানে নাকি কত মানুষের অর্ধাশন আর কত মানুষের উপবাস? আবার তারই মাঝখানে হীরে-মতি আর চুনি-পান্নার ছড়াছড়ি,—মতির মালা-জড়ানো পাগড়ীপরা মহারাজের আনাগোনা? সে দেশের শহরে শহরে নাকি বিজ্ঞানের আধুনিকতম যান্ত্রিক প্রয়াস?—এইত কুমার নিজেই বিদ্যুৎ কারিগরী নিয়ে রিসার্চ করে উপাধি নিতে এসেছে। একটা ভাল কাজও পেয়ে যাবে বোধ হয় মাসকয়েকের মধ্যেই। তার পরে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে বিদ্যুতের খেল্ দেখাবে। অথচ, ঐ ওদেরই গ্রামে এখনও নাকি আদিযুগের অরণ্যের ছায়া ঘন হয়ে পড়ে, সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ডাকে, আর গৃহস্থের বাঁশের ঝাঁপির আড়ালে দাঁড়িয়ে নাকিস্বরে ভয় দেখায় যত ভূতপ্রেতের দল। আর মধ্যরাত্রে বুকের মধ্যে হিম করে বাঁখারির দেওয়াল কেঁপে ওঠে বাঘের ডাকে। সেখানে কত আচারবিচার, ভয়। কত অর্থহীন ব্রতপূজা; আবার তারই মধ্যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তার জাল রচনা—কত ত্যাগ, কত ধর্ম, কত রহস্যমন্ত্র। এই সব অনেক রকম ভাব এবং ভাবনা একসঙ্গে ভিড় করে ওর মনের মধ্যে কথা কইতে কইতে ওর মুখ দিল বন্ধ করে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চকিত হয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

মুখোমুখী আসনে বসে সে বন্ধু তাকিয়েছিল হাসিজ্বলা চোখে, ঠিক যে ওর দিকে তাও নয়, আবার অন্য কোন বিশেষ দিকেও নয়। দু'পাশে দুই আসনে জোড়ে বসার ব্যবস্থা। মাঝখানে একটি কালো প্লাস্টিকের ঝক্‌ঝকে

নিরাভরণ টেবিল, তার উপরে দু'পেয়ালা 'এস্‌প্রেসো' কফি। তার মধ্যে থেকে সুগন্ধ এবং ধূম একসঙ্গে উত্থিত হচ্ছে। মাঝখানে একটি স্প্যানিশ সিগারেটের টিন। দেওয়ালে আঁকা ভিনিসীয়ান গণ্ডোলার ছবি। কালো কাঁচের থামে সাদা প্লাষ্টিকের টবে সরু সরু লতার ঝুরি। ছোট্ট ঘরখানায় বিলিতী দেশী-বিদেশীর ভিড়। তাদের বিভিন্ন সুরের বিচিত্র ভাষার ফিসফিসে কথার সঙ্গে কফির সুগন্ধ এবং কাঁটাচামচের টুংটাং। তার উপরে সামনে বসে আছে শ্বেতবর্ণা, নীলনয়না, হরিৎবসনা সুন্দরী, যে আহ্বান করেছে তাকে আত্মার আত্মীয় বলে,—অঙ্গীকার করেছে প্রেমের পণপত্রে। সমস্তটা মিলিয়ে একটা রহস্যের মায়ালোক কুমারের চোখের সামনে অর্ধস্ফুট হয়ে রইল। ও তাকিয়ে রইল সামনের দিকে, যাকে দেখছে তাকেও যেন দেখল না, অথচ তা ছাড়া অন্য কিছু যে বিশেষ করে দেখল তাও না।

তবু চোখের সামনে কত ছায়া চলে চলে সরে গেল। কত ছবি ভেসে ভেসে মুছে গেল। খোলা জানালা দিয়ে পাঁচটা না বাজতেই কালো রাস্তাটিতে অন্ধকার ছায়া পড়ল। আর ওপারের দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠল। ঝক্‌ঝকে মোটা কাঁচের ভিতর থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার ঝলমল করে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেরী ওর দিকে তাকাল।

উষ্ণ জলবাহী নলের আনাগোনায় ঘরটি গরম। তার উপরে এত লোকের ভিড় এবং গুঞ্জন। গরমে মেরীর গোলাপী মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাই মেরী কোটের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল তার হাত। আর ওর অঙ্গচ্যুত কোট চেয়ারের পিছনে নিম্নমুখ হয়ে পড়ে রইল। দোকানের একজন ইটালীয়ান পশারিণী এসে কেকের থালা নিয়ে সামনে দাঁড়াল। কুমার খুশীমুখে নিজের জন্যে একটা কেক্ পছন্দ করে তুলে নিল। মেরী শুধু ঘাড় নাড়ল।

কুমার ব্যস্ত হয়ে বললে—"সে কি, নেবে না?" সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল বিদেশী পশারিণী।

মেরী বললে—"আমার জন্যে একটা স্যাণ্ডউইচ আনো, প্লীজ।"

ভেনিসীয়ান সুন্দরী মাথা নেড়ে বললে—"গ্রাৎসিও।"

কুমার বললে—"হঠাৎ তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন মেরী? শরীর খারাপ হ'ল কি?"

মেরী কিছু না বলে শুধু একটু হাসল। ততক্ষণে ওর স্যাণ্ডউইচ এসে গেছে। ছোট এক টুক্‌রো কেটে নিয়ে মুখে পুরে মেরী আবার হাসল।

কুমার বললে—"বল লক্ষ্মীটি।"

মেরী বললে—"জান, আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

ছুরি দিয়ে কেক কাটতে কাটতে কুমার মুখ তুললে,— "ভয়? কেন?"

মেরী হাসল—"অবাক কাণ্ড! জান, হঠাৎ মনে হ'লো, যেন তোমায় আমি কোনকালে চিনি না। তুমি আমার নেহাত অপরিচিত। শুনেছি, তোমাদের দেশে বিয়ের আগে বরকনের দেখাসাক্ষাৎ থাকে না। হঠাৎ মনে হ'ল, যদি কোনদিন তোমাতে আমাতে বিয়ে হয় তবে সেও যেন সেই রকমই হবে। যেন তোমার আমি কিছুই চিনি না, যেন তুমি আমার কেউ নও। কোথায় সে কোন্ অদ্ভুত দেশে তোমার বাড়ী,—যেখানে হাজার বছরের বিভিন্ন কালস্রোত একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে আছে,—যেখানে যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস অরণ্যের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে কেঁদে মরছে। হঠাৎ আমার যেন কেমন ভয় হ'ল।"

মেরী টুকরো করে স্যাণ্ডউইচ কেটে, খেতে খেতে এই সব বলছিল আর কুমার অবাক হয়ে শুনছিল। ওর প্লেটে আঙুর বসানো ক্রীম কেকের টুকরোয় কাঁটা বিঁধানো ছিল। সেটা তেমনভাবে প্লেটেই পড়ে রইল। ওর কফির পেয়ালা খালি হ'ল না। ও জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল।

মেরী বললে—"রাগ করলে?"

কুমার হাসল—"নাঃ।"

—"তবে খাচ্ছ না যে?"

—"সত্যি ইচ্ছে করছে না।" কুমার বিব্রত হ'ল—"সত্যি বিশ্বাস কর, হঠাৎ যেন খিদে কোথায় উবে গেল।"

মেরী বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু ও কথা বাড়াল না। বললে—"কফি যদি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর এক কাপ নাও না।"

—"না মেরী, চল আজ ওঠা যাক। আর ভাল লাগছে না। বড্ড যেন গরম।"

—"আচ্ছা চল। কিন্তু তুমি খেলে না, তোমাকে কি ব্যথা দিলাম?"

কাউন্টারে দাম চুকিয়ে দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। নভেম্বরের ঝাপসা

আকাশ ওদের জড়িয়ে ধরে শিউরে উঠল। বদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়তেই আকাশভরা খোলা হাওয়ায় ওদের প্রাণ যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

মসৃণ পরিপাটী সুন্দরীর বেণীর মত কালো রাস্তায় পথচারীদের ভিড় একটু বিরল হয়ে এসেছে। চলতে চলতে হঠাৎ কুমারের মন কেমন করে উঠল। কে জানে কার জন্যে? প্রিয়া তো পাশেই আছে। তবে? কি জানি কেন ওর মুঠো করে ধরা হাতে নিজের অজ্ঞাতেই একটু চাপ দিল কুমার, আর অমনিই মেরীর বুকের মধ্যে ভালবাসারা গুনগুন করে উঠল,— শঙ্কা কোর না, সংশয় রেখো না।

কুমার বলল—"কি ভাবছ মৌরী, আমি কতখানি তোমার অপরিচিত, না কতখানি আমায় ভয় কর?"

মেরী হাসল—"না।"

—"তবে?"

—"তুমি হাসবে।"

—"না, বল।"

—"আমি এই মুহূর্তে অনেক দিনের রাস্তা পার হয়ে সেই কেংসিংটন গার্ডেনের পড়ন্ত বিকেলের আধচেনা মুহূর্তে চলে গিয়েছিলাম, যেদিন বুঝেছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।—কি আশ্চর্য! নয়?"

—"কেন, কি এমন আশ্চর্য?"

—"বাঃ, কি অদ্ভুত এই মনটা, যখন যেখানে খুশী বেড়িয়ে আসতে পারে! শুধু দেশ দেশান্তরেই নয়, কালে কালান্তরে।"

—"অথচ সিকি-পয়সা খরচ নেই।" কুমার হাসল। হাসতে হাসতেই বললে,—"টোনির খবর কী মৌরী? চিঠি পেয়েছ আর?"

—"হ্যাঁ", মেরী বললে,—"অক্ষরগুলো এবারে বেশ গোটা গোটা হয়েছে।"

—"কি লিখেছে?—ওর কষ্ট হচ্ছে না তো?"

—"না, ও বেশ ফুর্তিতেই আছে। ওদের মেট্রনও লিখেছে তাই। খাওয়া-দাওয়া নাকি আজকাল ভালোই করে। দেখলে তো? তুমি কেবল ভয় পাচ্ছিলে?"

সত্যি কুমার ভয় পেয়েছিল। ওর বার বার মনে হোত, ওরি জন্য হয়ত

টোনিকে এত শীঘ্র বোর্ডিং-এ যেতে হোল। নাহলে, হয়ত মেরী ওকে আরো কিছুদিন কাছে রাখত। মেরী কিন্তু বার বার অস্বীকার করেছে সেকথা—বলেছে, টোনির জন্যই টোনিকে দূরে পাঠানো উচিত। লণ্ডন শহর শিশুদের উপযোগী নয়। তবু কুমারের মনের ভিতরের লুকানো মনটা কিছুতেই সেকথা মানতে চায় না। মনে হয়, মেরী তাকে সন্দেহ করছে। তার জন্যে অকারণে অনেক বেশী ত্যাগ করছে। 'এত'র কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ যে মেরীকে দেখে কুমার মুগ্ধ হয়েছিল,—সে কিন্তু টোনির মা। টোনিসমেত মেরীর একটা সম্পূর্ণ রূপ ছিল। অনেকটা যেন রমলার মত। রমলা আর তার পার্থ যেন মেরী ও তার টোনির মধ্যে মিশে গিয়েছিল। অথচ মেরী কিন্তু মোটেই রমলার মতো নয়, তবু দুজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর মিল আছে। দুজনেই 'মা' বলে কি? কি জানি কেন ওকে দেখে রমলাকে মনে পড়ত কুমারের আর মনটা সহানুভূতিতে নরম হয়ে আসত! অথচ কদিন আগেও কে ভাবতে পারত যে, রমলার প্রতি করুণা করার কারু কোনদিন প্রয়োজন হবে?

রমলা কুমারের জেঠতুতো বোন। অবশ্য ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই ছিল। তবু ওকে কখনো 'দিদি' বলেনি কুমার। অন্যদের মতো নাম ধরেই ডাকতো। আর তাই নিয়ে রমলার সঙ্গে দারুণ রাগারাগি হয়ে যেত ছোটবেলায়। ওদের বাড়িতে ওই একমাত্র মেয়ে; তাই সকলের আদর আবদার ওকে সবসময় ঘিরে থাকত। কাকা বলতেন,—ওর নাম রাখা হোক দীপ্তিময়ী। দেখছ না ওর চমকে আমাদের সমস্ত পরিবারটাই যেন ঝকমক করছে। বিয়েও হোল তেমনি ঝকমক করতে করতে সুশান্তর মতো স্বামীর সঙ্গে। আর ছেলেও হোল তেমনি। পার্থসারথী নাম ওর সার্থক হবে জীবনে, একথা সবাই বলে। সেই পার্থকে ন'বছরের নিয়ে রমলা বিধবা হয়েছে, তিনদিনের জ্বরে সুশান্ত হার্টফেল করে মরেছে, এ খবর কুমার চিঠিতে পেয়েছে প্রায় দুবছর হোল; তবু আজো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কুমার যখন বিলেতে আসে তখন পার্থর বয়স বছর ছয়েক,—মেরীর ছেলে টোনির বয়সী। পার্থর সেই চেহারাটাই কুমারের মনে আছে। তাই টোনীকে ভাল লাগত ওর। চকোলেট ঘুষ দিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল কুমার।

তাই বলে যে, সেই ভাবের সূত্র বেয়ে, কোনদিন তার মায়ের হৃদয় দুয়ারে গিয়ে পৌঁছুতে পারে, একথা স্বপ্নেও জানত না কুমার। মেরীর মধ্যে ভারী একটা দুরত্ব ছিল, অন্ততঃ কুমারের তাই মনে হোত; আর অমনি রমলার কথা মনে পড়ে যেত। রমলাকেও বোধহয় আজকাল এমনি দেখায়। এমনি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ চেহারা। নিজের অসহায় অবস্থার নিজেই যেন তীব্র প্রতিবাদ। ওর চেহারার এই কঠিন আধুনিক ভঙ্গীটা কুমারের মনে লাগত। তাই একদিন 'গিবন'কে বলেছিল কুমার—তোমার বন্ধুকে বল না, আমি তার একটা ছবি তুলতে চাই। তার আর টোনির।

কুমারের দৃষ্টিটা শিল্পীর কিন্তু হাতে নেই শিক্ষা। তাই ফোটো তুলেই শিল্প সৃষ্টির ক্ষুধা মেটায়। ছবিটা এত ভালো হয়েছিল যে, বড় করে বাঁধিয়ে এনে মেরীকে দিয়েছিল কুমার। সেই থেকে আলাপের সূত্রপাত। গিবন বলেছিল—"এটা তুমি প্রদর্শনীতে পাঠাতে পারো সত্যি।" "পাঠাব", কুমার বলেছিল,—"নাম দেব মডার্ণ ম্যাডোনা"। শুনে চোখের কোণে চেয়ে গিবন হেসেছিলো,—"ম্যাডোনা না ঈভ?" পাঁচ বছরের টোনিকে বুকে চেপে ধরে মেরী হেসেছিলো,—"নিশ্চয়ই ম্যাডোনা।" কুমারের তৃপ্ত চোখ অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় মেরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েদের এই রূপটি তার ভারতীয় চিত্তে দোলা দেয়। এই মাতৃমূর্তি।—শুনে গিবন্ হেসেছিল;—"ভারতীয় মন অর্থাৎ ছেলে মানুষের মন। মায়ের খোকা হয়েই তারা থাকতে চায়। যেন মায়ের চেয়ে প্রিয়ার মূল্য কিছু-মাত্র কম"। শুনে কুমার দ্বিধাভরে ভাবতে চেষ্টা করেছিল মেয়েদের মধ্যে কার দাবী বেশী,—জননীর না কামিনীর? মেরী বলেছিল,—"বলতে পারি না। এখনো তেমন কারু দেখা পাইনি, যার জন্য মায়ের কর্তব্য ভুলে যেতে পারি।"

টোনি এসে তার লাল গাল ফুলিয়ে বললে, "নাইট নাইট।" ওর মা ওকে দুটো চুমো খেলে,—আর ও নিজে নিজেই শুতে চলে গেল। অমনি পার্থর কথা মনে পড়ে গেল কুমারের। রমলা ওকে নিয়ে বড় বেশী পুতুপুতু করত। অবশ্য আজকাল নাকি ও দারুণ রকম বড় হয়ে গেছে। সবাই লিখেছে, এই দুবছরে ও নাকি পাঁচ বছরের বাড় বেড়েছে। ওর এগারো বছর বয়সকেদূরে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।

—"এই ত ৭৪ নম্বর এসে গেছে,—পা চালাও।"

৭৪-এর দল ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে এল।

ওরা বাসের সিঁড়ির কাছে এসে পৌছেছে যখন, কণ্ডাক্টর হাঁকলে—"মনে রেখ। মাত্র তিনজন এতে যেতে পারে। মাত্র তিন জন।"

একসঙ্গে সাত জনের সাত জোড়া হাত এগিয়ে এল। কণ্ডাক্টর আবার হাঁকলে—"মাত্র তিন জন! তোমরা যদি নিয়ম না মান, আমাদের কিন্তু মানতেই হবে।" সে তিনজনকে টপাটপ প্রায় হাত ধরে তুলে নিল। ওরা পড়ে রইল।

—"চল হেঁটেই এই বাগানটুকু পার হয়ে মার্কাসের ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে যাই! তার পরে ওখান থেকে একটা টিউব নিয়ে বাড়ী গেলেই হবে।"

—"বেশ চল।" মেরী বলল—"কিন্তু আমাকে কি বলতে চাইছিলে একটু আগে, বললে না?"

—"কখন?" কুমার ওর চোখে চোখ রাখ্‌ল।

—"এই ত একটু আগে।" মেরী হাসল।

—"কি করে বুঝলে?"

—"এমনি করে!" কুমারের নকল করে মেরী ওর হাতে একটু চাপ দিল।

—"তোমাকে নিয়ে পারা গেল না—সব ভঙ্গীই চিনে রেখেছ।"

উত্তরে, ইংরেজী বাংলা মেশানো স্বরে মেরী বললে—"হুঁ হুঁ।"

—"তোমাকে একটা কাজের ভার দেব মৌ।" কুমার বললে—"দুটো ঘর ঠিক করে দিতে হবে। আমার বোন আসছে, আর তার ছেলে।"

—"তোমার সেই বোন, সেই রমলা?

—"হ্যাঁ সেই।"

"সে এখন কেমন আছে কুমার?"

—"কাল তাকে কিছু শাস্ত করেছে মৌরী। তবু তার দু' একটা ও অন্তের অনেক চিঠিতে যেটুকু বুঝতে পারি, তাতে ত মনে হয়, এখনও জীবনকে তেমন করে স্বীকার করতে পারে নি। এখনও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে বিধি-বিধানকে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তাকে কাজের মধ্য দিয়ে শান্ত করে তোলার জন্তেই আরও ওকে এখানে পাঠাচ্ছে

সবাই। একটা কাজ শিখতে গেলে মন ঠাণ্ডা করে তার মধ্যে ঢুকতেই হবে। আর তা ছাড়া ছেলেকেও বিলিতী ট্রেনিং দেবার ইচ্ছে ওদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই অনেক দিন ধরে ছিল।"

মেরী বললে—"তুমি ওকে খুব ভালবাসো, না? কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলে ওর স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু সংবাদে। তখন যদিও তোমাকে ভালো করে চিনতাম না,—তবু তোমার কষ্ট দেখে এত মন খারাপ হয়ে যেত। অথচ ও ত তোমার নিজের বোন নয়?"

"তোমাদের মতে অবশ্যই ও বোন নয়—কাজিন, কিন্তু", কুমার বললে, "আমাদের মতে, একেবারে নির্জলা—নির্ভেজাল বোন। আমার আপন কাকার মেয়ে।—সে আপন বোন নয় ত কি? তা ছাড়া ছোটবেলায় ওর বাবা মারা যাওয়ায় সবাই ওকে আপনের চেয়েও আপন করে দেখত। আমার দেখাদেখি ও আমার বাবাকেই বাপী বলে ডাকত। আর নিঃসন্তান ছোটকাকুর ও ছিল মাথার মণি। আমরা ত তখন একসঙ্গেই থাকতাম, আর ওর দাপটে অস্থির হয়ে যেতে সবাই যেন রীতিমত ভালবাসত। আমার যে মাঝে মাঝে হিংসে হ'ত না এমন নয়।"

পুরনো দিনের কথা সুখের মত হয়েই সাধারণতঃ মানুষের মনে আসে। কুমারের কাছেও তারা তেমনি করেই এল। ছোটবেলায় রমলার সঙ্গে যত পিঠোপিঠি, হিংসাহিংসি, মারামারি, মান-অভিমানের পালা চলত, কুমার অবাক হয়ে দেখল, সেগুলোর দুঃখ-বেদনা কবে যেন মিলিয়ে গেছে, উজ্জ্বল হয়ে আছে সবার উপরে একটা ছেলেমানুষি খুশির স্মৃতি। সেই খুশির হাসি মুখে মেখে কুমার বলল—"আর তা ছাড়া ওর চেহারা দিয়ে ও সবাইকে ভুলিয়েছিল। যেমন মিষ্টি তেমন উজ্জ্বল। বুদ্ধিও ছিল তেমনি ক্ষুরধার। ছোটবেলা থেকেই লেখার হাত। মৌচাকে এক একটা লেখা বেরুত, আর বাড়ীশুদ্ধ সবাই জড়ো হয়ে তারিফ করে করে সে লেখা শুনত। তারপরে একটু বড় হতে না হতেই, চৌদ্দ-পনর বছর বয়স থেকেই ত স্বদেশীতে মাতল।"

মেরী চকিত হয়ে বলল—"স্বদেশী কি?"

—"সে আর এক গল্প।" কুমার বললে—"সে এত চট করে হবে না, একটা পুরো ছুটির দিন লাগবে সে বেদনার ইতিহাস শুনতে।"

খালি বেদনা আর কষ্ট, অসহিষ্ণু হয়ে মেরী বললে—"তোমাদের দেশে শুধুই কি কষ্ট আর দুঃখ, ভাল কথা কি কিছুই নেই?"

—"দুঃখের কথা হলেই যে তা ভাল কথা হবে না—এ তোমাকে কে বললে?"

মৃদু হেসে কুমার বললে—"আমার ত মনে হয় উল্টো, আর তা ছাড়া তোমাদের কবিদেরও তাই মত—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts."

দ্বিধান্বিত হয়ে মেরী বললে—"তা বটে, তবে—"

—"তবে আবার কি?" মেরীর মুখের কথা কেড়ে নিল কুমার—"এই রমলাকেই দেখ না। সাধারণ জীবনের জোলো জোলো ঘোরো সুখ ওর মত মেয়ের জন্য নয়। দুঃখের তপস্যা জীবনে গ্রহণ করার যোগ্য ওই। তাই ও দুঃখ পেল। শুধু সুখযাপনের মত তুচ্ছ জীবন নয় ওর। কঠিন দুঃখের স্পর্শ পাবার অধিকারী।"

একটু চুপ করে থেকে মেরী বললে—"তোমার কি মনে হয়, ও আর বিয়ে করবে না?"

—"বিয়ে?" চমকে উঠে কুমার বললে—"সে কি?"

"কেন?" মেরী বললে—"বিয়ে করা কি অন্যায়?"

বার্কস্টোন গার্ডেনসের একটা উঁচু বাড়ীর কাছাকাছি এসে পৌঁছাল ওরা। অন্যমনস্কভাবে কুমার বললে—"কি জানি, রমলা আবার বিয়ে করতে পারে কিনা একথা আমার কখনও মনে হয় নি।"

দরজার সামনে এসে বিদ্যুৎঘণ্টার বোতাম টিপে দিল কুমার।

—"কেন?" মেরী বললে—"মনে হওয়া উচিত। দুঃখের তপস্যা, দুঃখের যোগ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে, তোমরা মানুষকে, বিশেষতঃ মেয়েদের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে দিতে ভালবাস। মেয়েরা যেন মানুষ নয়, আর মানুষ যেন সাধারণ নয়। যার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে সে যেন আর সাধারণ হয়ে মানুষের মত সুখদুঃখ ভোগ করতে পারবে না। কেবল দুঃখভোগের আদর্শকে বড় করে তোমরা সুখকে তুচ্ছ করে দিতে চাও,— এ আমার ভাল লাগে না।"

খুট করে ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল।

—"হ্যালো,"

—"হ্যালো,"—মার্কাসের ভাই অরেলিয়াস দরজা খুলে দিল। ওদের দু'ভায়ের নামের মধ্যে একজন রোমানবীরের নাম গেঁথে দিয়েছেন ওদের মা।

অরেলিয়াস বললে—"অনেক দিন পরে ?"

—"তা সত্যি।" কুমার বললে—"অনেক দিন ধরেই যদিও আসব আসব করছিলাম।"

মেরী বললে—"মার্কাসের খবর কি ?"

অরেলিয়াস বললে—"সে এখন ভীষণ ব্যস্ত, এখুনি দেখতে পাবে।"

—"ব্যাপার কি ?"

—"কি একটা ওরিয়েণ্টাল বিষয় নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। তাই কয়েক দিন ধরে কুমারকে ফোন করবে ভাবছে। কিন্তু ওর নতুন বাড়ীর ঠিকানা না জানায় করতে পারছিল না।"

ওরা মার্কাসের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। অরেলিয়াস বললে—"আমি যদিও তোমাদের সঙ্গে বসে এখন কিছুক্ষণ গল্প করতে পেলে খুশীই হতাম, কিন্তু আমাকে কতকগুলো কাজ আজ রাতেই শেষ করে ফেলতে হবে।

মার্কাস এসে দরজা খুলে দিল, তার হাতে সিগারেট, আর চোখে স্বপ্ন।

মার্কাস বললে—"তোমার কথাই ভাবছিলাম কুমার।"

অরেলিয়াস বললে—"তা হলে এই পর্যন্ত। ইতিমধ্যে যদি আমার কাজ শেষ হয়ে যায় ত এসে তোমাদের দলে যোগ দেব।" ও চলে গেল পাশেই নিজের ঘরে।

মার্কাস বললে—"মেরী, তুমি আজকাল কুমারকে কোন সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছ খোঁজই পাওয়া যায় না।"

মেরী বললে—"কি করব বল, আমার বাড়ীওয়ালা কোথা থেকে একটা শাঁসালো ভাড়াটে জুটিয়ে এনে কুমারকে হটিয়ে দিয়েছে।

—"ভালই হয়েছে," কুমার হাসল,—"মেরীর নয়নশাসন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অব্যাহতি পাওয়া গেছে।"

—"ইস, তবে কেন ছুটি হতেই ছুটে আস ?"

—"ওঃ সে ভয়ে" মার্কাস মন্তব্য করলে—"কুমার নিশ্চয় তোমাদের ঐ শাঁসালো ভাড়াটেটিকে ভয় করে। ভাড়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ওকে বাড়ী থেকে সরিয়েছে, প্রেমের ক্ষেত্রেও যদি সে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়!"

—"দূর।" মেরী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল—"লোকটা নেহাত বোকা।"

কুমার গম্ভীর হবার ভান করে বলল—"সত্যি মেরী, মার্কাসের কথাটা ভেবে দেখবার মত। তোমার ঐ 'বোকা' কথাটার মধ্যে একটু যেন আদরের মিশেল আছে।"

—"উঃ কুমার," আবার হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'ল মেরী—"হিংসুটেপানা করো না বলছি।"

মার্কাস বললে—"হিংসে করে সুখ পাবার উপায়টুকুও তুমি বেচারার রাখ নি। কারণ তুমি নিশ্চয় সারাক্ষণ ধরেই কুমারের নতুন বাড়ীর তদারক করতে ব্যস্ত।"

—"বাঃ! কুমার এখনও তার নতুন বাড়ীতে আমাকে ঢুকতেই দেয় নি।" মেরীর গলায় অভিমান।

মার্কাস বললে—"ওঃ, তাই নাকি। আমি বার-দুয়েক ফোন করে তোমায় না পেয়ে সিদ্ধান্ত করলাম, তুমি নিশ্চয় কুমারের কাছে আছ।"

—"তা হয় ত কুমারের কাছে হতে পারে, তবে ওর বাড়ীতে নয়।

—"সত্যি?"

কুমার বললে—"সত্যি। বাড়ীটা এত অদ্ভুত বিশ্রী যে ওখানে মেরীকে নিয়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না। এখনও আমার ঘর খোঁজার বিরাম নেই, পেলেই এটা ছেড়ে দেব। সত্যি এখানে কোন বন্ধুকেই ডাকতে ইচ্ছে করে না।"

—"তা হলে আবার সেই ঘর খোঁজা চলছে?"

—"হ্যাঁ, তোমাদের দেশে এসে অবধি আমার যাযাবর বৃত্তি বেশ ভাল ভাবেই চলছে।"

—"তোমার থিসিসের আর কত দেরী কুমার?"

—"আর মাসছয়েকের মধ্যেই দিতে পারব ভাবছি। তার পরে যতদিন না রেজাল্ট বেরোয় ততদিন যে কোন একটা চাকরি।"

—"যে কোন চাকরি ?"

—"হ্যাঁ, যে কোন চাকরি।" মার্কাসের মুখের কথা কেড়ে নিল কুমার—"ইঞ্জিনিয়ারই যে হতে হবে তার কোন মানে নেই। এমনকি তোমার থিয়েটারেও এসে ঢুকতে পারি।"

—"এ্যাক্টরের কাজ নিয়ে নাকি ?" মেরী হেসে উঠল—"নাকি মেয়েদের ড্রেস-মেকার ?"

কুমার বললে—"ঠাট্টা থাক, কেন আমায় খুঁজছিলে বল, তোমার সমস্যাটা কি ?"

—"সমস্যা ?" মার্কাস মৃদু হাসল—"সমস্যা—শকুন্তলা।"

—"শকুন্তলা ?" কুমার বললে—"আজকের যুগে শকুন্তলা নাটক মানাবে ?"

মার্কাস জোর দিয়ে বললে—"নির্ঘাৎ মানাবে, ওর যে অংশটা সব দেশের সব যুগের, তার উপরে, ওর যে অংশটা শুধু প্রাচীন ভারতের, সেটা একটা রং ছড়াবে মাত্র।"

—"তা কি করতে চাও ?"

—"থিয়েটার নয়, ওটাকে ব্যালে প্লাস অপেরা জাতীয় একটা কিছু করার ইচ্ছে আছে। কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা জানি না। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি ড্রেস নিয়ে।"

মেরী বললে—"কেন ? মূর্তি স্টাডি করলেই ত পার, এত অজস্র মূর্তি ?"

"আরে মূর্তি স্টাডি করতেই ত এই ক'দিন ধরে বৃটিশ মিউজিয়াম আর ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু—।" কুমারের দিকে চোখ টিপে হেসে বললে—"ভারতীয় মূর্তি কিছু তুমি দেখেছ মেরী ?"

মেরী বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। একটু ভেবে বললে—"দেখেছি বইকি। তবে সেগুলি বোধহয় সব নিউড ছিল।"

মার্কাস বললে—"না নিউড নয়, কাপড় আছে, তবে—"

—"তবে।" কুমার হাসল—"এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না।"

মার্কাস বললে—"ঠিক তাই। গ্রীক-মূর্তিগুলির যদিও বেশীর ভাগ নিউড। তবু যাদের কাপড় আছে তাদের মার্বেলের ভাঁজ থেকে কাপড়পরার ধরনটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু—"

কুমার বললে—এখানেও বোঝা যায়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে বেশীর ভাগ মূর্তিগুলিরই পায়ের কাছে কাপড়ের কুঁচি।"

মার্কাস বললে—"হ্যাঁ, তা দেখেছি কিন্তু উর্দ্ধাঙ্গ একেবারে খালি।

কুমার হাসল—"তা ঠিক, তখনকার দিনে লজ্জার সঙ্গে সজ্জার সম্পর্ক হয়ত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না, মানুষ নিজের কাজের জন্যেই হয় ত লজ্জিত হ'ত বেশী।"

মার্কাস বললে—"খুব সম্ভব তাই। তুমি 'বেসামে'র এই নতুন বইটা দেখেছ? ভারতের উপরে? আমার ত মনে হয় বইটা ভাল। তিনিও লিখেছেন, তখনকার দিনে মেয়েরা বোধ হয় অনাবৃত বক্ষেই ঘোরাফেরা করতে লজ্জা পেত না, এখনও মালাবারের দিকে যেমন চলন আছে।"

দ্বিধান্বিতভাবে কুমার বললে—"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অন্ততঃ অজন্তার চিত্রলিপিতে তার প্রমাণ নেই। সেখানে অনাবৃত উর্দ্ধাঙ্গীর সঙ্গেই ফুলহাতা জামা পরাও মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়।"

মেরী অসহিষ্ণু হয়ে বললে—"কেন, তোমাদের সাহিত্যে বেশভূষার বর্ণনা নেই?"

উৎসাহে টেবিল চাপড়ালে কুমার। বললে—"ঠিক, ঠিক, একেই বলে নারীর সহজাত বুদ্ধি। ঠিক কথাই বলেছ মেরী। দেখ মার্কাস, শকুন্তলার বেশ নিয়ে ভাবছ কেন। কালিদাস নিজেই তার বর্ণনা করে গেছেন। সেইটে অনুসরণ করলেই ত চুকে যায়।"

মার্কাস বললে—"শোন কুমার, যে জন্যে তোমার খোঁজ করছিলাম সত্যি, সেটা এই ড্রেসের চেয়েও গুরুতর।"

"কি ব্যাপার?"

"শকুন্তলাটা অনুবাদ করে দাও একটু আধুনিক ইংরেজীতে। অবশ্য এত আধুনিক নয়, যাতে ওর মূল স্বর ব্যাহত হয়।

"আমি?" কুমার চমকে উঠল—"ওসব আমার দ্বারা হবার নয়। কিন্তু—"। বলতে বলতে কুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"আমি জানি কে তোমায় সাহায্য করতে পারে?"

কে?"

—"আমার বোন আসছে জার্নালিজম পড়তে। ছোটবেলা থেকেই ওর

লেখার হাত ভাল। আর সংস্কৃতসাহিত্যও বেশ জানা আছে। ও তোমায় নিশ্চয় সাহায্য করতে পারবে।"

—"বাঃ, তবে ত ভারী মজা!"

মেরী এতক্ষণ 'বেশামে'র নতুন বইটা উলটে-পালটে ছবিগুলো দেখছিল। বললে—"রাত হ'ল কুমার। বাইরে খুব ঠাণ্ডা হবে।"

সত্যি! ঘরের মধ্যে জানালা বন্ধ, পর্দা ফেলা,—ফায়ার-প্লেসে আগুন গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে,—চমৎকার গরম আরাম,—মনেই পড়ে না যে, জানালার বাইরে নভেম্বরের কালো রাত শিউরে শিউরে কাঁপছে।

—"সত্যি অনেক রাত।" কুমার ঘড়ি দেখল—"প্রায় ন'টা বাজে।"

—"বাজুক না।" মার্কাস বললে "কুমারের ত গাড়ী আছে।"

—"না, সেটা হাসপাতালে পাঠিয়েই ত এই দুর্গতি। আজ প্রায় দিন পনরো হয়ে গেল, আর কতদিন যে লাগবে কে জানে।"

মার্কাস বললে—"তবে আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব এখন। ভাবনা নেই।"

কুমার বললে—"তার দরকার নেই।"

মেরী বললে—"বিলক্ষণ, কে বললে দরকার নেই। এই ঠাণ্ডায় হাঁটার কোন মানে নেই, বন্ধু নিজে যখন গাড়ী অফার করছে।"

মার্কাস বললে—"ব্রেভো, এসব বিষয়ে নারীর কথাই শেষ কথা। কাজেই এখন কফি খাও।"

—"প্লীজ," কুমার বললে—"একটু আগেই গণ্ডোলায় কফি খেয়ে এসেছি। আবার?"

—"বেশ, তা হলে চা?"

—"তা চলতে পারে।" কুমার বললে—চা-ই আমাদের একমাত্র পানীয়। এ পানীয়ের কোন বিশেষ নিয়ম নেই। যখন-তখন যেখানে-সেখানে চলতে পারে। চা-ই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম উত্তেজনা। কে যেন বলেছেন, ঠিক মনে করতে পারছি না—যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে অতগুলি প্রেমের গল্প লিখেছিলেন, তারও প্রেরণা নাকি চা।"

—"সত্যি?" মার্কাস হাসল, বলল—"আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম জানি, ইনি টেগোরের আগে?—নয়?"

মার্কাস বই ঠেলে উঠে পড়ল, চায়ের যোগাড় করতে করতে সুর করে ডাকল—"অরলি অরলি ?"

ভারী পর্দা ফেলা পাশের ঘর থেকে গুমগুমে চাপা গলায় অরলি বললে—"আমার জন্যে নয়।"

ওর ঘরের কাছে এসে মেরী বললে—"আসতে পারি ?"

ভিতর থেকে উত্তর এল—"নিশ্চয়, তবে একটু দাঁড়াও, পাজামার উপরে গাউনটা পরে নি, নইলে হয় ত তুমি আবার লজ্জা পাবে।"

—"ওয়েল, আই নেভার।" লজ্জা পেয়ে মেরী সরে এল।

—"তোমরা হোপলেস। এরই মধ্যে কচি খোকা সেজে শুয়ে পড়লে ?"

—"না গো না, তোমাদের মত শিশু নই। তোমরা ত 'প্লে' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, অর্থাৎ খেলা নিয়ে। আমি করছি কাজ। বিশ্বাস না হয় দেখে যাও।"

—"দরকার নেই।" মেরী কৃত্রিম রাগ দেখালে, বোঝা গেল, আপিসের কোন-প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে অরেলিয়াস। দুই ভাই পাশাপাশি ঘর নিয়ে বাস করছে। না ডাকলে কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসে না। অথচ চাইলে পরে দুজনেই দুজনকে পরামর্শ দেয়, ভাবের অভাব নেই। কিন্তু কেউ কারও কাছে কোন বিষয়েই বাধ্য নয়। অরেলিয়াস আর্কিটেক্ট—কি যেন একটা ফার্মে কাজ করে। আর মার্কাস একাধারে লেখক এবং এ্যামেচার থিয়েটারের ডিরেক্টর প্রডিউসার। ওদের বাপ-মা থাকেন গ্রামে—ব্রিস্টল থেকে একটু দূরে। আর এদের দু'ভাইয়ের ভাগে পড়েছে দিদিমার সম্পত্তি। অরেলিয়াসের ভাগটা ব্যাঙ্কে আছে, আর মার্কাসের ভাগটায় থিয়েটার হচ্ছে। এ ব্যাপারটা মার্কাস বোঝে ভালই, কুমার ভাবে, কই লোকসান তেমন দিয়েছে বলে' তো শুনি নি।

ইতিমধ্যে মার্কাস কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছে। মার্কাসের এই একলার সংসারটি যেন ছন্দ ও সুষমায় ভরা। নরম স্প্রীঙের বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা। মোটা রঙীন ঝালর-দেওয়া চাদর দিয়ে ঢাকা। দুটো গদী-আঁটা আধুনিক সোফা। একটা বড় টেবিল, চেয়ার এবং ঘরের দেওয়ালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখা অনেকগুলি বুক-কেস। তাদের মাথাগুলি ঝক্‌ঝকে পালিস করা। আর তার উপরে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র জিনিসের একটি-দুটি এখানে-

ওখানে সাজান। নিগ্রো বাস্ট, টিবেটান কিউরিও। মেক্সিকোর শিরোভূষণ দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ। যে যার জায়গায় বসে আছে।

থালার উপরে ছোট্ট নীল ট্রে-ক্লথ পেতে, চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করতে করতেই টগবগে জল থেকে 'হুইশ্ল' বাজিয়ে ধোঁয়ার পিচকারী উঠল। টি-পটে চা ও গরম জল দিয়ে মার্কাস অন্তরঙ্গ সুরে হুকুম করল—"হেই হো, ট্রে-টা কেউ নিয়ে চল, আমি কিছু বিস্কুট নিয়ে আসছি।" মেরী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ট্রে-টা নিয়ে এল। কুমারের নিজেকে মনে হ'ল—ক্যাড, জংলী। আজ পর্যন্ত এই ছোটখাট অভ্যেসগুলো হ'ল না।

কি আর করবে সে,—কুমার মনে মনে নিজের পক্ষ নেয়।—বরাবর দেখে এসেছে বাড়ীতে কাজ করে মেয়েরা আর তার ফলভোগ করে ছেলেরা। এইটেই স্বাভাবিক—মেয়েরা রান্না করবে ছেলেরা খাবে, মেয়েরা কাপড় কাচবে ছেলেরা পরবে, ছেলেরা এলোমেলো করবে মেয়েরা গোছাবে। কাজেই আজকে হঠাৎ মেয়েদের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে করার কথা মনেই পড়ে না। যদিও আজকাল এদেশে আর লোকদেখানো শিভ্যলরির চল নেই। মেয়েদের তেমন করে তোষামোদ করার দরকার হয় না। তবু একটু মৌখিক ভদ্রতা, একটু আদর দেখানো, একটু যত্নর আয়োজন করা এ সর্বত্রই আছে।

মার্কাস বললে—"ধন্যবাদ মেরী।"

টিন থেকে প্লেটে বিস্কুট বার করে মার্কাস বললে—"দু' এক টুকরো কেক বোধ হয় খুঁজলে পরে পাওয়া যাবে আমার ভাঁড়ারে। আনব নাকি?"

মেরী বললে—"আনতে পার, কুমারের বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে। কারণ 'গণ্ডোলায়' ও আমাকে খাওয়ালো বটে, কিন্তু সেই আমারই উপর রাগ করে নিজে খেলো না।"

অপ্রতিভ হেসে কুমার বললে—"মিথ্যেবাদী।"

ওর চোখে চোখ রেখে মেরী বললে—"সত্যি কিনা তুমিই বল সত্যবাদী।"

মার্কাস বললে—"রাগের আপোষ হবার আগে, আর একটা জিনিস বার করছি, যেটা দেখলে কুমারের দেশের জন্যে মন কেমন করবে।" সে উঠে গিয়ে তার টেবিল বনাম ছোট্ট ভাঁড়ারের পর্দা সরিয়ে একটা মোটাসোটা বেঁটে শিশি বের করে আনলে।

—"এ কি ডালমুট!" কুমার অবাক।

—"হ্যাঁ, আদি ও অকৃত্রিম! তোমার "চা"য়ের ভারতের শাশ্বত ডালমুট।" মার্কাসের মুখে আত্মপ্রসাদ।

—"ডালমুট সম্বন্ধে এত তত্ত্ব জানলে কি করে?" কুমার উৎসাহিত হয়ে বলে—"শিখলে কোথায়? তোমার ত আর বেশী ভারতীয় বন্ধু ছিল না।"

—"ছিল না, হয়েছে। সেখানেই শুনলাম।"

—"আর জিনিসটা কোথায় পেলে?"

—"সেখানেই। যে এর গুণ শুনিয়েছে, সেই তার সত্য পরীক্ষা করতে দিয়েছে। আর পরীক্ষা করে জিনিসটার প্রতি ভক্তি বেড়েছে, এই মাত্র বলতে পারি।"

মেরী বললে—"বন্ধুটি কি স্ত্রীজাতীয়?"

মার্কাস হাসলে—"সে সৌভাগ্য আর হ'ল কোথায়। ভারতীয় নারী যে কয়েকটি দেখছি, সব দূর থেকে। কথা বলার সুযোগ পাইনি কখন।"

মেরী বললে—"যাই হোক, এমন কাজের বন্ধু কোথায় সংগ্রহ করলে। আমাকে খবর দাও।"

—"কখনও না।" মার্কাস বললে, "অমনি তুমি তাকে ভাঙিয়ে নেবে। যেই সে তোমার বন্ধু হবে, অমনি তার চোখের চাওয়া বদলে যাবে, গলার স্বর বদলে যাবে। স্ত্রী-পুরুষে কখনই সেই অনাবিল বন্ধুত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না, পুরুষে পুরুষে যেমন হয়।"

মেরী রাগ দেখিয়ে বললে—"বাজে কথা।"

কুমার বললে—"না সত্যি, মেয়েপুরুষে বন্ধুত্ব যদিই বা কামনাশূন্য হয়, তার মধ্যে সর্বদাই একটা রহস্যের মোহ থাকে, অজানার রহস্য। ওরা যে পরস্পরের অপরিচিত, শুধু দেহে নয়, মনে। তাই রহস্য আর তাই মোহ, তাই অবাধতার বাধা।"

—"তবু বন্ধুটি কে শুনি?"

মার্কাস হাসল—"ভদ্রলোকের নাম 'দাস'। স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিসে রিসার্চ করতে এসেছে।" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, একটু ভেবে মার্কাস বললে—"বিষয়টা কি জান?—বাংলা সাহিত্য।"

—"সত্যি!" কুমার অবাক হয়ে গেল—"বাংলা সাহিত্য নিয়ে রিসার্চ করতে লণ্ডনে এসেছে!"

—"হ্যাঁ।" মার্কাস বললে—"তুমি বিদ্যুৎতত্ত্ব নিয়ে রিসার্চ করছ, সে বেচারা বাংলা নিয়ে করছে। তাতে রাগ করলে চলবে কেন?"

কুমার অসহিষ্ণু হয়ে বললে—"রিসার্চ করুক না যত খুশী, কিন্তু লণ্ডনে কেন?"

—"অবভিয়াসলি," মার্কাস গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে,—"লণ্ডনে তোমাদের বেঙ্গলের চেয়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চা নিশ্চয়ই বেশী আছে।"

শুনে কুমার হো হো করে হেসে উঠল, আর সেই সঙ্গে যোগ দিল মার্কাস এবং মেরী।

মার্কাস হাসতে হাসতে বললে—"হাসতে পার যত খুশী, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি।" এক মুহূর্তের জন্যে চম্‌কে উঠল কুমার,—কি অদ্ভুত বিপরীত, কি খণ্ডিত হয়ে উঠছে ভারতের জীবন!—মুখে কিছু বললে না কুমার,—চুপ করে রইল।

মেরী হাসি থামিয়ে বললে—"এবারে ফেরার কথা ভাবা উচিত সত্যিই। এদিকে রাত বাড়ছে, ওদিকে শীত জমছে। আমাকে আবার যেতে হবে, তোমার চেয়েও অনেক দূরে।"

মার্কাস বললে—"তোমাদের আর ভাবনা কি? আমাকেই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে একা।"

—"আচ্ছা কি পাগল।" কুমার হাসল,—"কিছু দরকার নেই। আমরা দু'পা গেলেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব।"

"কি করে?" মার্কাস কৃত্রিম বিস্ময় আনলে গলায়—"ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে যে তোমার কণ্ট্রাক্ট আছে তা ত জানা ছিল না।"

কুমার হাসল—"বেশ, তবে চল।"

মার্কাস বলল—"হ্যাঁ চল, একটু বেড়িয়ে আসতে আমার এখন ভালই লাগবে। কিন্তু কুমার, তোমার বোন এলে খবর দিতে ভুলো না। তাঁর কাছে সাহায্য ত পাওয়াই যাবে, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী আকর্ষণ রঙীন শাড়ীর। কি বল মেরী?"

মেরী বললে—"রঙীন শাড়ীর এমন কিছু অপ্রতুল নেই আজকের লণ্ডনে। প্রায়ই তো চলতে চলতে ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে কলিসন্‌ হয়ে যায়।"

—"দেখলে কুমার? মেরী একটু জেলাস্‌ হয়েছে সন্দেহ নেই। মেয়েমাত্রই মেয়েমাত্রের উপরে জেলাস্‌।" মার্কাস চোখ টিপে হাসল।

কুমার নিশ্বাস ফেলে বলল—"রমলার শাড়ির রংটা আজকাল খুব ফিকে হয়ে এসেছে শুনছি। বেশীর ভাগ সাদা শাড়িই নাকি পরতে চায়।"

ওরা উঠে দাঁড়াল। মার্কাস চট করে তার কোটটা বের করে নিয়ে এল। কুমার হেসে বললে—"সাধ করে শীতের রাতে গাড়ী চালাবার দুঃখ পেতে চাও তো আর আপত্তি করে কি হবে।"

মার্কাস বললে—"আমারও স্বার্থ আছে। গাড়ীতে সম্প্রতি একটা হীটার লাগিয়েছি, তার গুণাগুণ পরীক্ষা হবে। চল তা হলে,—সন্ধ্যে থেকে শকুন্তলার পোশাক ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছিল। একটু খোলা হাওয়ায় ঝাঁপ দিয়ে এলে ভালই লাগবে।"

ওরা দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির হলে কাঁচের ডুমে কমশক্তির বিদ্যুৎ, আর তার চারপাশ ঘিরে মন্থর আলোর কুয়াশা। তাতে আলোর চেয়ে ছায়ার আলপনা বেশী। সিঁড়ির কোণে রাখা ছবি-আঁকা চায়না গামলায় বিলিতী ফার্ণ, আর ছাদে ঝুলান বাতির ঝাড়, আর দেওয়ালে দাঁড় করানো হ্যাটস্ট্যাণ্ডের নানান খাঁজ-খোঁজের বিচিত্র ছায়া যেন একটা রহস্য লোক ঘনিয়ে তুলেছে চারিদিকে।

পাছে ওদের পায়ের শব্দ পাশের ঘর থেকে শোনা যায়, তাই ওরা পা টিপে টিপে চোরের মত চুপি চুপি নামল। হয় ত কোন ঘরেই এখন লোক নেই। সবাই হয় ত বেরিয়েছে সান্ধ্য আমোদের সন্ধানে। কিন্তু রাত দশটা বাজলেই সেই সবাই আর সবাইয়ের ভয়ে চুপি চুপি আসবে। ফিসফিসিয়ে কথা কইবে, সাবধানে থাকবে যাতে আওয়াজটি না বেরোয়। যদি দৈবাৎ কেউ পাশের ঘরে থেকে থাকে, তবে আর কারও সশব্দ অথবা পানমত্ত উচ্ছ্বাস সে ক্ষমা করবে না, পরের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ভারী মজার দেশ! নিয়ম মানব না বলে যদি কেউ পণ করেও বসে, আর পাঁচজনে তাকে মানিয়ে ছাড়বে।

ওরা সাবধানে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল, আর অমনি কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের এতক্ষণের বন্ধ ঘরের গরম মুখের উপরে ঠাণ্ডা ঝাপটা ছুঁড়ে মারল।

ওভারকোট ম্যাকিণ্টসের ঘোমটা টুপিটা মাথার উপরে তুলে দিয়ে মার্কাস বললে—"দাঁড়াও আমার গাড়ীটা নিয়ে আসি।"

মেরী বললে—"ওই ত তোমার ছোট্ট লাল গাড়ী।"

রাত্রিবেলা লণ্ডনের প্রত্যেকটা রাস্তা যেন এক-একটা গ্যারেজ। নানা মাপের নানা ধাঁচের নানা রঙের ছোটবড় গাড়ীর সারি। সবাই রাস্তায় গাড়ী রেখে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার! যারা পরের দেশের বাড়ীঘর জমিদারী মায় গোটা দেশশুদ্ধ চুরি-জোচ্চুরি করে পকেটে পুরতে পারে, তারা নিজের দেশের সামান্য একটা গাড়ী চুরি করতে কেন ভয় পায়।

কুমারের গায়ে ওভারকোট ছিল বটে, কিন্তু মাথায় টুপি ছিল না। খালি মাথায় ঝাপসা শীতার্ত আকাশের নীচে দ্রুত পদসঞ্চালন করতে করতে সে ভাবছিল। হাতে চামড়ার দস্তানা এঁটে মোটা গরম টুপির ঘোমটায় মাথা মুড়ি দিয়ে মেরী ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। বাড়ীটার দিকে একটু ফিরে গিয়ে ফিসফিসে গলা একটু জোরে তুলে মেরী বললে—"তোমার শীত করছে না? কি বোকা। এস, এস এই পর্চের নীচে একটু দাঁড়াই।"

—"ক্ষমা কর দেবী।" কুমার মৃদু হাসল—"এখন আমি নিশ্চয়ই তোমার আদেশ অমান্য করব। কারণ বন্ধ ঘরের গরম আরামের ভিতর থেকে এসে, শীতের এই তীক্ষ্ণ দংশনে আমার শরীরে রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছে, তোমার চুম্বনে যতখানি হয় প্রায় ততখানি কিম্বা হয় ত একটু বেশী।"

মেরী হেসে উঠল, বলল—"তুমি কি নির্ভীক সত্যিবাদী।" কিন্তু সেই সঙ্গেই ওর মনে হ'ল,—কথাটার মধ্যে কিছু সত্যের খোঁচা বোধ হয় সত্যিই আছে। সত্যিই বোধ হয় মেরীর স্পর্শের চেয়েও খোলা হাওয়াটা কুমারের বেশী ভাল লাগে। ভালবাসার তীব্রতা কমে গেছে তাই হয় ত মেরীর স্পর্শে সে পুলক আসে না, যা আগে আসত। কিন্তু আগেও আসত কি? কুমারকে মেরীর যত ভাল লাগত, মেরীকে কুমারের তত ভাল লাগত কি? মেরীকে কুমার যতখানি শ্রদ্ধা করত, ততখানি ভালোবাসত কি? কে জানে কেন আজকাল বার বার এসব কথা মনে হয়। কোথা থেকে কিসের বাধা কাঁটার মত ঠেলে উঠতে চায়। সে বাধা কি কুমারের মনের, না মেরীর নিজের। কে জানে কেন আজকাল যেন মনে হয়, কুমার আর মেরীকে তার যথার্থ মূল্য দিচ্ছে না। ওর নিজের দেশের মেয়েদের কথা যেমন করে বলে, তাতে মনে হয় তারাও যেন মেরীরই সমান। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মেরীর চেয়ে বড়। অথচ মেরী ইচ্ছে করলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত, ওর

যা চেনা পরিচয়ের মহল। ওর বন্ধুরা ত প্রায়ই সেকথা বলে—"ছিঃ ছিঃ মেরী! এ তুমি কি করলে? ঐ ভারতীয়ের মধ্যে এমন কি দেখলে? সত্যিই এমন কি দেখেছিল মেরী। এখনও দেখছে। উপায় নেই, মেরীর উপায় নেই,—কুমারকে ওর কেন এত ভাল লাগে, কে সেকথা বুঝবে। তবু ওর সঙ্গে তর্ক বাধে, মতের অমিল শেষ পর্যন্ত মনে গিয়ে পৌঁছয়, তবু,—তবু ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে শ্রেণীবদ্ধ গাড়ী থেকে লালরঙের টু-সীটারটা এসে ওদের সামনে ব্রেক কষল। বাঁ হাতে দরজা খুলে দিল মার্কাস। ওরা তিনজনই সামনের সীটে উঠে বসল। মাঝখানে মেরী, এপাশে কুমার আর ওপাশে চালকের আসনে মার্কাস নিজে।

গাড়ী স্টার্ট করে মার্কাস হীটারের সুইচ টিপে দিল। প্রথমে কারবরেটরের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়াই আসছিল, ক্রমে হাওয়া গরম হয়ে পায়ের নীচে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। তখনও হাইড পার্কের গেট খোলা ছিল। ওরা বাগান পার হয়ে চলল। বন্ধ কাঁচের জানালার বাইরে হৃতপত্র গাছগুলির আঁকাবাঁকা ডালের সিলুয়েট। সারি সারি বিজলী বাতির আলোয় রাত্রি যেন নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মূর্ছাহতের মত পড়ে আছে। দিনের আলোর মর্যাদা সে পায়নি, হারিয়েছে আপন অন্ধকারের মহিমা। এ রাত যেন রাত নয়, নীলাভ নিয়ন সাইনের সাদা আলোয় এ যেন কোন্ সময়হারা মৃত্যুপারের দেশ।

হঠাৎ কুমারের মনে হোল, যেন এই সময়হারা সময়ের মধ্যে দিয়েই তাকে অনন্তকাল চলতে হবে! আর সেই পুরানো দিনের পুরোনো জায়গায় কোনমতেই ফিরে যাওয়া চলবে না। মেরীর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশকেও সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। যদিও ডোণ্ট কেয়ার ভাবে সকলকেই হেসে উড়িয়ে দেবে। তবু মায়ের মুখের দিকে পুরোপুরি চাইতে পারবে কী? মা হয়ত মুখে কিছু বলবেন না, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকাবেন, আর মায়ের মন বলবে,—এ তুই কি করলি? তোকে যে এত করে বারণ করলাম, পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিস নে,—তুই তাই করলি? তুই কি বলে সন্তানের মাকে বিয়ে করে আনলি? মা কি মেরীকে বুঝতে পারবেন!—বোধহয় না। মুখে চুপ করে থাকলেও মনে মনে ওকে কি ভাববেন কে

জানে? মায়ের মনের কষ্ট কুমারের সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হতে থাকবে। তবু মেরীকে ও কি করে ত্যাগ করবে। দেশে সবাই হয়ত মেরীকে দোষ দেবে? কিন্তু কুমার তো জানে, কুমারই ওর প্রণয়প্রার্থী হয়ে প্রথমে এগিয়েছিল,—মেরী নয়। মেরী ওর কাছে এসে বসেছিল সত্যি।—কেসিংটন বাগানের সেই বাসন্তী বিকেলের নরম আলোয় ওর হাতের উপর আলতো ছোঁয়ায় রেখেছিল হাত। কিন্তু সে হাতে তখনো ছিল শুধু বিশ্বাস,—শুধু বন্ধুত্ব। কিন্তু সেই স্পর্শে হঠাৎ ওর মনের মধ্যে কি জানি কি হয়ে গেল। ওর সাতাশ বছরের নারীস্পর্শহীন জীবন অকস্মাৎ যেন কি রসে মাতাল হয়ে উঠলো। কেন হঠাৎ মেরীর হাতটা আবেগে টেনে নিয়ে চুম্বন করল,—মনে নেই কুমারের। যখন অপরাধভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে মন, দেখলে মেরীর অন্য হাতটা স্নেহে এবং করুণায় কুমারকে জড়িয়ে ধরেছে। মেরী রাগ করেনি। মেরী ভালোবেসেছে।—ও শ্রদ্ধা করে কুমারের প্রেমকে। ও কুমারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে' ভারতে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যি কি ও টোনিকে ছেড়ে থাকতে পারবে? সেটা কি ওর কাছে বড় বেশী চাওয়া হবে না?

কুমারকে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে, মেরী ওর হাতে হাত জড়িয়ে ফিসফিস করে বলল—"রাধাকৃষ্ণের তর্কটা আজ মুলতুবী রইল। ওটা আমি নিজে খানিকটা ভেবে নিয়ে তবে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু রাগ করো না, আজ তোমায় ব্যথা দিয়েছি।"

কুমার হাসল—"মাঝে মাঝে ব্যথা দেওয়া ভাল—নইলে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়"।

মার্কাস বললে—'**At such a night as this,**' তোমরা ফিসফিস করে কি বলছ?"

মেরী বললে—"প্রেমের কথা।"

কুমার পাদপূরণ করলে—"বলতে পারতাম, কিন্তু **at such a night as this,** তোমাদের আকাশে চাঁদ নেই। আর সেই মরা চাঁদের ভূমিকা নিয়েছে নিয়নসাইন।"

কুমারের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল। কুমার বললে—"ধন্যবাদ মার্ক। মাঝে মাঝে তোমার শকুন্তলার খবর দিও।"

মার্ক বললে—"না তাকে এখন নির্জন বনবাসে বন্দিনী রেখে আগে

সেই গ্রীক নাটকটা ধরব ভাবছি। তার পরে তোমার বোন এলে আবার শকুন্তলাকে ডাকা যাবে।"

কুমার বললে—'খুব ভাল, আবার ধন্যবাদ।' মেরীর হাতে একটু চাপ দিয়ে নেমে পড়ল কুমার। বললে—"শুভরাত্রি মৌরী।" ও পিছনে ফেরার আগেই মেরী ওর ছাড়া হাতটা ধরে ফেলল আবার। বললে—"থাম থাম, এইরকম করেই কি নারীর কাছে বিদায় নিতে হয় ?"

কুমার একটু অপ্রস্তুতভাবে মার্কাসের দিকে তাকিয়ে হাসল। মার্কাস ঘাড় কাঁপিয়ে ভুরু নাচিয়ে বললে—"যদি বল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমাকেই বা এই মধুর দৃশ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাও কেন ?"

কুমার একটু এগিয়ে এসে থেমে গেল। মেরীর চোখে চোখ রেখে বললে—"ক্ষমা কর মৌরী, নির্জনে এর শোধ নেব।"

ওর চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মেরী, বানানো অভিমানে ঘাড বাঁকিয়ে বললে—"ঈস্ সজনে অবহেলা পেয়ে নির্জনে প্রেম কুড়োতে আসবে না কোন মেয়ে, তোমার কাছে।"

মার্কাস হাসল—"শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি।" বললে কুমার। ওদের গাড়ী হুস করে চলে গেল। কুমারের চারি পাশে কুয়াশার আবরণ ঘন হয়ে উঠলো। রাস্তার আলো সে আবরণ যেন ছুঁয়ে আছে মাত্র, ভেদ করতে পারছে না। আর থেকে থেকে ছোট ছোট হাওয়ার ঢেউ, সরু ডালগুলি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মুমূর্ষু পাতাগুলি ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এই রাতে, আধ-চেনা শহরের আধ-অন্ধকার কোণায় দাঁড়িয়ে, খসে-পড়া পাতার মর্মর শুনতে শুনতে ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ওর শরীরের রক্তে রক্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ওর মনের মধ্যে ক্ষোভের মত জমে উঠলো। সেই দীর্ঘশ্বাসকে বার্কলে স্ট্রীটের মোড়ে ত্যাগ করে, ১২নং বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল কুমার।

রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে বাড়ীর দরজা। তার একপাশে—নীচে বেসমেণ্টে যাবার সিঁড়ি। সেখান দিয়ে বাইরের লোক নীচে নামত। তার এক কোণে ময়লা ফেলার ঢাকা দেওয়া টিন। সিঁড়ির নীচে যেন ফিস্‌ফিস আওয়াজ শোনা গেল। অন্যমনস্ক কুমারের কানে সে আওয়াজ

যেন ঢুকেও ঢুকল না। পকেট থেকে চাবি বার করে গর্তে ঢোকাতে যাবে, দু'জনে দুপাশ থেকে এসে ওর হাত চেপে ধরল—'থামো'।

—'কে'? কুমার অবাক হয়ে ফিরে তাকাল, এগার বছরের জন-এর চোখে নীল বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। ওঃ, আই নেভার—বলতে বলতে সে মোজা-পরা খালি পায়ে দিদির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দিদি অর্থাৎ তের বছরের কিশোরী মার্গারেট। সারাদিন, একটা সস্তা ছিটের ফ্রক পরে, সোনালী চুলের রাশিকে ছোট্ট কালো ফিতে দিয়ে, মোরগ ল্যাজের ঝুঁটি বানিয়ে, যে রাতদিনই ছোট্ট খ্যাঁদা বোনটার খবরদারী করতে করতে ঘরের কাজ করে বেড়ায়, একমাত্র বাইরে বেরুবার সময়ে যার পায়ে মোজা দেখা যায়—যে রাতদিনই বক্‌বক্‌ করতে করতে সুবিধে পেলেই ওর ঘরের বিস্কুটের টিন, চকোলেটের বাক্স ইত্যাদির দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকায় আর কিছু পেলেই ধন্যবাদ দিয়ে চটপট মুখে পুরে দেয়, হাসি খেলা ছুটোপাটিতে যার উচ্ছ্বসিত প্রাণ সমস্ত বাড়ীময় দুরন্ত হয়ে ওঠে, জিনিসপত্র ঝাড়তে ঝাড়তে অথবা হুভার চালাতে চালাতে, হঠাৎ যে হাতের কাজ ফেলে রেখে, অন্যমনস্ক হয়ে জন-এর সঙ্গে ঝগড়া করতে ছুটে যায়, সেই মার্গারেট হঠাৎ এই মধ্যরাত্রে কি আশঙ্কায় এসে ওর হাত চেপে ধরেছে?

'কি হয়েছে মার্গারেট'?—কুমার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। দেখল ছোট চোখের ভরা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরী মেয়ে। মুখের উপরে রাস্তার লাইট পোস্টের আলো পড়েছে। সে আলোয় দেখা যাচ্ছে, ওর চোখে ছেলেমানুষি সরলতার সঙ্গে ঘৃণা, লজ্জা আর ভয় একসঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে মুষ্টি শিথিল করে হাত ছেড়ে দিল মার্গারেট, সিঁড়ির নীচেই 'জন' দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনে ফিসফিস তর্ক হচ্ছে, শুনতে পেল কুমার। ভাবল, একবার খোঁজ করে দেখা উচিত। আবার ভাবলে—কি হবে, ওইটুকু মেয়েকে এমন সাহসিনী করে তুলেছে যে বেদনা, তার সন্ধান করতে যাওয়া ওর মত বিদেশীর পক্ষে উচিত নয়। অথচ এই শীতে ওই শিশু দুটিকে বাইরে দাঁড়িয়ে তর্ক করতে দেখে ও নিশ্চিন্তে কি করে ভিতরে চলে যাবে? তাই কুমার একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ওরা ভাই-বোন ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে, তবে ও ঢুকবে। ভাবতে

ভাবতে হঠাৎ দেখে মার্গারেট উঠে আসছে। এবারে ওর মুখে আর ভয় নেই। কি যেন একটা ঠিক করে এসেছে,—মনে হচ্ছে দেখে।

আস্তে উঠে এসে মুখে অল্প একটু কৌতুকের হাসি ফুটাতে চেষ্টা করল মার্গারেট, বলল—ঘুম আসছিল না,—তোমার খুট খুট আওয়াজ শুনে হঠাৎ মনে হ'ল যেন চোর। তাই 'জন'কে তুলে নিয়ে চোর ধরতে এসেছিলাম। তুমি যেন রাগ কর না"। আর, অল্প হেসে বলল—"মাকে যেন বলে দিও না।" কিন্তু মার নাম করতে করতে মুহূর্তে ওর ঠোঁটের হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল,— চোখের হাসি ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠল জলে।

কুমারের দরজা খোলা হ'ল না। পকেটে চাবি রেখে, মার্গারেটের পিঠে একটু আদরমাখানো হাত রাখল। ঝুঁকে বলল,—"মার্গারেট সত্যি বল, তোমার জন্যে কি সাহায্য করতে পারি? আমি তোমাদের বন্ধু।" মার্গারেটের চোখে একটু একটু জলের কণা আগে থেকেই জমছিল,—এখন তারা অনেকগুলি মিলে এসে হুড়মুড়িয়ে ওর চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে ঝরে পড়ল। ক্রমে ওর ভুরু কুঁচকে এল। ও ফুঁপিয়ে উঠে দু' হাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে চাপতে বেশ খানিকটা কেঁদে নিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কুমার ওর কান্না থামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ওর ইচ্ছে করছিল—অভিমানিনীর আধ-চাঁদের মত সাদা কপালে ছোট একটা চুমো দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে দেয়। হয়ত ঐ অল্প একটু আদরের ছোঁয়ায় কিশোর মনের দুঃখতাপ অনেকটা জুড়িয়ে যেত। হয়ত মার্গারেটও মনে মনে তাই চাইছিল। কিন্তু তবু কুমার ওকে ছুঁতে পারল না। তাই যদিও পশ্চিম আকাশের প্রান্ত থেকে অর্ধস্ফুট চাঁদের নিঃশব্দ ইঙ্গিত কুয়াশার আড়ালে ব্যর্থ হয়েছিল, ঢিলে কোট-পরা ওকে যেন ভাল করে চেনাই যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল নেহাতই একটি ছোট্ট মেয়ে, তবু অকস্মাৎ চকিতের মত ওর সারাদিনের দেখা চেহারাটা মনে পড়ে গেল কুমারের। আঁটসাট পোশাকে স্ফুটতর ওর বিকশিতপ্রায় তরুণী-দেহকে না চিনতে পারার কোন কারণ নেই। তাই ওকে যত ছেলেমানুষই মনে হোক, এই মধ্যরাত্রে জনহীন পথের মাঝে ওর পবিত্র কুমারী শরীরকে স্পর্শ করতে সংকোচ হ'ল কুমারের। তাই মুখেই আদর জানালে কুমার,—বলল, "শ, শ, টাট, টাট, অতো

কেঁদো না। আঃ, এই ত লক্ষী মেয়ে।" আস্তে আস্তে ওর কান্না থেমে এল।

ধরাগলায় ও বললে—"তাহলে নীচে এস আমাদের ঘরে।" ওরা চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ছোট্ট অন্ধকার কোণাটুকু পার হয়ে দরজার কাছে এল। মার্গারেট চুপি চুপি ডাকল—"জন জন।" জন বোধহয় ভিতরেই দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলে উঁকি দিল, মার্গারেট তার কানের কাছে ঝুঁকে বললে—"আঙ্কল কুমার আমাদের বন্ধু, তাঁকে সব বলা যায়; সে আমাদের সাহায্য করতে পারে।" জন ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—"ওকে সত্যি বিশ্বাস করা যায় কি?"

ঢুকতেই প্রকাণ্ড রান্নাঘর। আজকাল এত বড় রান্নাঘর কোন বাড়ীতেই থাকে না। এ বাড়ীটা প্রাচীন। একশ' বছরেরও আগের তৈরি। তাই একটু সস্তা দামেই কিনেছিল জুনি বার্কার। তবে মূল্য দিতে গিয়েই হাঁপিয়ে উঠল,—না আগে ভাগেই জীবনটা নিয়ে হাঁপাচ্ছিল সে, কে জানে? মোট কথা এমন হতশ্রী অপরিচ্ছন্ন বাড়ী কুমার আর বেশী দেখেনি এদেশে। মেরীর বাড়ীওয়ালার কাছে নোটিশ পেয়ে কুমার যখন হন্যে হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন মোহিত ওকে এখানে ধরে নিয়ে এল। জুনি বার্কার মোহিতের পুরানো আলাপী। সাসেক্সে নাকি একবার ওর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল মোহিত। সে বাড়ী নাকি স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু এ বাড়ী ত স্বর্গের বিপরীত। তবু এখানে এসেই তখন উঠতে হোল কুমারকে। উপায় কী? বাড়ী খুঁজে খুঁজে ও তখন হয়রান হয়ে উঠেছে। ভারতীয়দের ভাড়া দিতে কেউই সহজে রাজী নয়। কালো রংয়ের ছোঁয়া লেগে পাছে ওদের সাদা রঙে ছায়া পড়ে। ব্যাপার দেখে রেগে উঠত মেরী; কুমার কিন্তু মনে মনে রাগতে পারত না। ওর মনে হোত, ওর নিজের দেশেও ত একই নিয়ম। সেখানেও তো বিদেশী পেলে কেউ আর ভারতীয়কে ভাড়া দিতে চায় না। কারণ হয়ত তার অনেক আছে। ভারতীয়েরা নাকি বাড়ী পরিষ্কার রাখতে পারে না। 'লিজ'-এর নিয়ম মেনে চলে না। —ইত্যাদি অনেক কিছু। তবু কুমারের মনে হোত,—কেন এসব সত্যি? কেন আমরা বাড়ীঘর রাখতে জানি না,—'লিজ'-এর নিয়ম মেনে চলি না,— কেন আমাদের নিজের দেশে, নিজের জাতের কাছেও পরের সম্মান বেশী। এইসব ভাবতে ভাবতে আর বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে কুমার যখন

হাঁপিয়ে উঠেছে, জীবনে প্রায় বিতৃষ্ণা এসে গেছে, এমন কি মেরীর সঙ্গও আর তেমন সুধা ঢালতে পারছে না,—তখন এই বাড়ীটার খোঁজ নিয়ে এল মোহিত।

বাড়ীর চেহারা দেখে যত অবাক হ'ল, জুনকে দেখে তারও চেয়ে অবাক হ'ল ওরা। তার দেহে, মুখে, চুলের রঙে, কোথাও এতটুকু চাকচিক্য অথবা পারিপাট্যের চিহ্ন নেই। সমস্ত মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। ফ্যাকাসে ঠোঁটে মুছে যাওয়া লিপষ্টিকের চল্টা-ওঠা রং-চটা ছোপ। ওদের দেখে অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠল জুন। কুমার দেখল, মেয়েটির চেহারায় অভাবের ছাপ পড়েছে! দেখতে প্রায় বস্তিবাসীদের মত করে তুলেছে। কিন্তু তার কথাবার্তায় এখনও ভদ্রতার পালিস চিক্‌চিক্‌ করছে।

জুন কিন্তু তার হৃতশ্রী পরিবেশের জন্যে একটুও লজ্জা পেল না, কিংবা হয়ত সেই রকম ভাব দেখাল—মোহিত মাঝে মাঝে বাংলায় ফিসফিস করে কুমারকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে, 'জুন'-এর যে ঐশ্বর্য সে দেখে এসেছিল, তারপরে এ জুনকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে। জুন বললে, "গ্রামের জমিজমা বেচে এই বাড়ীটা কিনেছে তার জর্জির জন্যে।" জর্জি ব্যারিস্টার। পুরো একতলাটা তাকে সাজিয়ে দিতে হবে। আপিস, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্যে। আর দোতলায় ওরা থাকবে। বেসমেণ্টে রান্না ইত্যাদি হবে। বাকী দুটো তলা ভাড়ার জন্যে রেখেছে। তা সবই প্রায় ভাড়া হয়ে গেছে। শুধু তিনতলার এই ঘরটা বাকী আছে। কুমার যদি চায় ত সে ঘর ও নিজেই সাজিয়ে দেবে। দু' পাউণ্ড ভাড়া বেশী দিলেই হবে।

"জর্জি বুঝি তোমার দ্বিতীয় স্বামীর নাম? কবে আবার বিয়ে করলে?"

"ওঃ হো তুমি জান না! তোমরা চলে আসার পরেই। বিয়ে করেই শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছিলাম, ছেলেপিলেদের এক নার্সের কাছে রেখে। জর্জির ইচ্ছে লণ্ডনে প্র্যাকটিস করে, তাই এ বাড়ীটা কিনেছি। পিসি চিরকাল গ্রামে ছিল বলে আমাকেও যে তাই থাকতে হবে, যেহেতু তার সম্পত্তি পেয়েছি, এর কোন মানে হয় না। যাই হোক, বাড়ীটা এখন কি করে মনের মত সাজিয়ে ফেলব জর্জি আসার আগে, তাই ভাবছি—ও আবার এলোমেলো ভাব মোটেই সইতে পারে না।"

কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, এ বাড়ীর সবই ত এলোমেলো।

জুনি বললে, "সকাল থেকে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানোই এখন আমার মস্ত একটা কাজ, যেটা পছন্দ হয়, সেটার জন্যে সেকেণ্ড করার লোক পাচ্ছি না। তুমি মাঝে মাঝে আসবে মোহিত?"

মোহিত বলেছিল, "আমার চেয়ে ভাল substitute রেখে যাচ্ছি। ভাডাটেও বটে, সঙ্গীও বটে। কুমারের রুচিটা আবার একটু বাড়াবাড়ি রকমের ভাল।"

আর কুমারকে বাংলায় বলেছিল, "বাড়ীর অবস্থা থেকে ঘাবড়িয়ো না, আপাতত এইটেই নিয়ে নাও—ভদ্রমহিলার আগেকার বাড়ী এবং চেহারা দুটোই ছিল ছবির মত সুন্দর। হঠাৎ দু'বছরে এমন হাল হ'ল কেন কে জানে। বোধ হয় নূতন বিয়ের তাল সামলাতে—আপাততঃ যতক্ষণ না ভাল পাচ্ছ ততক্ষণ এইটেই দেখ না কিছুদিন।"

কাজেই কুমার কিছুদিন দেখল। দেখতে দেখতে, বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেল, তবু এখনও এবাড়ী থেকে বেরুবার পথ পেল না সে। প্রায় মাস তিনেক হ'তে চলল। এখনও বাড়ীর অবস্থা যে কে সেই। অথচ এই বাড়ীরই জন্যে ছেলেমেয়েগুলি সারাদিন খেটে মরে, আর ভদ্রমহিলা সারাদিন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ান, কোন দিন কুমারের ছুটি থাকলে, তাকেও বগলদাবা করে নিয়ে যান। লণ্ডনের সব বড় দোকানগুলিই একবার করে ঘোরা হয়ে গেছে কুমারের,—বার্কার, পন্টিংস থেকে এদিকে সেলফ্রিজ, জনলুইস, কিছুই বাকী নেই। যত বড় দোকান ঘুরে যত ভাল জিনিসের অর্ডার দেন ভদ্রমহিলা, পরে হয়ত সে অর্ডার আবার কোন সময় নিজেই 'ক্যান্সেল' করে দিয়ে আসেন। নইলে ঘরে এতদিনে তিল ফেলবার জায়গা থাকত না। কিন্তু কিছুই যে কেনেন না তাও নয়। দোতলার বড় ঘরটায় অনেক দামী জিনিস জড়ো করা রয়েছে। তবে তার কতখানি ধার কে জানে। কারণ প্রায়ই সবজিওয়ালা, মুদি, বা দর্জির দোকান থেকে তাগাদা দিয়ে লোক এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আর ভদ্রমহিলা মার্গারেটকে মিথ্যে ওজুহাত দেখিয়ে পাঠান ওদের তাড়াতে। আজ পর্যন্ত কুমারের ঘরের সজ্জা ঠিক হ'ল না। কিছুই যোগাড় করে দেয় নি ভদ্রমহিলা। মার্গারেট আর জনকে চকলেট ঘুষ দিয়ে অনেক কষ্টে ঘরের ম্যাটিংটা ঠিক করে নিয়েছে কুমার। ব্যস ঐ পর্যন্তই, রান্নার জন্যে একটা ছোট স্টোভ দেবার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে

নিজেই কিনে নিয়েছে কুমার। খরচের জন্যে ভাবে না কুমার, এপ্রেন্টিস ভাবে যা পায় তাতে ওর ভালই কুলিয়ে যায়। স্কলারশিপের টাকাটা জমিয়ে রাখে, কাজেই নিজে কিনে নেওয়া ওর পক্ষে কষ্টকর নয়। কিন্তু ভদ্রমহিলা কেনার কথা শুনলেই হাঁ হাঁ করে উঠেন, মিথ্যে খরচ কেন করবে। আমার ওসব, অনেক আছে, কিন্তু কোথায় যে আছে—শুধু খুঁজে পেলেই হয়। তা কাল ঠিক বার করে দেব। সে কাল আর আসে না। কাল থেকে কালেই ছুটোছুটি করে ঘোরে; তাই নিজের ঘরটা নিজেই কোন মতে চলনসই করে নিয়েছিল কুমার। কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য অংশ আজও সেই প্রথম দিনের মতই অজস্র অমনোযোগ ও অবহেলার জঞ্জালে রাশীকৃত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বসে কল চালিয়ে পর্দা সেলাই করে জুনি বার্কার, দামি কাপড়ের পর্দা, দোতলায় জর্জির বিশেষ ঘরখানার জন্যে। সে জর্জি কবে আসবে কে জানে। জিজ্ঞেস করলে শোনে, 'এইবার আসবে।' 'এই এল বলে।'

অবাক হয়ে কুমার মাঝে মাঝে ভাবে, ভদ্রমহিলার নূতন স্বামী বোধ হয় আর কারো নূতন স্ত্রীকে নিয়ে মেতেছেন, জুনির দিকে আর মন নেই। কিন্তু সে যাই হোক, কালো স্বামীর মন পাবার জন্যে সাদা মেয়ের এই দুঃসাধ্য সাধনা আশ্চর্য। কুমার ভাবে, জুনি কি তার পুরানো স্বামীর সুখ-সুবিধাও এমনই করেই দেখত, যে, তাকে এমন চমৎকার চারটি সন্তান উপহার দিয়েছে—নাকি এ শুধু দ্বিতীয় স্বামীর প্রিভিলেজ। কে জানে কি, মোট কথা ছেলেমেয়েগুলির জন্যে কষ্ট হয় কুমারের। কিন্তু ওদের যে কোন কষ্ট আছে, তাও ত মনে হয় না দেখে। দিব্যি স্ফূর্তি করে আছে; চারটিতে কখনও ভাব, কখনও ঝগড়া। আর সবচেয়ে মজা, টুপসীকে ওরা সবাই খুব ভালবাসে। ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি গাল ফোলানো সর্বদাই লেগে আছে বটে, কিন্তু টুপসীকে সবাই আদর করে। ও যে ওদের থেকে আলাদা এতেই ও সবার প্রিয়। এমন কি মা যে ওকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, সেটাও ওরা খুব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। শুধু 'জন'-র চোখে মাঝে মাঝে হিংসার জ্বলুনি দেখেছে কুমার, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে নি। ওটাকে নিজের গল্পপ্রবণ মনের কল্পনা বলেই ধরে নিয়েছে। ওরা যে অসুখী একথা কুমারের আগে মনে হয় নি। আজ এই রাত এগারটায় হঠাৎ দেখতে পেল কি অদ্ভুত নাটকের অভিনয় চলেছে এই শিশুদের মনে মনে।

কুমার দেখল, প্রকাণ্ড রান্নাঘরে একটা আধভাঙা 'ডিভান'-এর উপরে মার্গারেটের শয্যা, অর্থাৎ দু'টো ময়লা কম্বল আর একটা বালিশ। পাশের গুদাম ঘরটায় একটা খাটের মতন আছে, দেখা যাচ্ছে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে। তাতে আট বছরের এলা আর পাঁচ বছরের টম শুয়ে ঘুমুচ্ছে। রান্নাঘরের বড় টেবিলটার উপরে এক লাফে উঠে বসে কম্বল দুটো গায়ে জড়িয়ে নিল জন্—বোঝা গেল, ঐ টেবিলটাই তার বিছানা।

চারিদিক দেখে কুমার শুধু প্রশ্ন করতে পারল, "মা কোথায় তোমাদের ?"

মার্গারেট বললে,—"মা ত টুপসীকে নিয়ে উপরের ওই লিভিং রুমটাতেই শোয়। পাশের যে ঘরটায় আমরা শুতাম ক'দিন হ'ল সেখানেও একজন ভাড়াটে বসানো হয়েছে, কাজেই গত দু'দিন ধরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা এইখানেই হয়েছে।"

—"তা তোমরাও কেন মার ঘরে শোও না ?" কুমার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"বাঃ, ঘর জুড়ে খালি খাট বিছানা পাতা থাকলে লোক এসে বসবে কোথায় ? মার্গারেট বললো, "লিভিং রুমই বল আর sitting room-ই বল, ঘর বলতে ঐ ত একটিই।"

—"আর তা ছাড়া," জন হেসে উঠল। স্ব-স্থানে উঠে বসে, এতক্ষণে ওর ধাত ফিরে এসেছে। তাই ঈষৎ সবুজ স্বচ্ছ চোখে পরিচিত হাসির ঝিলিক হেনে জন বললে, "আর তা ছাড়া, আমরা ত কোনকালে মার কাছে শুই না। বাবাঃ টম যা হুলস্থুল করে রাত্রে, মা তাহলে, মোটে ঘুমুতেই পারবে না," ও হেসে উঠল।

মার্গারেট ওকে ধমক দিল, "চুপ চুপ" তারপর উঠে একতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললে, "জানো আঙ্কল কুমার, আমি তোমাকে চোর বলে ভুল করি নি, পল বলে ভুল করেছিলাম।"

'ঐ পলটা অবশ্য চোর',—বলতে বলতে মার্গারেটের দুচোখ জ্বলে উঠল,—"শুধু চোর নয়, জোচ্চোর। ড্যাডির খবর এনে দেবে বলে রোজ মাকে ভুলিয়ে নানা ছলে টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। আজকাল আবার রাত দুপুরে আসতে শুরু করে দিয়েছে, ও এসে কি করে, কি বলে জানি না। কিন্তু টাকা নিয়ে যায় এটা জানি।

—'ড্যাডি? তাকে তো তোমার মা ডিভোর্স করেছে', অবাক হয়ে কুমার বলে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,"—নিতান্ত সহজ ভাবেই মার্গারেট বলে—"টুপসীর ড্যাডিকেই আমরা ড্যাডি বলি। আমাদের আবার ড্যাডি কে? সেটা ত হতভাগা। নইলে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে এত দেরি করে। দাঁড়াও না জর্জি ড্যাডি একবার এসে লণ্ডনে প্র্যাকটিস শুরু করলে আর দেখতে হবে না। হতভাগাটার সব টাকা সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে।"

"ঈস, ভারি ত ব্যারিস্টার। আজ অবধি টিকি দেখা যাচ্ছে না।" বিদ্রূপ করে হেসে উঠল জন, "আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ লোকটাও সমান হতভাগা। তাকে মা ছেড়েছিল, আর মাকে এ ছেড়েছে। নিশ্চয় করে বলতে পারি।"

—"বেশ ত," মার্গারেট বললে, "এ ড্যাডিকে যদি তোমার পছন্দ না হয় ত তবে সেই হতভাগাটার কাছে যাও না।"

"জান আঙ্কল, মা বলেছেন, জনকে ঠিক তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—ওকে দেখতে কিনা ঠিক তার মত।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে কুমার চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ চমকে উঠল, জনের চাপা গর্জনে।—টেবিলে বসে পা দুলিয়ে শুনতে শুনতে, হঠাৎ গর্জে উঠল জন—"চুপরাও কুকুরী, আমাকে শুতে দাও।" আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে টেবিলের উপরে শুয়ে পড়ল জন। অপ্রস্তুত হয়ে কুমার বললে—"আমি আজ যাই, কাল সকালে বরং—"

—"না, না", ওর হাত চেপে ধরল মার্গারেট। "বল তুমি পল্‌কে তাড়াতে পারবে?"

"—মা কিছু বোঝে না। অর্ধেক টাকা খরচ করে ঘর সাজানো হচ্ছে, আর বাকী টাকাটা যাচ্ছে ড্যাডির খোঁজ করতে।"

—"যার খোঁজ কস্মিন কালেও পাওয়া যাবে না, তার খোঁজে",—গুমরে উঠল জন শুয়ে শুয়ে।

মার্গারেট বলল—"না না, ও কথা বোল না জন,—সে আসবে শীগ্‌গিরই। জান, আজ আমি কি খেয়েছি। শুকনো একটুকরো রুটি আর একটা টম্যাটো। আর এই দেখ আমার মোজা।" ও একজোড়া ছেঁড়া ষ্টকিং দেখালে।

—"আমার জুতোটাও ওকে দেখাও", কম্বলের কোণা থেকে উঁকি মারল জন। পরক্ষণেই গর্জে উঠল "না না, খবরদার, দেখিও না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি।"

পাশের গুদোম থেকে কাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল লিজি। টম ওকে ঘুমের ঘোরে টেলাঠেলি করে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে।

বন্ধ ঘরের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়া রান্নার গন্ধ ধোঁয়ার মত ভারী হয়ে আছে। কুমার আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—একপাশে প্রকাণ্ড পোসিলিনের সিনকের ভিতরে একগাদা বাসন ডাঁই হয়ে আছে। সারা সপ্তাহ ধরে মা অথবা ছেলেমেয়েরা যাতে রান্না করে, প্রায় সব বাসনই ওখানে জমা হতে থাকে। শনি-রবিবারে ছুটির দিনে জন ও মার্গারেট সেগুলো পরিষ্কার করে।

লিজির কান্না ক্রমে বেদনার আর্তি থেকে ক্রোধের উত্তেজনায় দ্রুত উঠে আসছিল। মার্গারেট ছুটে গেল তাকে সান্ত্বনা দিতে। সেই অবসরে জন উঠে বসল টেবিলের উপরে। হাতে মুঠি পাকিয়ে চাপা গর্জনে বললে— "যাও, যাও এবারে পালাও আমাদের ঘর থেকে।"

কুমার সোজা ওর চোখের ভিতরে দৃষ্টিপাত করল। আর সেই ক্রুদ্ধ অথচ নির্ভীক দৃষ্টিপাতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল জন। এক হাতের ঘুসি আর এক হাতে মেরে চেঁচিয়ে বললে—"এক্ষুনি পালাও নয়ত মাকে ডেকে আনব। বলব, তুমি চোরের মত এসে আমাদের ঘরে ঢুকেছ। তুমি মার্গারেটের পুরুষ।"

'জন'! ক্রুদ্ধ গর্জনে উঠে দাঁড়াল কুমার।—"চোপরাও বোকা নিগারের বাচ্চা," জন মুষ্টিবদ্ধ হাতে উঠে দাঁড়াল টেবিলের উপরে। অজ্ঞাত কার উপরে অজানা আক্রোশ দুরন্ত বেগে কুমারের মুখের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই টিং টিং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। সচকিত মার্গারেট ছুটে এল ঘরে। নিঃশব্দ এক লাফে মাটিতে পড়ে জন বললে, "পল মশাই চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল।"

"সেইজন্য এত রাত্রে একবাড়ী লোকের ঘুম ভাঙাতে লজ্জা করল না?" জন বললে—"অসভ্য জানোয়ার, ও কখনো ইংরেজ নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একজন দক্ষিণ ইয়োরোপীয় ইহুদী।" "স্ স্ থামো" মার্গারেট মুখে আঙুল দিয়ে স্তব্ধতার নির্দেশ দিল। তার পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে দু' পা

উঠে নিঃশব্দে দরজাটা একটু ফাঁক করার আগেই জন চট করে আলোটা নিবিয়ে দিল।

পাছে আলোর রেখা উপরে যায় আর সেই রেখাপথ ধরে মা এসে পৌঁছায়। ওপর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ হল। শ্রীমতী বার্কারের চাপাগলা শোনা গেল।

"তোমার জন্যে বসে বসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এত দেরি হ'ল কেন বন্ধু" ?

—"কি করব বল, সেই মেয়েটার আস্তানা খুঁজতে দেরি হয়ে গেল। যাই হোক, কাজ অনেক হ'ল। সে কিন্তু সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।"

—"ঐ শোন", আবার গর্জে উঠল জন। "চুপ চুপ," মার্গারেট ওকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। বললে—আঙ্কল কুমার, জন-এর কথায় রাগ কর না। আর প্লীজ, প্লীজ এসব কথা মাকে বল না। আর যদি কখনও সুযোগ পাও, আমাদের চার ভাইবোনের কথা ভেবে ঐ পলটাকে একটু সায়েস্তা করে দিও।"

বাইরের দিকের দরজা খুলে দিল মার্গারেট।

ব্যাপার দেখে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল কুমার। এই সব শিশুদের জীবনের আকাশও যে সুসভ্য লণ্ডনের আকাশের মতই কালো ধোঁয়ায়-আচ্ছন্ন, তা এতদিন জানতে পারে নি। ধীর পায়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এল সে। নিজেকে মনে হ'ল যেন চোর! সত্যি যেন চুরি করতে গিয়েছিল। "গুডনাইট" বললে, মার্গারেট। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে অনেক স্নেহ চোখে ভরে কুমার অনুবৃত্তি করল—"গুডনাইট।" তখন রাস্তার লাইট-পোস্টের বেঁকে পড়া ঝিকিমিকি আলোয় বাঁ চোখ নাচিয়ে মার্গারেট নিজের অধরে আঙুল রেখে শব্দ করে ছোট এক টুকরো চুম্বনের ইঙ্গিত ছুড়ে দিল ওর দিকে।—হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল জন।

ক্ষোভে, বিস্ময়ে এবং ক্রোধে হতবাক হয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল কুমার। অদ্ভুত জীবন এদের, ততোধিক অদ্ভুত এদের দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। কোন কিছুই যেন তেমন কিছু নয় এদের কাছে,—বিশেষতঃ মেয়ে-পুরুষের চুম্বন বিনিময়। বয়স এবং সম্পর্কের সীমারেখাও যেন

বারবারই মিলিয়ে যায়। কোন কিছুরই আর তেমন কোন অর্থ নেই। সবটাই ভাসা-ভাসা, সবটাই খেলা। এদের শিশুরা আজকাল অনেক কিছু শেখে বটে, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বড বড জিনিস, এমনকি ধর্মভাব ও নীতিবোধও তারা বই পডে শেখে। কিন্তু গভীর হতে শেখে না। সত্য হতে শেখে না। চরম বেদনার মুহূর্তেও খানিকটা হাল্‌কা না হয়ে পারে না।

খোলা রাস্তায় খোলা মাথায় অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করে কুমার যখন দরজা খুলে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে লেপের নীচে শুয়ে পড়ল, তখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর মাথাটা হয় ত কিছুক্ষণের জন্যে জুড়োল বটে, কিন্তু শরীর উঠল আগুন হয়ে।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন গায়ে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, আর মুখের মধ্যে জ্বরের স্বাদ। মাথা বিষম ভারী, তুলতে গেলে ঝন্ ঝন্ করে বাজে। অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখে, ঘরের মাঝখানে কার্পেটের উপরে প্লাগ লাগানো হুভারটা বসানো। চালিকার সন্ধান ধারে কাছে নেই। সে হয়ত কোন ভীষণ রকম একটা কাজে, মায়ের কোন ফরমাশ অথবা টুপসীর কোন অপকর্ম সামলাতে, কিংবা, জন, লিজি ও টমের সঙ্গে ঝগড়া করতে ব্যস্ত আছে।

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল কারা যেন উপরে উঠে আসছে। ঘরের দরজার কাছে এসে তারা ফিসফাস করতে লাগল। বোধ হয় কুমারের ঘুমকে সমীহ করে। ক্লান্তিতে অর্ধ নিমীলিত চোখে কুমার দেখল, প্লায়াস, স্ক্রুড্রাইভার ইত্যাদি হাতে নিয়ে দু ভাই-বোনে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। ওরা খুটখাট করে সুইচ খুলে কি সব করতে লাগল। অর্ধ আচ্ছন্ন কুমার শুধু বুঝতে পারল, ইলেকট্রিকের কিছু একটা খারাপ হয়েছিল, ভাই-বোনে সারিয়ে নিচ্ছে। একটু পরেই যন্ত্রটার গোঙানি শুরু হ'ল। কুমারের জ্বরতপ্ত মাথার মধ্যে বিরক্তি এসে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল—"আজকে হঠাৎ এত সকালে এদের ঘর পরিষ্কারের ধুম লাগল কেন?" আলমারীর কাছে এসে ওর জুতোগুলোর দিকে চেয়ে জন বললে, "দেখ দেখ, নিগারটার সাত জোড়া জুতো।"

"শাট্ আপ"—মার্গারেট বললে, "শুনতে পাবে। তার চেয়ে ওকে

খোসামোদ করলে চাই কি এক জোড়া জুতো বকশিশও পেয়ে যেতে পারিস।"

—"ঈস, মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।" গর্জে উঠল জন। অর্ধ আচ্ছন্নতার মধ্যেও কুমার ভাবল, কে জানে, কাকে বলে চরিত্র, আর কাকে বলে নীতি। নৈতিক চরিত্র বলতে যা বোঝায় তা হয় ত এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একেবারেই নেই। কিন্তু তবু কি আশ্চর্য, এত দারিদ্র্যের মধ্যেও এত অহঙ্কার, যে, এ পর্যন্ত কুমারের একটা জিনিসও এরা চুরি করে নি। এমন কি বিস্কুট-লজেন্সও না। সবই ত খোলা পড়ে থাকে সারাদিন। ঘরের চাবিও প্রায়ই ওদের কাছে থাকে, ইচ্ছে করলে আস্তে আস্তে কত কিই ত সরাতে পারত, কিন্তু সরায় না। অথচ এ সবে যে প্রয়োজন নেই, তাও ত নয়। দিলে পরে তৎক্ষণাৎ নিতে দ্বিধা করে না। তবে অবশ্য তাও যেন অহঙ্কার করেই নেয়, দৃপ্ত একটা ধন্যবাদ ছুঁড়ে দিয়ে। অবশ্য সবাই কিছু আর এরকম নয়। ছিঁচকে চুরিও এদেশে আজকাল হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক, কুমারের ক্লান্ত চোখ খুলতে চায় না, অথচ সমস্ত দেহ জুড়ে একটা প্রবল তৃষ্ণা। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, অথচ প্রাণ চাইছে জল। ভাই-বোনে কাজ সেরে চলে গেছে অনেকক্ষণ, বেলা বাড়ছে আঁচল দিয়ে রোদকে আড়াল করে করে।

সেই ছায়াচ্ছন্ন মেঘাবিষ্ট দিনে, কুমারের সাতাশ বছরের মন সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, কোলকাতার লেকভিউ রোডের একটা বিশেষ বাড়ীর দোতালার পূর্বদিকের ঘরে, মায়ের কোলের উপরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর সেই লেকভিউ রোডের বিশেষ বাড়ীর অধিবাসিনীর কি হ'ল কে জানে। স্নানে গিয়ে জলের ঘটি পড়ে গেল হাত থেকে, কিম্বা পান চিবুতে চিবুতে বিষম খেল অকারণে, কিম্বা বুকের পরে নভেল রেখে দিবানিদ্রার আবেশে, জাগ্রত মনের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে যোজন যোজন দূরের দেশের ব্যাকুল মনের খবর স্বপ্নে এল ভেসে। কে জানে কোথায় কি হ'ল। এধারে বেলা বেড়ে চলল। কুমার কোনমতে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খেতে পেরেছে। এখন একটু চা পেলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু মনটা আত্মীয় স্নেহের জন্যে, বিশেষতঃ মায়ের গায়ের গন্ধের জন্যে হঠাৎ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল ঠক্ ঠক্ ঠক্। প্রথমটা উত্তর দিল না কুমার।

তারপরে একটা গুমগুমে রাগের গুঁজগুঁজে স্বর বার করলে—"কাম ইন্।" মা নয়, মেরীও নয়, এমনকি রমলা অথবা কাকীমাও নয়, শ্রীমতী বার্কার। বিরক্তিতে চোখ বুজল কুমার।

—"কি হয়েছে তোমার ?" শ্রীমতী বার্কারের গলায় ক্ষুব্ধ বেদনা।

—"বোধ হয় একটু জ্বর," বললে কুমার। কুমারের কপালে হাত রাখলেন শ্রীমতী বার্কার। ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া ভাল লাগল কুমারের। ইচ্ছে হ'ল আরো কিছুক্ষণ হাতটা চেপে রাখে কপালের উপরে। কিন্তু তার আগেই হাত সরিয়ে নিলেন শ্রীমতী বার্কার। বললেন—"থার্মোমিটার আছে ?"

—"না", ঘাড় নাড়লো কুমার,—"তার কিছু দরকার নেই।"

—"কিন্তু", শ্রীমতী বার্কার গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, বললেন—"দরকার আছে।"

এতক্ষণ ধরে মায়ের স্নেহমাখা মেয়ের হাতের আদরের জন্যে কুমারের মনটা ছট্‌ফট করছিল, যেমন ওর বুকের মধ্যে ছট্‌ফট করছিল তৃষ্ণা। জুনি চলে গেলে তাই ওর হঠাৎ আশাজাগা মনটা যেন নিভে গেল। আর অমনি মনে পড়ল, যাকে দেখে কোনদিন বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। আজ তারই সঙ্গের জন্যেও মন বেশ একটু আকুল হ'ল। আশ্চর্য ! ভাবে কুমার, বিশেষতঃ যখন মায়ের জন্যে মন কেমন করছে। তখন হঠাৎ এই মেয়েটির কাছেও সান্ত্বনার জন্যে মন কেঁদে উঠল কেন ? তার সেই পবিত্রলোকবাসিনী সতীমায়ের সঙ্গে এই বহুজনভোগ্যা নটী মেয়েকে একসঙ্গে মনে করতে বিদ্রোহে গর্জে উঠল না ত মন ? তবে কি সব মেয়ের মধ্যেই মায়ের তুলনা স্বাভাবিক ভাবে মিশে আছে ? অভাবে পড়লে তার সন্ধান পাওয়া যায় ?

জুনির ফিরতে বেশ একটু দেরি হ'ল। যখন এল তখন ওর হাতে চায়ের ট্রে আর একটা থার্মোমিটার। কুমারের জ্বর এখন কমের দিকে নামছে। মাথাধরাটাও অনেক কম। কুমার বললে, "থার্মোমিটার কি তোমার কাছে ছিল ?"

—"দূর", জুনি বললে, "আমার কাছে আবার কিছু থাকে নাকি আজকাল, সবই কোথায় হারিয়ে যায়। এটা আমি এখুনি ঐ মোড়ের

দোকান থেকে কিনে আনলাম। তা ছাড়া ডাক্তারকেও ফোন করে দিয়েছি, সে প্রেসক্রিপসন্ লিখে বেরুবার সময় ডাক্তারখানায় দিয়ে যাবে বলেছে। আমি ঘণ্টাখানেক পরে গিয়ে তোমার জ্বরের ওষুধ নিয়ে আসব। সেটা খেলে দু'দিনেই জ্বর সেরে যাবে। কোন ভয় নেই।"

—"কে ভয় করছে ?"

—"তোমার মেরীকে কি ফোন করে দেব ?"

—"না না", কুমার ভয় পেল।"

—"কেন ?" জুনির চোখে কৌতূহল।

—"না না", শুধু বললে কুমার। আর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা দীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাস ফেলল—"আঃ।"

—ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজল টেলিফোনে। দোতালার করিডরে ফোন থাকে সব ভাড়াটের সুবিধের জন্যে। ফোন ধরতে ছুটে গেল জুনি। কারণ ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে।

—ফিরে এসে জুনি খুব হাসল। বলল, "জ্বরেও তোমার নিষ্কৃতি নেই। মেরী আসছে—আভে, আভে, আভে মারি—য়া।"

—মেরী আসছে। সামনের টেবিলে রাখা আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিল কুমার। শুকনো শুকনো রুক্ষ মুখ, উষ্কখুষ্ক অবাধ্য চুল আর নিষ্প্রভ ম্লান চোখ। বিশ্রী একেবারে বিশ্রী—সবটাই অত্যন্ত শ্রীহীন। এই ঘর, এই বিছানা, ওই স্বেচ্ছাসেবিকা গৃহকর্ত্রী, সবটাই অত্যন্ত শ্রীহীন। এই পরিবেশের মধ্যে ও মেরীকে আনতে চায় না, যেমন দেখাতে চায় না চক্‌চকে সার্টের নীচের আধময়লা গেঞ্জীটাকে। কোন অসুন্দর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মেরীর সাহচর্যের কথা ও ভাবতে পারে না। মেরীর নিজের ঘরটা কি সুন্দর। সে ঘরের ছবি স্বপ্নের মত মনে ভেসে ওঠে। আর সেই বাড়ীতে কুমারের ঘরটিকেও মেরী কি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ও যে শুধু নিজেই রুচিরা তা নয়, ওর চারপাশ ঘিরেও রুচি এবং সৌন্দর্য। ওর সঙ্গে প্রেমেও যেন সুন্দরের আলপনা আঁকা আছে। এখানে এই যে যেমন তেমন বেশবাসে, যেমন তেমন বিছানায় শুয়ে একটি মহিলার সঙ্গে যেমন তেমন ভাবে আলাপ করছে। এ মেরীর কাছে নিতান্ত দৃষ্টিকটু ঠেকত। কিন্তু জুনি বার্কারের সামনে রুচি নিয়ে লজ্জা পাবার প্রয়োজন নেই।

কারণ ও বালাই জুনির মধ্যেও যদি বা কোনদিন থেকে থাকে, আজ আর অবশিষ্ট নেই।

ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে জুনি হাসল। বলল,—"রুক্ষ চেহারার একটা মোহ আছে, আজ তোমাকে অন্যদিনের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখো, আজ তোমার পাওনার চেয়ে বেশী লাভ হবে।" কুমার তবু মুখ ভার করে রইল। ওর অস্বস্তি ঘুচতে চায় না। জুনি বললে,—"তা হলে তোমার জন্যে এক গামলা জল নিয়ে আসি। এইখানেই শেভ করে মুখ ধুয়ে নাও। আর চুলটা আঁচড়ে মুখে একটু ক্রীম দিয়ে দি।"

—"রক্ষে কর।" কুমার শুয়ে পড়ল, "আমার চেহারার কথা নয়, ভাবছিলাম ঘরটা বড় অগোছাল হয়ে আছে।"

—"অর্থাৎ এই অগোছাল ঘরে, প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করতে চাও না? ছি ছি, তা হলে বলব, তোমার প্রেম নেই,—না একটুও না। আমি যদি এই মুহূর্তে জর্জের দেখা পাইতো তার হাত ধরে নরকে অবধি যেতে রাজী আছি।"

—"নাঃ আমার প্রেম নরক থেকে বার হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে জানে," কুমার হাসল, "কিন্তু জর্জের জন্যে যখন নরক হলেও চলে, তখন দোতলার ঐ বড় ঘরটা কেন ঐ সমস্ত মহার্ঘ্য জিনিসপত্র আর নরম কার্পেট পুরে বন্ধ করে রেখেছ?"

—"কি করব বল? জুনির মুখ ম্লান হয়ে এল। জর্জের পছন্দটা উঁচু। ওর সব কিছুই up to the mark হওয়া চাই। বললে, "লণ্ডনে প্র্যাকটিস করবে, যদি ওকে ভাল পাড়ায় লর্ড স্টাইলে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তা বলে ভেব না ওরা গরীব। ওদের অগাধ টাকা।" পতি-গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জুনির মুখ,—"কিন্তু কি দরকার! আমার নিজের যা আছে তাই যথেষ্ট। তাই দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলব। ওদের বাপ আমাকে যতই জ্বালাতে চেষ্টা করুক, আমি কিছুতেই হার মানব না। হতভাগা বজ্জাত আমাকে টাকা দেবার ভয়ে চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।"

—"বল কি?"

—"হ্যাঁ সেই রকমই ত শুনছি।"

"কেন ?"

—"কেন আর কি ? তা হলে ত আর ছেলেমেয়েদের মেইনটেনেন্স দিতে হবে না। কিন্তু আমি ছাড়ব না।" গলা কঠিন করে জুনি বার্কার বললে, "কিছুতেই ছাড়ব না। যদি পাঁচ টাকাও রোজগার করে তো তা থেকে আড়াই টাকা আমার চাই। দাঁড়াও না, জর্জ একবার এলে হয়, ওকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বো।"

—"অদ্ভুত কথাবার্তা।" কুমার ভাবে, এদিকে ত ছেলেমেয়েদের না খেতে দিয়ে নীচের ঘরে ফেলে রেখে দেয়। তবে এ কিরকম ভালবাসা। নাকি এক ধরনের পাগলামী। এদিকে ত প্রাণে দয়ামায়া যথেষ্ট আছে। এই যে কুমারের জন্যে তখন থেকে এত করছে, এর কি দরকার ছিল ? কেউ ত ওকে সাধে নি। নিজের গরজেই করছে। অথচ নিজের অমন টুকটুকে ছেলেমেয়েদের অত কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছে। কি বিপরীত চরিত্র একসঙ্গে ধারণ করছে মেয়েটি। যত রাগ আগের স্বামীর উপরে। অথচ এ স্বামীটিও কিছু কম নয়, এই ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, পালিয়ে বসে আছে। কে জানে কেন ? হয়ত এর হাত থেকে এড়াতে চায়। কি জানি, কি দরকার পরের কথা ভেবে। একেই মন ক্লান্ত, তার উপরে এসব কথার আলোচনা ভাল লাগে না কুমারের। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলে, "ছেলেমেয়েদের বিষয়ে তাদের বাপের মত কি ?

—"কি আবার ? ছেলেমেয়েদের নাকি তিনি নিজের কাছে রেখে মানুষ করবেন।"

—"অবাক কাণ্ড।" কুমার এবারে সত্যিই অবাক হয়ে যায়—"তাই দিলে না কেন ? ভালই ত, বাপের কাছে মানুষ হ'ত। তোমারও কোন ঝঞ্ঝাট থাকত না। ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি, আবদার, নবদাম্পত্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারত না।" নাঃ, জুনি ছেলেমেয়েদের যত কষ্টই দিক, কিছুতেই তাদের হাতছাড়া করবে না। ওরা ওর এক একটি বিশেষ সম্পত্তি,—ওদের বাপের হাতে তা ছেড়ে দিতে পারে না। এদিকে ছেলেমেয়েদের সামনে নতুন স্বামী নিয়ে ঘর করতে বাধে না। তবু নাকি ছেলেমেয়েরা 'মা'কেই চায়।—তাই কুমারের প্রশ্নে হেসে উঠল জুনি।

—"হাঃ হাঃ। ছেলেমেয়েরা ওর কাছে থাকবে ? একবারে ডেকে

জিজ্ঞেস কর না ওদের ইচ্ছেটা কি? জন কথা না শুনলে তো ঐ ভয়ই দেখাই। দাঁড়া তোর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অমনি ভয়ে ভয়ে যা বলি, তা শোনে।"

—"বল কি, ছেলেমেয়েরা বাপকে একটুও পছন্দ করে না?

—"কি করে করবে? তুমিই বল। কোনদিন কি বাপ ওদের নিয়ে একসঙ্গে বসে গল্প করেছে, কি কিছু প্রেজেণ্ট এনে দিয়েছে? এখানে যতদিন ছিল করেছে খালি আমার পিছনে চৌকিদারী। আর ভারতে শুধু মদ নিয়ে পড়ে থেকেছে। বাড়ী ফিরে এসে যদি ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি শুনেছে ত বেত চালিয়েছে।"

চা-বিস্কুট খেয়ে কুমার একটু চাঙ্গা হয়েছিল তাই বললে,—"শ্রীমতী বার্কার, যদি আপত্তি না থাকে ত তোমার গল্প আজ, বল। আজ হাতে অঢেল সময়, দেখতেই পাচ্ছ।"

—"আমার আর কি এমন গল্প? নেহাতই সোজাসুজি, পান্‌সে—তোমার মত আর্টিস্টকে inspire করার মত নয়।"

—"তবু, বল সমস্ত,—একেবারে ছেলেবেলা থেকে। কিছু বদলানো চলবে না।"

—শ্রীমতী বার্কার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। নীচে সব চুপচাপ। ছেলেমেয়েদের সাড়া নেই। এদিকে দুপুর ঘন হয়ে বিকেল জমতে চলল। শ্রীমতী বার্কার বললেন—

"আমার বাপ ছিলেন ভদ্রলোক। মায়ের খবর জানি নে। কবে যে সে মরে গিয়েছিল, আমার মনে নেই।" একটু চুপ করে মাথা নেড়ে বললে,—"নাঃ, মাকে আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু ম্যাণ্টলপীসের উপরে একটি ব্লণ্ড তরুণীর ছবি ছিল, আর তার নীচে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—মার্থা ওয়েলস। আমি জানতাম ঐ আমার মা। ব্যস্, এই পর্যন্ত।

"আমার বয়স যখন ন'দশ বছর, বাবা তখন একটা ছোট কারখানায় 'ফিটারে'র কাজ নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে এলেন। গাঁয়ের বাড়ীতে রইলেন বুড়ো ঠাকুর্দা, আর চিরকুমারী পিসি। আমি বাবার সঙ্গে শহরে চলে এলাম। খিটখিটে পিসির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত, সেই পিসিই আমার জন্যে স্নেহের পেয়ালা ভরে রেখেছে।

তারই দৌলতে আমার যা কিছু। ঠাকুর্দার সম্পত্তি সে পেয়েছিল, আর তার সব সম্পত্তি আমাকে দান করে গেছে। সেই সব দিয়ে এই সব হয়েছে। তার স্বভাবের বাইরেটায় যেন কড়া পড়ে কঠিন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তোমাদের নারকোলের মত। সর্বদা ঠক্ ঠক্, খিটখিট করত। কিন্তু ভিতরে ছিল নরম কোমল শাঁস।

"যাক্ সে কথা। শহরে এসে বাবা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। গ্রামার স্কুলে যাবার মতো অর্থের সম্বল আমাদের ছিল না। কোন প্রাইভেট স্কুলেও জায়গা পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়েই একটা সাধারণ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হতে হ'ল। সেখানে অজস্র মেয়ে গিসগিস করত। পড়ার চেয়ে জটলা হ'ত বেশী। আমি যেন বেঁচে গেলাম। খাঁচা থেকে ছাড়া পেল বিহঙ্গ। কত সব অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সব খেলা। জীবনের কত মজার রহস্যের সন্ধান আভাসে এল। আমি মেতে উঠলাম। পড়াশুনোর জন্যে মাথাব্যথা ছিল না। সেলাইটা ভাল লাগত। মাতৃহীন ঘরে সেলাইএর প্রয়োজনও হ'ত। সেলাই হাতে করে বন্ধুদের সঙ্গে জটলা করারও সুবিধে হ'ত। কাজেই ওটা খুব শিখলাম। ইতিমধ্যে ছেলেবন্ধুও কম জোটেনি। বল নাচটাও বেশ রপ্ত করলাম। আমার চেয়ে অবশ্য অনেক মেয়েই ভাল নাচতে পারত। কিন্তু আমার চুলগুলো সাদা সোনার মত আর চোখের তারা ফ্যাকাশে নীল হওয়ায় সবাই আমার সঙ্গে নাচতেই পছন্দ করত বেশী। শহরে আমাদের আত্মীয়স্বজনের বেশী কেউ ছিল না। শুধু এক রুগ্ন খুড়ী অর্থাৎ বাবার এক কাসিনের বউ, আর তার দুই ছেলে। খুড়ীর স্বামী ভালই ছিলেন," জুনি বার্কার মুচকি হাসলেন, "কারণ মারা যাবার সময় বেশ কিছু পয়সাসমেত ছোট একটা বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। কারণে এবং অকারণে, ছুটিতে এবং না ছুটিতে আমি সেই বাড়ীতে ছুটতাম। ঘরকন্নায় আমি ছোট থেকেই পোক্ত"! শুনে কুমার অবাক হয়ে তাকাল। মোহিতও তাই বলেছিল। যেমন সুন্দর তেমন গোছানো ঘরকন্না। কিন্তু আজ তার কি পরিণতি। জুনি বলে চলল,—"খুড়ীর গৃহস্থালীর ব্যবস্থা আধ ঘণ্টায় সেরে নিয়ে চলত আমাদের হুটোপাটি খেলা। খুড়ীর দুই ছেলে, কেরী আর বিল দুজনেই আমার পায়ে পায়ে ঘুরত। দুজনকেই আমি সমানে হুকুম চালাতাম। আমার বয়স যখন পনরো,

তখনই ওরা দুজনে আমার প্রেমে হাবুডুবু খেত। আমি দুজনকে দু'আঙুলে নাচাতাম। আর শুধু বিল কেরীই নয়, আরো কত যে ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল,—তাদের সকলকেই আমার ভাল লাগত। সবাই যে চোখ দিয়ে আমার পুজো করে, আর আমাকে একটু ছুঁতে পেলেই ধন্য হয়ে যায়, এইটে জানা থাকায় আমাকে বাগ মানানো কারো সাধ্য ছিল না। পনরো বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি এক দর্জির দোকানে ছাঁট-কাট শিখতে ভর্তি হলাম এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে। বাবার ইচ্ছে ছিল আমি সর্টহ্যাণ্ড শিখি, কিম্বা ঐ জাতীয় আর কিছু। কিন্তু আমার বিস্তের বহর দেখে ছেড়ে দিলেন আশা।

দর্জির স্বামী ছেলেমানুষও নয়, আবার আধবুড়োও নয়--পূর্ণযুবাপুরুষ। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কোন একটা বয়স। কোন এক আপিসে কাজ করত সে। একদিন পড়তি বিকেলে, পাতাঝরা পথে, দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে চলেছি। মোড় ঘুরতেই কালো বাড়ীগুলির পাশ দিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হ'ল সে! বললে, আমাকে ধরবার জন্যে একটু শীগ্‌গিরই কাজ থেকে ফিরেছে সে—কাল সন্ধ্যাবেলায় আমাকে 'নাচে' নিমন্ত্রণ করতে চায়। সেখানে ডিনার খেয়ে তবে আমার ছুটি। একসঙ্গে নাচ এবং ডিনারের নিমন্ত্রণ তাও আবার একজন রীতিমত বয়স্ক লোকের কাছ থেকে। আমার ইচ্ছে হ'ল তখনি নাচি। কিন্তু তা না করে সংযত করে নিলাম নিজেকে। মৃদু হেসে বললাম, ধন্যবাদ। ও আমাকে 'বাউ' করে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরে, ঠোঁটে টক্‌টকে রং মেখে, কানে আর গলায় নকল মুক্তার দুল দুলিয়ে দিলাম। ভাল টুপী না থাকায় মাথায় পরে নিলাম কয়েকটা ফেল্টের ফুল। তারপর আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে খুশী হয়ে উঠলাম।

"স্মিথ আমাকে দেখে বেশ চমকাল। বললে—বাঃ কি সুন্দর, দু'হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিয়ে ছোট্ট একটি চুম্বন করল। তারপরে বড়দের মত আমার বাহুতে বাহু পরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। প্রতি মুহূর্তে ও আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, আমি সত্যি বড় হয়ে গেছি। বড়দের মত ফিসফিস করে কথা কইলে আমার সঙ্গে। প্রতি বিষয়ে জানতে চাইল আমার মতামত।

ক্ষমা চাইল প্রত্যেকটি কল্পিত অপরাধের। আমাকে পান করতে দিল প্রথমে একটু শেরী, পরে হুইস্কী।

"আমি বুঝলাম, আমি আর ছেলেমানুষ নই—পূর্ণযৌবনা নারী। তার পরে শুরু হ'ল নাচ। এতদিন পর্যন্ত কেরী, বিল, জন, বব, সিরিল ইত্যাদির সঙ্গে যে হুল্লোড করেছি, এ তার থেকে একেবারে আলাদা। ও আমার হাত ধরল সন্তর্পণে, পাছে ব্যথা লাগে, আর যে হাতে কটি বেষ্টন করল সে হাতে আদর মাখা। ওর ফিসফিস কথা আমার কানের কাছে শিউরে শিউরে উঠল। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালের উপরে গরম হয়ে জ্বলতে লাগল। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহ মৃদু ছোঁয়ায় আমাকে ঘিরে নাচতে লাগল। অসহ্য সুখে আমার দেহে রোমাঞ্চ হ'ল।

"আমি ওর প্রেমে পড়তে শুরু করলাম। ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করত না। অন্য কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলতেও যেন ইচ্ছে করত না। সমস্ত দিন সব কাজের মধ্যে সন্ধ্যের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকাটা নেশার মত হয়ে দাঁড়াল। আঃ জান কুমার, সেই দিনগুলি যেন অমৃতের স্বাদে মাখামাখি ছিল। এই দেখ না, সে দিনগুলি মরে নি; আজও আমার মধ্যে বেঁচে আছে তার ছবি। জান কুমার, সে জিনিসের স্বাদ আমি আর কখনও পাই নি।

"স্বামীর কাছে ত নয়ই। অনেকদিন পরে হঠাৎ জর্জের কাছে এসে মনে হ'ল, বোধ হয়, এ সেই জিনিস। অমনি আমি তার জন্যে সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত হলাম। সমাজ-সংসার সব, কিন্তু তবু, তবু কুমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বোধ হয় সে জিনিস নয়। সে বোধ হয় না। ভালবাসা বোধ হয় একবারের বেশি আসে না জীবনে। অত ভাল জিনিস কি বার বার পাওয়া যায়? তবু জর্জকে আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে ওর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে।"

কুমারের মনে হ'ল, প্রশ্ন করে—"শুধু ভাল লাগাই কি সব। ভাল হওয়ার কিছু প্রয়োজন নেই? ত্যাগও ভাল, খুবই ভাল, কিন্তু সন্তানস্নেহও কি ত্যাগ করার জিনিস? প্রেমের জন্যে মানুষ কি, তা বলে প্রেমই ত্যাগ করতে পারে? এ তা হলে প্রেম নয়, প্রেমের রূপধরা কোন সর্বনাশা বিকৃতি। কিন্তু জুনির মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারল না কুমার। সে মুখে এমন

নিঃসহায় মরীয়া ভাব ফুটে উঠেছে যে, তিরস্কারের বাণী উচ্চারণ করা গেল না। কুমার ভাবলে, যার মধ্যে বিধাতার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে, তাকে আবার নীতি-উপদেশ দেবার কি অধিকার আছে কুমারের।

জুনি বলল—"আমার সেই গত জীবনের দিনগুলি যেন স্বর্গের স্বপ্ন দিয়ে ভরা ছিল।"

কাৎ হয়ে হাতের উপরে মাথা রেখে চুপ করে শুনছিল কুমার। হঠাৎ ভারী ভারী গলার স্বরে চমকে চোখ তুলে দেখে, জুনির কপালে, নরম বিকেলের সোনার আলো, আর চোখের কোণে সজল মেঘের ছায়া। এই শুকনো কঠিন পাগলাটে স্বার্থপর মেয়ের ভিতর থেকে হঠাৎ কেমন করে দেখা দিল অশ্রুমুখী নারী? কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, শ্রীমতী বার্কার রুমালে শব্দ করে নাক ঝেড়ে একটু চুপ করে রইলেন। তার পরে আবার বলতে শুরু করলেন—"রোজ রাতে বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ত। বাবা প্রথমে অনেক বকলেন, অনেক বোঝালেন, শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। আমি যখন রাত এগারোটার পর চুপি চুপি বাড়ী ফিরতাম, বাবা দেখেও দেখতেন না।"

"কিন্তু বাবা শুধুই চুপচাপ ছিলেন না, ভিতরে ভিতরে তাঁর কাজ চলছিল। একদিন পিসি তার বন্ধুর ছেলে ডেভিড রাসকে নিয়ে এলেন আমাদের শহরের বাড়ীতে ক'দিন কাটাতে। মনে মনে বাবার মতলব বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু ভান করলাম যেন বুঝি নি। উৎসাহে মেতে উঠে বাবা সাত দিন ছুটি নিলেন।

ডেভিড স্কুলের সনদ পরীক্ষায় পাস করে একটা কেমিস্টের দোকানে এ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে ঢুকেছিল, আর সেই সঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি হয়েছিল। ওকে নিয়ে ক'দিন খুব পিক্‌নিক্ হ'ল। একদিন গেলাম চেষ্টারে। নদীতে নৌকা বাইতে বাইতে ও আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে স্মিথের কথা ভাবছিলাম। ও বললে, 'তুমি কি ভাবছ? আমার কথা শুনছ না।' আমি হাসলাম। ডেভিডের নামটা বেশ স্মার্ট, হলে কি হবে, আসলে ও স্মার্ট ছিল না মোটেই। আর এই নিয়ে স্মিথের সঙ্গে কত হাসতাম।"

"ছুটির দিন চারেক বাকী থাকতে বাবা আমাদের নিয়ে দেশের

বাড়ীতে গেলেন। আমরা এবারে অনেকদিন পরে গ্রামে গেলাম। তাই সবাই খুব চায়ের নেমন্তন্ন করতে লাগল। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সব কিছুই অত্যন্ত বোরিং মনে হতে লাগল। ডেভিড কিন্তু যেন মেতে উঠল। একদিন বাগানের কোণে লতাকুঞ্জের পাশে ফস করে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। আমি মুখের উপর শব্দ করে হেসে উঠলাম, কিছুতেই থামাতে পারলাম না। ডেভিড ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চলে গেল।

"পরদিন ভোরবেলা আমার পাতলা রাত-পোশাকের উপরে নীল ড্রেসিং গাউন পরে চুলের ফণা ঘাড়ে ঢুলিয়ে, আয়নার দিকে ক্লার্ক গেবলের মত দৃষ্টিপাত করে ডেভিডের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। ফিস ফিস্ করে ডাকলাম, 'ডেভিড, ডেভিড।' মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। দুই হাত বুকের উপরে বেঁধে, রাত-পোশাকের উপরে কিমানো পরে ডেভিড দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'ডেভিড, একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি।' ও বললে, 'ভিতরে এস।' আমি ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। ও জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে তাকাল। আমার তখন ভয় হ'ল, স্পষ্ট মনে আছে জান কুমার, আমার তখন হঠাৎ কেমন ভয় হ'ল। কি বলতে এসেছি, আমি জানি না ত—কি আমার উদ্দেশ্য, বোধ হয় একটু ঠাট্টা রসিকতা, একটু হালকা ইয়ার্কি করতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর মুখ দেখে সে বাসনা উবে গেল। মনটা কেমন টন্ টন্ করে উঠল। আগে হলে এমনটি হ'ত না। কিন্তু স্মিথকে ভালবেসে আমার মনটা নরম হয়েছিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারলাম, এই বোধ হয় ওর প্রথম ভালবাসা, আর প্রথম বঞ্চনা, আমি যার পরিচয় তখনও পাই নি। আমি বললাম, 'ডেভিড, আমি যদিও তোমাকে এখন ভালবাসতে পারি নি, সেজন্যে দুঃখিত, কিন্তু যদি কোনদিন তোমার জন্যে মন কেমন করে, তা হলে তোমাকে লিখিব। আপত্তি হবে না ত?' 'আপত্তি?' ডেভিড মাথা নাড়ল, দেরাজ হাতড়ে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে, তার মধ্যে ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে, উপরে আমার নাম লিখে দিল, জান কুমার।" জুনি বললে—"ও সেদিন আমায় ভালবেসেছিল,—সেদিন, যেদিন আমাকে পাবার কোন আশা ছিল না, আর যখন পেল তখন সব ভালবাসা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। যাকগে

সে পরের কথা। খাতাটা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'যদিও জানি, কোনদিনই প্রয়োজন হবে না, কারণ আমি সত্যি তোমার যোগ্য নই। আমি বিশ্রী, আমি ভোঁতা, আর তুমি কি সুন্দর।' জান কুমার, আমার তখন ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল ওকে একটা কিছু দিই। নিদেন পক্ষে, একটা ছোট্ট চুমো, কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে আমার কেমন তখন সাহস হ'ল না। আমি আস্তে চুপ করে চলে এলাম।"

"পরদিন বাবারও ছুটি ফুরোল। আর আমরা আবার সেই ধুলো-কালিমাখা কালো শহরটায় ফিরে চললাম। সেই কালো শহরটার এক জায়গায় আমার জন্যে ছোট্ট একটু আলো লুকানো ছিল। সেই আলোর আকর্ষণে গাড়ীতে বসে, গাড়ীর চেয়ে অনেক জোরে, এক'শ দু'শ মাইল বেগে আমার মন ছুটে চলল।"

ক্রিং ক্রিং ঘণ্ট বাজল টেলীফোনে।—'হ্যালো', অদেখা কিশোরীর কণ্ঠ নীচ থেকে জানিয়ে দিল, যে, মার্গারেট স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেছে। ছুটতে ছুটতে উঠে এল সে, ঝাঁকড়া সোনালী চুল এলোমেলো করে কানের উপরে ফেলে,—"মা তোমার ডাক।"—"বলে দে, আমি বাড়ী নেই," রুক্ষ কণ্ঠে গল্পের মায়া কেটে দিল জুনি বার্কার।—"কিন্তু, আমি যে বলেছি, তুমি বাড়ী আছ।"—"সিলি গুজ, কেন বলেছিস? কে ফোন করেছে শুনি? মুদী না সবজীওয়ালা?—না কি 'সেলফ্রীজ' থেকে?"—"না না, ওসব কেউ নয়", হেসে উঠল মার্গারেট, চোখ গোল করে বললে,—"পিসি করছে ফোন,—তোমার ননদ।"—"ওঃ নরক! কি চায় সে?" "সামনের শনিবার এখানে আসবে সে, বল্লে,—জর্জের খবর আছে।"—"আঃ ড্যাডি, বল ম্যাগি, জর্জ ওসব পছন্দ করে না।"—"ওঃ সরি, মার্গারেট হাসল। অনিচ্ছায় উঠে গেল জুনি বার্কার।

মার্গারেট বললে,—"বাবাঃ, পিসিকে মা যা ভয় করে, শনিবার ঠিক তার জন্যে মুর্গীর মাংস রান্না হবে।"

—"তুমি বুঝি তাকে ভয় কর না?" কুমার হাসল।

—"রক্ষে কর।" মার্গারেট বললে,—"আমি ওকে দু' চক্ষে দেখতে পারি না। কিন্তু কি করব, মায়ের ভয়ে কথাটি কইতে পারি না। ননদকে ভয় করা ভাল বটে, তা বলে অত?"

—"কি রকম দেখতে তোমার ওই মায়ের ননদকে ?"

—"বিশ্রী কালো।"

—"তোমার ড্যাডির মত ?"

—"কি করে জানব ? তাকে ত আমি দেখি নি।"

—"দেখ নি, অথচ মনে হয়, তুমি তাকে পছন্দ কর।"

"সে ত করিই, ভীষণ পছন্দ করি। আমার কেবল মনে হয়—সে এলে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। সপ্তাহের মধ্যে অর্ধেক দিন শুধু রুটি খেয়ে থাকতে হবে না। সে শুধু মায়ের মুখেই হাসি দেবে না, আমাদেরও একটু আনন্দ দেবে। অনেকদিন পরে আমরা আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের মত নিজেদের ভরা সংসারে হৈ হৈ করব। ছোটদের সঙ্গ নাকি তার ভাল লাগে শুনেছি মায়ের কাছে। তার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে, তবু যদিও এখনও তাকে দেখি নি।"

—"কেন—সে কথাই ত জিজ্ঞেস করছি।"

—"কারণ, আমাদের গ্রামের বাড়ীতে রেখে, মা লণ্ডনে এসে বিয়ে করে সোজা চলে যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। সেখানে বছরখানেক থেকে ছোট্ট টুপসীকে নিয়ে ফিরে এল একা।"

—"কেন ?" কুমার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—"কারণ।" মার্গারেট ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে তাকায়, "কারণ কি জান ? কারণ হচ্ছে মায়ের গায়ের রং। আমরা যেমন কালদের ঘৃণা করি, জামাইকাতেও নাকি তেমনি সাদাদের ঘৃণা করে। তা ছাড়া জর্জ নাকি খুব বড়লোক—ও সেখানে একসঙ্গে ব্যারিস্টারী এবং পলিটিক্স করে। তখন ইলেকসনের সময় আসছিল,—কালো নেতার সাদা বউ—কালোরা বরদাস্ত করতে পারত না। মার 'ইন্‌লজ'রাও বোধ হয় তাকে জ্বালাতন করত। অথচ মা আজও তার শাশুড়ীকে কোট বুনে পাঠায় আর ননদ এলে চর্বচোষ্য খাওয়ায়।"

—"কি আশ্চর্য !"

—"নিশ্চয়ই তাই। অথচ আজ অবধি, মা কখনও তার নিজের 'কাজিন'দের সহ্য করে নি। আমার বাবার এক রুগ্ন বোন ছিল। তাকে মা কখনও নিমন্ত্রণ করে আনে নি। এই নিয়ে প্রায়ই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া

লাগত মনে আছে।—বাই দি ওয়ে, আমার রচনাটা দেখা হয়ে গেছে আঙ্কল কুমার?"

—"ও হ্যাঁ, সে ত পরশুই দেখে রেখেছি," কুমার বললে,—"বেশ হয়েছে রচনা তোমার। কখন লেখ? সারাক্ষণই ত কাজ করতে দেখি, স্কুলের টাস্ক কর কখন?"

—"আঃ, সেই ত মজা, আমার গড-মাদার এসে করে দিয়ে যায়। সে লুকিয়ে থাকে আমার আঙুলের ডগায়। বাই দি ওয়ে, তোমার খাতার কপির কাগজটাও প্রায় শেষ হয়ে এল।"

—"সত্যি?" কি আশ্চর্য শক্তিময়ী এই কিশোরী—কুমার ভাবল—"কখন কর এত সব?"

—"কেন? সন্ধ্যেবেলা মা বেরিয়ে গেলে, টুপসীকে ঘুম পাড়িয়ে হোমটাস্ক সেরে নি। আর তোমার খাতাটা ত সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আমার। যখনই সময় পাই, বের করে কাজে লেগে যাই। কিন্তু সত্যি, ওটুকু কাজের জন্যে পয়সা নেওয়া উচিত হবে না তোমার কাছে। মা শুনলে রাগ করবে।"

—"বাঃ, তা কেন!" কুমার বললে,—"অন্যকে দিয়ে কপি করালে যা লাগত, তোমাকেও সেই রেট দেব।"

শুনে খুশিতে চকচক করে উঠল মার্গারেটের মুখ। ক্ষুব্ধ মনে কুমার ভাবল, এত শক্তি মিথ্যা শিক্ষায় হয়ত একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

টক্ টক্ টক্—কড়া নাড়ে কে।—"ভিতরে এস।—ওঃ মেরী! এস, এস মৌরী।"

কুমারের মুখ অভ্যর্থনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এই প্রথম ওর এ-ঘরে মৌরী পদার্পণ করল। ওর চোখ দুটো ছলছলে হাসি ভরে মেরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেরীকে দেখেই মার্গারেট উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সেই চেয়ারটায় বসল।

কুমার বললে,—"অত মুখ ভারি করো না গো, জ্বর আর নেই, তুমি আসছ শুনেই ভয়ে পালিয়েছে।"

—"বাজে বকো না।" মেরী রাগ করবার চেষ্টা করল,—"এই বুঝি…।"

—"আমাদের ছোট্ট মার্গারেট," কুমার পাদপূরণ করল।

মার্গারেট এতক্ষণ এই নবাগতার দিকে আড়ে আড়ে চাইছিল। স্বজাতীয়া হলেও সে যে ওদের কাছে প্রায় বিদেশিনী, একথা বুঝতে দেরি হয় নি। ও কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কুমার ওকে উদ্ধার করলে, বললে,—"মার্গারেট, ঐ মিষ্টির বোতলটা দাও না ভাই।" মার্গারেট বোতল এনে দিল। কুমার বললে,—"নাও না ক'টা।"

লজ্জা পেয়ে মার্গারেট বললে,—"না না।"

কুমার আবার বললে,—"সত্যি একটাও নেবে না? একেবারে নিশ্চিত?"

—"কোয়াইট সিওর।" মার্গারেট বললে,—"সত্যি দরকার নেই, আমি তা হলে এখন যাই।" আস্তে দরজা ভেজিয়ে ও চলে গেল।

—"ছি ছি, এই পরিবেশে তুমি থাক কি করে—কি করে কর পড়াশুনো?"

মেরীর কঠিন কণ্ঠে বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে কুমার দেখল মেরীর মুখের চেহারা কঠিনতর। তাতে শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণাও যেন মিশে আছে। এই পরিবেশে কুমারকে বরদাস্ত করতে পারছে না মেরীর মন। আর সেই অধৈর্য ফুটে উঠছে ওর চেহারায়। দেখে কুমারের জ্বরতপ্ত বুকের মধ্যে জোরে একটা ধাক্কা লাগল—আর সেই ধাক্কা বিদ্রোহের মত জ্বলে উঠল ওর চোখে।

কুমার গম্ভীর হয়ে বললে,—"কিছু ত অসুবিধা হচ্ছে না, বেশ ত কেটে যাচ্ছে।"

—"সব অবস্থাকেই মানিয়ে নিতে হবে, তোমার এই অদ্ভুত মত থেকেই নিশ্চয় হচ্ছে এটা? নেহাতই অবস্থার দাস তুমি।"

এই কথাটাই মেরী যদি অন্য সুরে বলত, হয় ত হেসে উঠত কুমার। কিন্তু এই কঠিন বাঁকা সুরে ওর বুকের মধ্যে ওর মায়ের দেশের পদ্মানদীর বেগ গর্জে উঠল, আর কণ্ঠ থেকে গুমরে উঠল সেই গর্জন—"অবস্থার দাস না হলে তোমার দাস হলাম কি করে?"

—"তার মানে?"

—"মানে কিছু নেই।"

—"অর্থাৎ।"

—"অর্থাৎ এখানে থাকতে আমার এমন কিছু খারাপ লাগছে না।"

'মিথ্যে কথা।" গর্জে উঠল মেরী

কুমারের প্রতি অবাধ অধিকার-বোধ কিছুদিন ধরেই মেরীকে একটু একটু করে ভুলিয়ে দিচ্ছিল যে, প্রেমিক প্রেমেরই দাস, প্রভুত্বের নয়। সব সময় প্রভুত্ব ফলাতে গেলে ফল উল্টো হয়, এখানেও তাই হ'ল। কুমারও পাল্টা গর্জন করল,—"না, না, মিথ্যে আমি বলিনি। সত্যি, এতে আমাদের কিছু এসে যায় না,—" কুমার গলাটাকে ধীরতায় নামিয়ে আনবার চেষ্টা করল,— "আমরা গরীব দেশের লোক,—এই আমাদের ভালো।"

—"বাজে কথা। গরীবিয়ানা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। দারিদ্র্য যদি থাকে, তবে তাকে পরিশ্রম ও যত্ন দিয়ে ঢেকেঢুকে রাখ, লোকের চোখের সামনে তাকে হাঁ করিয়ে রেখ না।"

—"দারিদ্র্য আমাদের ভূষণ। দারিদ্র্যই আমাদের অহঙ্কার।"

"—হাঃ হাঃ"—ছোট্ট একটুকরো ধারালো বিদ্রূপ হাসির মত শব্দ করে ঝলসে উঠল মেরীর বাঁকানো অধরোষ্ঠের প্রান্তে। আজ সারাদিন কুমারের নতুন বাসার খোঁজ এবং ব্যবস্থা করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল মেরী। তার পরে আবার জ্বরের কথা শুনে মন আরও ব্যস্ত ছিল। এসে দেখল, অসুখ বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু কি হতশ্রী ছন্নছাড়া পরিবেশ! আর তার মধ্যে দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে শুয়ে গল্পগুজব ও চকোলেট খাওয়া চলেছে। মেরীর মনে হ'ল—হয়ত ওর সব বাজে কথা। এখানে হয়ত সত্যিই আরামে ছিল। তাই মেরীকে এখানে আসতে বারণ কারছিল—কে জানে কি, আজকাল কারণে অকারণে প্রেমের মধ্যে সন্দেহের নাক চকচক করে ওঠে।

বিদ্রূপ-বাঁকানো ঠোঁটে মেরী বললে,—"আমাদেরও এককালে সেই রকম ধারণাই ছিল। সেণ্ট ফ্রান্সিসের আমলে। কিন্তু আমরা বহুদিন হ'ল সে মতবাদ পার হয়ে এসেছি। আমাদের মনের জমিতে বালি মেশানো আছে—মনের বাগান তাতে সরে সরে চলে, নতুন নতুন ফুলের ফসল ঝরে ঝরে পড়ে। তোমাদের জমিতে শুধু কাদা আর পাঁক। একবার কোন একটা মতের বীজ যদি তাতে উড়ে পড়ে, আর তার রক্ষে নেই।"

মেরীর হাসিতে আবার ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ ঝিঁকিয়ে উঠল,—"সে অতল গেঁড়ে বসবে। না হলে আড়াই হাজার বছর আগের ধারণা আজও তার শিকড় উপড়াতে পারল না।"

—"তার কারণ, আমাদের বিশ্বাসের মূল গভীর।" গম্ভীর ভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করে কুমার,—"আর তোমাদেরস বই ভাসা-ভাসা, ওপর ওপর। আমাদের জমিতে বনস্পতির অরণ্য আর তোমাদের শুধু সাজানো বাগান। তোমাদেরই গুরু ত বলেছেন যে, বরং ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট গলবে, তবু স্বর্গের দরজা দিয়ে ধনী গলবে না, তবু তোমাদের ধনের বড়াই?"

—"বেশ, বেশ।" মেরী আবার তার ক্ষুরধার হাসি দিয়ে কুমারের গুরুগম্ভীর কথাগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে দিল,—"বেশ বেশ, তোমরা স্বর্গে যেও মরার পরে,—আমরা বেঁচে থেকেই স্বর্গে যাব। এই জীবনেই গড়ে তুলব স্বর্গ, আমাদের চার পাশে।"

একটুখানি থেমে বলল,—"থাক্, যাক্ সে কথা—তর্ক আজ থাক। তোমার জন্যে ভাল ঘর ঠিক করেছি, সেকথাই বলতে এলাম। ভাল ঘর, আমার বাড়ী থেকে কয়েকটা বাড়ী পরেই। সারাদিন ধরে সেই সব নিয়েই ত ব্যস্ত ছিলাম।"

আঃ, মেরীর ঋণ ও কি করে শোধ করবে। কত ভাবে যে ওকে সাহায্য করছে। সত্যি আশ্চর্য এই মেরী, কুমারের জন্যে সহস্র অভাববোধ, ও যেন কিনে নিয়ে আসে।—এটা চাই, সেটা চাই। এ নেই, ও নেই, তা নেই শুনে শুনে কুমারের মনে হয়, সত্যিই এটা থাকলে ভাল হ'ত, ওটা নইলে চলছেই না। আগে কুমারের নীতি ছিল—না পাও ত যা আছে তাই দিয়ে চালিও নাও। কিন্তু মেরী বলে—যদি না পাও ত তৎক্ষণাৎ তা পাবার জন্যে লড়াই শুরু করে দাও। অভাবের সঙ্গে আপোষে মিতালী করো না। অভাবের সঙ্গে আপোষ যদিও না করাই ভাল, কিন্তু প্রণয়িনীর সঙ্গে যে আপোষ না করে উপায় নেই—একথা কুমারের জানা ছিল, তা ছাড়া ওর স্বভাবে ছিল ভারতবর্ষের সহিষ্ণুতার ছায়া। পরের মতকে বুঝতে পারলে তাকে স্বীকার করতে সাধারণতঃ কখনো ওর বাধে না। এমনকি অনেক সময় মনে মনে মতের অমিল হলেও তাকে পথের অমিল হতে দেয় না। কিন্তু আজ বোধ হয় শরীরটা ভাল ছিল না, আর মনটাও বহু দূরে ফেলে আসা আত্মীয়পরিজনের জন্যে আকুল হয়েছিল। তা ছাড়া এতক্ষণ ধরে জুনি বার্কারের জীবনচরিতের রহস্যলোকের অপরিচিত ছায়া এদেশের

প্রতি একটা অজ্ঞাত অবিশ্বাস ঘনিয়ে তুলছিল। সমস্ত মিলিয়ে ওর মন ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল।

মেরী বললে,—"কালই এখানকার পাট চুকিয়ে দাও। নাও, ওঠ, জিনিসপত্র প্যাক করতে শুরু করে দাও।"

ঘামে ভেজা-ভেজা কপালের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে একটু মায়া হ'ল, পরক্ষণেই মনকে কঠিন করে মনে মনেই বললে মেরী,—আগে এই গর্ত থেকে একে বের করা যাক,—তার পরে ধীরেসুস্থে আদরযত্ন করার সময় পাওয়া যাবে। মুখে বললে—"ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছিল, ও এমন কিছু নয়, এস, আমি হাত লাগাচ্ছি। দুজনে মিলে আজকেই সব গোছান শেষ করে যাব আমি বলে এসেছি—কালই তুমি যাচ্ছ।"

হঠাৎ খাট থেকে নেমে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগল কুমার। পদ্মাপারের যে জেদী স্বভাবটা ওর চরিত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা আবার জেগে উঠতে চাইল। মেরীর কর্তৃত্ব-প্রভাব ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চাইল স্বাধীন বাঙাল।

অপরের রাগ সহ্য করার ক্ষমতা মেরীরও বিশেষ ছিল না। ভালবাসার মানুষের জন্যে সে অনেক কিছুই করতে পারে, করতে পারে অনেক ত্যাগ স্বীকার—কিন্তু তার আগে অন্ততঃ সেই মানুষটির আনুগত্যটুকু ও দাবী করে।

বিস্মিত মেরী তাই প্রশ্ন করল,—"হঠাৎ এমন বিদ্রোহী ভাবভঙ্গী কেন? দেশের নিন্দে গায়ে বাজল বুঝি?"

—"বাজাটা কি অস্বাভাবিক?"

—"তা হয় ত নয়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সত্যকে স্বীকার করার শক্তি হয় ত তোমার আছে।"

—"শক্তি? মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানিয়ে তোলা মস্ত একটা ভান। প্রথমতঃ সত্য কি তা কেউ জানে না। তার পরে যতটুকু বা জানে তা স্বীকার মত শক্তি কারোরই নেই। তোমার নিজের বিষয়েই কি সত্যকে সহ্য করতে পার?"

—"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার মত সময় অথবা মন দুটোর একটাও এখন নেই আমার।" মেরীর মুখের ভাঁজে ভাঁজে অভিমানের রেখাগুলি ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ফুটে উঠতে লাগল।

মেরী বললে,—"তোমার সঙ্গে কথার খেলার প্রবৃত্তি নেই আজকে। সোজা ভাষায় শুধু বল—এ বাড়ী তুমি ছাড়বে কি না?"

—"অত নিশ্চয় করে বলতে পারি না, তবে নাও ছাড়তে পারি।"

—"তা জানি। কোন কিছুকেই নির্দিষ্ট করে বলা তোমাদের স্বভাবে নেই জানি, তার কারণ, তোমরা জীবনকে এড়িয়ে যেতে চাও সব বিষয়েই। কিন্তু এখানে আর সে কৌশল চলবে না—ডেফিনিট তোমাকে হতেই হবে। এ বাড়ী না ছাড়লে ও বাড়ীটা এখনই গিয়ে তা হলে ছেড়ে দিতে হবে।"

চকিতের মধ্যে কুমারের মনে হ'ল—ভাল বাড়ীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এদিকে রমলা এসে কোথায় উঠবে সেই ভাবনা ওকে ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তার উপরে আধছাড়া জ্বরের গ্লানি, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছিল। না ভেবেচিন্তে কুমার হঠাৎ বলে ফেলল,—"তা হলে, ওটা আমার বোনের জন্যেই রাখতে পারি।"

বলেই মনে হ'ল, না বললেই হ'ত। ছি ছি, কেন এ হীনতা এল মনে! যা ভয় করেছিল তাই হ'ল, তৎক্ষণাৎ মেরী প্রত্যুত্তর করলে,—"রক্ষে কর, ভারতীয় পুরুষদের ব্যবহারেই এখানকার বাড়ীওয়ালীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তার উপরে আবার ভারতীয় নারীদের ভার চাপাতে চাই না।"

—"ওঃ। ভারতের ওপরে যদি এতই অবজ্ঞা তা হলে—যাক, ভারতের মেয়েদের নাম তোমাদের মুখে না আনাই উচিত। তোমরা তাদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যও নও।"

—"ওঃ, ভাবছ বুঝি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসার জন্যে একেবারে আকুল হয়ে উঠেছি?"

আবার সেই শাণিত বিদ্রূপ মেরীর গলার মধ্যে হা হা করে হেসে উঠল,— "তাদের সঙ্গে বসব, হুঁঃ! চুলের গন্ধে বমি আসবে। হি!"

—"তাই নাকি?" বলতে বলতে ব্যঙ্গের গলা তেতো হয়ে উঠল, রাগ হ'ল নিজের উপরে। এ কি বলছে সে, এ কি করছে, এ কি কটু কলহের সুর তার গলায়। এই তার পৌরুষ! একজন মেয়ের সঙ্গে মেয়েলী ভাষায় ঝগড়া! নিজের উপরে যত রাগ হচ্ছে তত ঝাঁজ বেরোচ্ছে বাইরে। পায়চারি করতে করতে কুমার বললে,—"হ্যাঁ, বলবই ত, হাজার বার বলব।

ভারতীয় প্রেমিক রাখতে আপত্তি নেই, ভারতীয় ভাড়াটে রাখতেই যত আপত্তি ?"

ধীরে উঠে দাঁড়াল মেরী। ক্রোধে ও অপমানে ওর মুখ ঘন লাল হয়ে উঠেছে। ও চাপা গলায় গর্জন করে উঠল,—"বার্বারাস।"

তেমনি মুষ্টিপাকানো হাতে পায়চারি করতে লাগল কুমার,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্বর তো বটেই।"

জোরে জোরে পা ফেলে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মেরী। শান্তভাবে বললে,—"তুমি তা হলে এ বাড়ী ছাড়বে না ?"

—"না।" গর্জে উঠল কুমার।

আরও শান্ত গলায় মেরী বললে,—"তা হলে তোমাকে আমার ছাড়তে হ'ল।"

সেদিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল কুমার, তার পরে দু' হাতে মাথা টিপে চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। আগুনের মত কিসের একটা তরল প্রবাহে ওর সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে যেতে লাগল।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মেরীর পায়ের শব্দ খট্ খট্ করতে করতে নেমে গেল। কুমার বুঝল, জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। এখনও হয় ত ছুটে গিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আর যেন তেমন প্রয়োজনও নেই,—নেই ইচ্ছেও।

বিকেলের নরম আলো শীতের ভয়ে পালাই পালাই করতে করতেও মেরীর রেশমের মত লালচে চুলের জালে আটকে রইল। খট্ খট্ করে হেঁটে হেঁটে টিউব স্টেশনটা পার হয়ে এল মেরী। এই মুহূর্তে ভূ-গর্ভে নামতে ইচ্ছে করছে না, মনটা একটু আলোবাতাস চাইছে, যে আলোবাতাস মানুষের হাতে তৈরি নয়।

বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে উঠল মেরী। এই মুহূর্তে যেন বাসের দেরি হওয়া ছাড়া আর কিছু ওর ভাবার নেই। মনের ভিতরটায় একটা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে চায়, সভ্যতার পালিশের নীচে তাকে চাপা দিয়ে রেখে মনের সক্রিয় অংশটা ভাবতে চেষ্টা করে কতক্ষণ আর

বাসের জন্যে দাঁড়াতে হবে। তবু থেকে থেকেই সে ভাবনা ভুলে অন্যমনস্ক মন কুমারের সঙ্গে কাল্পনিক তর্কে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় ওর গালের উপরে ছায়া ফেলে বিকেলের হারিয়ে-যাওয়া রক্তিমা। লালমুখে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের জন্যে।

আশেপাশে সবাই চলে গেছে। এ নম্বরের খরিদ্দার বুঝি সে একাই। না, ঠিক একা নয়, শুধু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মেয়ে। গায়ের রং এবং চেহারা দেখে তাকে ইউরোপীয় মনে হয় বটে, কিন্তু ইংরেজ বলে নয়। হতে পারে পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিনী কিন্তু পরণে ভারতীয় নারীর পোশাক—শাড়ি। আর বিশেষত্ব আছে তার গায়ের মোটা পশমের কোটে। হাঙ্গেরীয়, কি বুলগেরিয়া, কি যুগোশ্লাভিয়া কোথাকার বৈশিষ্ট্যের ছাপ অবশ্য বোঝা গেল না। মেরীর মনে হ'ল—ওর সর্বাঙ্গে বিচিত্র দেশ একসঙ্গে মিলে একটা যেন সচল মিউজিয়ামের মত লাগছে। শীতের বিকেলে, সোনার ছোপ ধরার আগেই আলোগুলো কম্বলের নীচে ঢুকতে শুরু করেছে। সেই কম্বল-মোড়া মলিন আলোয় বিদেশিনীর কপালের টিপটা ম্যাড ম্যাড করছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত মেরীর হঠাৎ নিজের কথা মনে হ'ল। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে!

ভারতীয় নারীদের পোশাক খুব আর্টিস্টিক সন্দেহ নেই, এমনকি রোমান্টিকও বলা যেতে পারে। কিন্তু তা যতক্ষণ ভারতীয় নারীর অঙ্গে থাকে ততক্ষণই। ইউরোপীয় মেয়েদের ভারতীয় পোশাকে নিতান্তই বিসদৃশ লাগে। এত দিন অবশ্য ওর এ মত ছিল না, বরং কুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে ও যে অনেক শাড়ি-গয়নার মালিক হবে, এ খবর শুনে ওর ভালই লেগেছিল। কিন্তু আজ মনে হ'ল, ভাগ্যিস! ও রকম কিম্ভুতকিমাকার জীবে পরিণত হওয়ার চেয়ে আমাদের এই রকম স্মার্ট পোশাকই ভাল। একমাত্র ফ্যান্সী ড্রেস ছাড়া বিলিতী মেয়েদের দেশী পোশাকে মানায় না। যদি আজকের ঘটনাটা না ঘটত তা হলে শীগ্‌গিরই হয় ত ওকেও এই পোশাকে এই রকম ভাবে দেখা যেত। উঃ, খুব বেঁচে গেছে।

ওর দিকে তাকিয়ে একটা অর্ধস্ফুট হাসির সূক্ষ্ম রেখা ওর ঠোঁটের কোণে বেঁকে গেল। সে হাসি ভাল করে ফিরিয়ে দিল মেয়েটিকে। বললে—"তুমিও কি ৭৪-এর খরিদ্দার?"

—"ধরেছ ঠিক। দেখ, তোমার ভাগ্যে ঐ বুঝি এসে গেল।" দূর থেকে আসন্ন বাসের নম্বরটাকে যেন ৭৪-এর মতই ঠেকল।

—"কার ভাগ্যে বলা কঠিন।" মেয়েটি বললে—"আমিও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। তুমি অন্যমনস্ক ছিলে বলে লক্ষ্য কর নি।"

"তা হবে।" ওরা দুজনেই লাফিয়ে উঠে পড়ল বহু প্রতীক্ষিত বাসে এবং ভাগ্যক্রমে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে বসে পড়ল পাশাপাশি।

মেয়েটির বিষয়ে অভদ্র কৌতূহল বার বার মেরীর মনে মাথা নাড়া দিয়ে উঠছিল, ও তাতে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে চোখ বুলিয়ে চলল।

মেয়েটি স্মিতমুখে তার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল।

মেরী কাগজের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ইংরেজীর মাধ্যমে বাংলা সহজ শিক্ষার বই। কে এই মেয়েটি—বাংলা ভাষায় ওর প্রয়োজন কি? যে ওকে শাড়ি-সিঁদুর পরিয়েছে সে বুঝি তা হলে আর একজন বাঙালী প্রবঞ্চক? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় মেরীর। কিন্তু ভদ্রতার ঐ সূক্ষ্ম আবরণটুকু ভেদ করতে পারে না, সরাতে পারে না ঐ একফালি কাগজের আড়াল।

বাসের গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসছে। এই আপিসভাঙার মুখে, লণ্ডনের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে 'বাসে' করে যাবার শখ হঠাৎ হ'ল কেন ভাবে মেরী। কুমার এখন কি করছে কে জানে। কিন্তু ওর কথা ভাবতে আর ইচ্ছে নেই—তার যা খুশি করুক, নরকের মধ্যে পড়ে থাক—ঘুচে গেছে দু'দিনের চেনাশোনা—এ ভালই হয়েছে। যে দেশ বর্তমানকে হারিয়ে এখনও অতীতে বাস করে, সেই ভূতের দেশে থাকতে পারত না মেরী। সে মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, তার কোনটাই ওর জীবনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে নি। চিন্তাকে কাজে খাটাবার মত শক্তির সম্বল ওর নেই, ওদের কারোরই নেই।

মনে মনে বিতর্ক করতে করতে মেরী যখন আবার ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, বাস তখন একটা ধাক্কা দিয়ে থামল। বিরক্ত হয়ে মেরী বাইরে তাকিয়ে দেখে, এত ভিড় যে বাস যেন চলতেই পারছে না। যাত্রীরা সবাই এক-একবার হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে।

সকলেরই সন্ধ্যাবেলায় জরুরী কোথাও দরকার থাকে। কিন্তু বাস না

নড়লে আর কে কি করবে ? সব অধীরতা মনের বাক্সে ঠেসেঠুসে বন্ধ করে রেখে নিঃশব্দে যে যার জায়গায় বসে কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ভিড়ের দিকে আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে নিঃশব্দে চেয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

হঠাৎ ফিসফিসিয়ে চাপা গলায় পাশেই কে বলে উঠল—"চিনতে পার ?"

চমকে ফিরে তাকাল মেরী। কে তাকে ডাকল ?—না, তাকে নয়, সেই মেয়েটিকে। মেয়েটি সরে এসে ওকে বসবার জায়গা করে দিল। লোকটা খাঁটি ইংরেজ সন্দেহ নেই। মেরী ফিরে দেখল, ওরা চাপা গলায় কথা কইছে।

গলার স্বরে ও ভাবভঙ্গীতে অতীত রোমান্সের ইঙ্গিত। "তুমি কি শেষ অবধি ভারতীয়কেই বিয়ে করলে নাকি ?"

"দূর, বিয়ে করি নি, শুধু ভালবেসেছি।"

"হ্যাঁ, ভালবাসায় তুমি ওস্তাদ জানা আছে।"

"দূর দূর, তুমি কিছু জান না।" স্বরে বিদেশী টান এনে মেয়েটি বললে—"এ সে ভালবাসা নয়।"

"তবে কি ?"

"সে আর এক রকম।"

"অর্থাৎ ?"

মেয়েটি অল্প হেসে মাথা দুলিয়ে বলল,—"এই বাসে বসে কি বলব, একদিন এস, তা হলে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এ জিনিস বলা যায় না, এ দেখতে হয়।"

"কি দেখতে যাব ?"

"যাকে আমি ভালবাসা বলি।"

"ফুঃ, আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি না, তোমার যত বাজে রোমান্স। ভালবাসা ভালবাসাই, তার মধ্যে রকমফের নেই।"

"বেশ তবে তাই।"

"যা হোক তোমার ঠিকানা দাও।"

"কি করবে ঠিকান দিয়ে ?"

"তোমার মানুষটিকে একবার দেখে আসব।"

"হা হা।" ছোট ছোট হাসির খুট্‌ খুট্‌ একটু তরঙ্গ তুলে মেয়েটি বললে—'হা হা দেখতে পাবে না।"

"কেন ?"

"কারণ সে মানুষ ভূগোলের মাপকাঠিতে আছে অনেক দূরে, দু'তিনটে সাগর পেরিয়ে। আর বাস্তবে আছে বড় বেশী রকম কাছে, তোমার নজরের বাইরে। একেবারে আমার মনের ভিতরে।"

ওদের চুপি চুপি কথা একটা জমাট ফিসফিসানিতে পরিণত হ'ল। কান খাড়া করে অবাক হয়ে শুনতে শুনতে কাগজটা খসে পড়ল কোলের উপরে। সেই শব্দে চকিত হয়ে আবার মেরী সে কাগজটা তুলে নিল মুখের কাছে। ভাবলে, ওর ঠিকানাটা জেনে নিতে হবে। যেতে হবে একদিন ওর আস্তানায়। দেখতে হবে, ব্যক্তিহীন ভালবাসা বলে সত্যি কোন পদার্থ আছে কি না।

ছেলেটি বললে—"তবে তোমার ঠিকানায় গিয়ে কি দেখব ?"

"কেন আমাকে।"

"সে ত এখানেই দেখতে পাচ্ছি।"

"সেখানে গেলে দেখবে আমার কাজ, যার মধ্যে আমার যথার্থ পরিচয়, সার্থক সত্তা।

"বেশ যাব, ঠিকানা দাও। পকেট থেকে নোটবুক বার করে ঠিকানা টুকে নিল, মেরীর মনে হ'ল লেস্টেস স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা ঠিকানা। হঠাৎ হাতের কাগজটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চেষ্টায় মনের সঙ্কোচটাও ফেলে দিয়ে মেরী বললে—দুঃখিত, তোমার কথার টুকরোগুলো একটু একটু কানে যাচ্ছিল। তা থেকে মনে হচ্ছে, কি একটা ইণ্টারেস্টিং এক্সপেরিমেণ্টে তুমি ব্যস্ত। তা সেখানে কি সাধারণের প্রবেশ চলতে পারে ? মানে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে।"

প্রথমে অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটি। পরক্ষণেই বিদেশী উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর হাত ধরে বললে—"নিশ্চয়ই। আমরা ভীষণ খুশি হব। সামনের শনিবার আমাদের বক্তৃতা আছে, চারটের সময়। এস সত্যি। নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে। তুমিও শনিবারেই এস, এরিখ।"

এরিখ বললে—"চারটের সময় ত টী-টাইম। সে সময় কি লেকচার জমবে ?"

"নিশ্চয়ই, চাও থাকবে, লেকচারও থাকবে। ভাবনা নেই।"

"আচ্ছা তা হলে শনিবার পর্যন্ত। যদিও হঠাৎ বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত যাই।"

এরিখ যুগোপযোগী ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে হাসল—"কিন্তু উপায় নেই. সভ্যতার দায় বইতে আমাকে এর পরের স্টেশনেই থামতে হবে।"

"সভ্যতার দায়? অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ রোজগারের চেষ্টা।"

"আহা, তুমি শেষ অবধি সে কাজটা ছাড়লে বুঝি? আবার সেই পাবলিশারদের পিছনে ঘুরছ নাকি?"

"ধরেছ ঠিক।" এরিখ তার সেই রপ্তকরা সিনিক্যাল হাসি হাসে,—"লেখক হবার শখ আমার জীবনে ঘুচবে না। কিন্তু আজ এই পর্যন্ত।"

বাস থামতে না থামতে ও লাফিয়ে নেমে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে দুষ্টু ছেলের প্রতি মায়ের মত ছোট্ট একটু স্নিগ্ধহাসি হাসল ক্যাথারিন।

ঠিকানাটা দেখে নিয়ে মেরী বললে,—"এখানে কি তুমি থাক, না এটা তোমাদের ক্লাব?"

—"থাকিও বটে, ক্লাবও বটে, ফ্যাক্টরিও বটে।"

—"ফ্যাক্টরি?"

—"হ্যাঁ, আমার ছোট্ট ফ্যাক্টরি। আমার দুটো ছোট তাঁত আছে, তার একটাতে পশমের স্কার্ফ বুনি। আর একটাতে মোটা সুতোর ব্যাগ, ইত্যাদি।"

মেরীর চোখে উৎসাহ চক্‌চক্ করে উঠল। বললে,—"হাউ ইন্টারেস্টিং, কি মজার!"

বলেই নিজেকে সংশোধন করলে, আর সেই প্রয়াসটুকু ধরা পড়ল ক্যাথারিনের চোখে। ওরা যে ইংরেজ,—সবজান্তার জাত। কোন কিছুকেই নতুন বলে স্বীকার করতে ওদের বাধে। যেন সব নতুন খবরই ওদের জানা।

মেরী বললে,—"হ্যাঁ, শুনেছি বটে, হাঙ্গেরীর মেয়েরা তাঁত বোনে।"

—"তোমার অনুমান সত্য, তবে আমার দেশ হাঙ্গেরীতে নয়—রুমানিয়ায়।"

—"রুমানিয়া, সে আবার কোন্ দেশ ?" যেন যে দেশের কথা মেরী জানে না, সে দেশের অস্তিত্বই প্রায় হাসির ব্যাপার।

ক্যাথারিন কিন্তু রাগ করে না, হাসে। বলে,—"দেশটা অখ্যাত বটে, তবে এখনও জগতের মানচিত্রের সামান্য একটু জায়গা দখল করে আছে।"

—"দুঃখিত।" বললে মেরী,—"মনে পড়েছে সত্যি। রাশিয়ার অধিকারে যে ছোট ছোট দেশগুলি আছে রুমানিয়া তার অন্যতম। কিছু মনে করো না, আমি প্রথমটা ঠিক ধরতে পারি নি।"

—"তাতে আর কি হয়েছে,—" ক্যাথারিন মিষ্টি হাসল,—"ও রকম ভুল হয়েই থাকে। শনিবার কিন্তু আসতে ভুলো না।"

"না না, নিজেই সেধে নেমন্তন্ন নিয়ে কি আর ভোলা যায়? আমি কিন্তু সত্যিই দুঃখিত। তোমাকে এতক্ষণ বকালুম।"

—"মোটেই না, আমি তাতে খুশিই হয়েছি। তা হলে চলি, আমাকে নামতে হবে এইখানেই।"

ও বাসের দরজার কাছে গিয়ে দাড়াল। ধোঁয়াটে সন্ধ্যার বিজলী-বাতিগুলি রাস্তার ধারে ধারে ম্যাড় ম্যাড় করছিল। না দিচ্ছিল আলো, না দিচ্ছিল অন্ধকার। সেই সর্বব্যাপী ধূসরিমার মধ্যে ক্যাথারিনের ঘন-সবুজ শাড়িটা, গাঢ়তর ছায়া ঘুরিয়ে দ্রুত ধাবমান বাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেরী ভাবল, লণ্ডনে এত বিদেশীর ভিড় যে, ইংরেজকে খুঁজে প্রায় পাওয়াই যায় না। মনে হয়, চেষ্টা করলে বিদেশীরা জোট বেঁধে শহরটা হাত করতে পারে। জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক চোখ মেলে দিল মেরী। এতক্ষণে ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে। গতিতে একটু বেগ ফিরে পেয়েছে যন্ত্রযান। থর থর করে কাঁপছে তার দেহ।

হঠাৎ মেরীর রবার্টের কথা মনে পড়ে গেল। সাত বছর আগের এমনি এক ধূসর সন্ধ্যায় মেরী যাকে বিয়ে করেছিল।—তখন যুদ্ধের আশঙ্কা চারিদিকে থমথম করছে।—মেরীর বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী নয়। 'মলি'র দাদা রবার্ট ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ছোটবেলা থেকেই তো ওরা পরস্পরকে কত দেখেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু সে দেখা যেন দেখাই নয়। এতদিন

যেন ওদের দুজনের কাছে দুজনের কোন অর্থই ছিল না। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় 'মলি'র বইগুলি ফেরত দিতে গিয়ে রবার্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করল যে রবার্টকেই সে ভালোবাসে,—আর কাউকে নয়। তখন যুদ্ধের ডাকে সব মেয়ের মনের মধ্যে শঙ্কারা দুরু দুরু করে উঠছিল। রবার্ট বলেছিল,—"মেরী, এতদিন কেন কিছু বল নি? আজ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তোমাকেও যে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। যুদ্ধের ডাক আর তোমার ডাক কেন একসঙ্গে এল?"

কি আশ্চর্য! মেরী ভাবে, ওর জীবনে সব কিছুই আসে এমনি অকস্মাৎ। এমনি অভাবনীয়ভাবে একমুহূর্তে বিপুল অনুভব ওর শিরায় শিরায় প্রাণবেগকে জ্বালিয়ে তোলে। তখন মনে হয়, এইটেই ওর জীবনের চরম সার্থকতা। রবার্টের সঙ্গে কতদিনই বা ছিল। বছরখানেকের বেশী নয়। কিন্তু টোনি যখন কোলে এল,—তখন আর কোন কথাই মনে রইল না মেরীর। মনে আছে, টোনিকে বুকে জড়িয়ে কি অদ্ভুত খুশিতে মেতে উঠত ওর মন। ও যখন লাল লাল ফুলো ফুলো ছোট হাতে মুঠি করে ধরতে চাইত মায়ের স্তন। যত পারত না, তত বার বার নিস্ফল চেষ্টায় আয়ত্ত করতে চাইত ওর খাদ্যভাণ্ডার। তখন কি সুখে পুলকিত হয়ে উঠত মেরী। ডাক্তার বলেছিল, ওর সম্পূর্ণ পেট ভরাতে গেলে, তুমি হয়ত রোগা হয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে স্বাস্থ্য। তার চেয়ে ওকে দুবার তুমি খাওয়ায়, আর তিনবার গ্লাকসো দাও। কিন্তু মেরী শোনে নি। ও টোনিকে পাঁচবারই খাওয়াতে চায়। ওর বুকের খাদ্যেই তৃপ্ত হোক টোনি। ওর প্রাণ থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাক সে। একথা রবার্টকেও লিখেছিল মেরী। সে তখন ফ্রান্সে যুদ্ধ করছে।

মেরী লিখেছিল, টোনি আমার কাজ ও অবসর সমস্ত সময় ভরিয়ে রেখেছে। তোমাকে আর মনে পড়ে না। উত্তরে রবার্ট লিখেছিল,—"হিংসে হচ্ছে ক্ষুদে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে। আমায় রাজ্যে ওর অনধিকার প্রবেশ।" সেই ওর শেষ চিঠি। যুদ্ধের প্রথম দিকেই ও বন্দী হয়েছিল। তারপরে জার্মানীর concentration camp-এ কতদিন আর টিকবে? সবাই বলে ও মরে গেছে নিশ্চয়, শহীদস্তম্ভের একজন অজ্ঞাত সৈনিক। আবার কেউ কেউ বলে, সাউথ আমেরিকায় গিয়ে নতুন করে ঘর বেঁধেছে। মোটকথা, আর চিঠি পায়নি মেরী ওর কাছ থেকে। কর্তৃপক্ষও তো কোন খোঁজ দিতে পারেন নি।

হঠাৎ এতদিন পরে রবার্টকে মনে পড়ে যাওয়ায় মেরী তার চেহারাটা মনে করতে চাইল। ভালো করে মনে পড়ল না কিন্তু। অবাক হয়ে মেরী দেখল, মন তার অজান্তেই কখন ধীরে ধীরে মুছে ফেলেছে তার ছবি, যাকে সে মনে আনতে চায়নি। শুধু তার জীবন থেকে নয়, মন থেকেও সরে গেছে রবার্ট অনেকদিন আগেই। কিন্তু টোনি? টোনিকে নিয়েই তো তার জীবন ভরে থাকতে পারত। কিন্তু পারত কী বোধহয় না। সেই শিশু টোনি তো আর নেই। দুটো কচি দাঁত দেখিয়ে যার ফোকলা মুখের হাসি ওর নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে ভুলিয়ে রাখত। নাঃ, আর সে দিনগুলিতে ফিরে যাবার উপায় নেই। এখন সেই শিশুর মধ্যে নতুন মানুষ এসে দেখা দিয়েছে। ছ'বছর বয়স থেকেই সেই নতুন মানুষকে তার নিজের বিশেষত্বে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। উদ্ধার করতে হবে মায়ের স্নেহের হাত থেকে,—গুটিয়ে ফেলতে হবে ডানা। পাখীকে নিজে নিজেই শিখতে হবে কেমন করে উড়তে হয় স্বাধীন আকাশে। তাই টোনিকে বোর্ডিং-এ দিয়েছে মেরী। কর্ণওয়ালে সমুদ্রের ধারে ছোট গ্রামের একটা বোর্ডিং। যেখানে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য অকপটে বিস্তার করবে, টোনির জীবনের উপরে আপন প্রভাব। ওইখানেই মেরীর মাসির একটা বোর্ডিং হাউস আছে। শনি-রবিবারে মাসি ওকে দেখাশোনা করতে পারবে। এইটেই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হয়েছিল, কারণ লণ্ডন শহর শিশুদের থাকবার উপযুক্ত নয়। অথচ মেরীকে তো কাজের জন্যে ওখানে থাকতেই হবে। মেরী যে স্কুলটিচারী করে, ওকে দেখলে নাকি বোঝার যো নেই সেকথা। কুমারও প্রথমদিনেই সেকথা বলেছিলো,—"তোমার কাজটা তোমার সঙ্গে বেখাপ্পা বেমানান।"

হঠাৎ মেরীর সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল। কুমার আগে কিরকম ছেলেমানুষ ছিল, কী আশ্চর্য 'মুগ্ধ' ভাবেই না ওর দিকে চেয়ে থাকত। আর তাই নিয়ে মেরী তার বন্ধুদের সঙ্গে কী হাসাহাসিই না করত। হঠাৎ একদিন উল্টে গেল পাশা। মেরীর হাসি বন্ধ হয়ে এল—বন্ধ হল চেয়ে থাকার পালা। মেরী প্রতিজ্ঞা করেছিল,—যদি কখনো সত্যকারের মনের মানুষের সন্ধান পায়, তবেই আবার বিয়ে করবে, নইলে নয়। দিনগুলি তো কেটে যাচ্ছে মন্দ নয়। পুরুষবন্ধুও তো অনেক আছে। তাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে, নাচে-গানে, সিনেমা-অপেরায় অবসরগুলি তো আর আলুনি

আলুসেদ্ধর মতো পানসে হয়ে থাকে না। অবশ্য মনের মানুষের সন্ধান সত্যিই কোনদিন পাবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল মেরীর। কুমারকে দেখে কেন সেদিন হঠাৎ মনে হোল, যে, ও সত্যকে দেখছে,—মানুষটা নির্ভেজাল। সত্য মানুষ কি মনের মানুষ হতে পারে? ওরা সেদিন সবাই মিলে টোনিকে নিয়ে 'কিউ গার্ডেনে' গিয়েছিল। ওদের পুরো দলটা— মার্কাসরা দুভাই—গিবন,—সুসান, এঞ্জেলা। কিছুক্ষণ ঘুটেটুরে ক্লান্ত হয়ে ওরা সবাই লম্বা হয়ে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়েছিল, আর তখনি দেখতে পেয়েছিল, একেবারে ওদের মুখোমুখী শুয়ে আছে অনন্ত আকাশ। কুমার এত অবাক হয়েছিল, যে, মেরীর মনে হোল যে, ও আগে বোধহয় কখনো এমন করে শোয়নি। যদিও ও খোলা আকাশের দেশের মানুষ, তবু বোধহয় এমন করে আকাশের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি কখনো।

বিহ্বলভাবে চারিদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মেরীর দিকে চেয়ে কুমার বলে উঠেছিল,—"একী মেরী, তোমার নীল চোখে আকাশের ছায়া"।— আর তোমার চোখে সত্যের, মেরী মনে মনে বলেছিল, যদিও কথাগুলো স্তুতির মতোই শুনতে, তবু ওগুলো যে তোমার কাছে কত সত্য তা বুঝতে বাকী নেই। সেদিন কী একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে ওদের শুনিয়েছিল কুমার, তার মানেটা মনে নেই। কিন্তু মনে আছে ধ্বনিটা সুন্দর। সেই প্রথম ওর মুখে একসঙ্গে অনেক কথা শুনেছিল মেরী। টোনি অবাক হয়ে নতুন ভাষা শুনছিল ওর দিকে চেয়ে। টোনি তখন কুমারকে ভালোবাসত। চকোলেট দিয়ে আর সিনেমা দেখিয়ে কুমার ওর সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল। সিনেমা দেখে ফিরে এসে ও যখন গাল ফুলিয়ে চোখ বড় করে অর্ধেক কথা মুখে রেখে গল্প বলত, তখন কুমার চুপ করে বসে শুনত আর মিটিমিটি হাসত শুধু। ও যে এত কথা বলতে পারে এত তত্ত্ব আলোচনা করে, তা জানা ছিল না মেরীর।

মেরীর মুখের দিকে স্পষ্ট করে চাইতেও তখন লজ্জা পেত কুমার। শুধু শাঁখের মত সাদা লম্বা গলার দিকে চেয়ে চুপ করে থাকত। ওর মনকে জাগিয়েছে মেরী সন্দেহ নেই। ওকে খেতে দিয়েছে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল। আজকাল এক-একবার মনে হয়, না খাওয়ালেই বোধহয় ভালো হোত। ওর সেই মুগ্ধ চোখের সরল চাওয়ায় অনেক বেশী শান্তি ছিল,—এখন এই যে

বাসনার বহ্নিজ্বালায় ওর ভিতরটা ধোঁয়াতে শুরু করেছে। অথচ জ্বলে উঠতে পারছে না,—বোধহয় ওর পরিজনের ভয়ে আর ভারতীয় সংস্কারের চাপে, এর চেয়ে সে ছিল ভালো। মেরীর মত মেয়ে যে ওকে ভালোবাসতে পারে, এ ওর ধারণার অতীত ছিল। তাই ওর উন্মথিত যৌবন-বেদনা দেখে মেরী নিজেকে ধন্য মনে করেছিল।

প্রথম প্রেমের রূপ কেমন হয়, মেরীর তা ভালো করে জানা ছিল না। কবে কোথায় খেলাচ্ছলে কতজনের সঙ্গেই একটু-আধটু প্রেমের অভিনয় করতে করতে যেদিন প্রথম রবার্টকে ভালো লেগেছিল, সে একটা খুব তীব্র টান সন্দেহ নেই। তবু তা প্রথম নয়। তার মধ্যে এত রহস্য, এত রোমাঞ্চ, এত অজ্ঞাত বাসনার মূঢ় দহন ছিল না। বাসের জানালা দিয়ে বাইরে মেলে দেওয়া দৃষ্টির সামনে, অন্ধকার একটু-একটু গাঢ় হয়ে তার গায়ের উপরে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলল রাস্তার বাতির আলো। যাত্রীনিয়ন্ত্রী এসে বললে,—'মিস্, তুমি কোথায় নামবে'? আর যেখানেই হোক, এখানে নয়,—ঐ দেখা যাচ্ছে হীথের ঢালু মাথা। স্তূপ স্তূপ নির্জনতা চারিদিকে ম্যাড ম্যাড় করছে। নাঃ হ্যাম্পস্টেডে সে নামবে না। তার চেয়ে বাড়তি দামটুকু দিয়ে সে চলে যাবে আবার দক্ষিণ দিকে।

যাত্রীনিয়ন্ত্রিণী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে টিকিট কাটলে, বিড় বিড করে বললে, আজকালকার মেয়েদের মন বুঝবে কে? নিশ্চয়ই কোন প্রেমের ব্যাপার। মেরী তার লম্বা গলার শেষে ঘাড়ের প্রান্তে সোনালী চুলের ঝালর দুলিয়ে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। যদিও পড়লে না এক অক্ষরও, তবু কারু সঙ্গে আজে বাজে গল্প করার মত মন নয় এখন তার। আচ্ছা, কুমার এখন কি করছে? কাল এমন সময়ে কে জানত যে, আজ এমন সময়ে হঠাৎ একটা তুচ্ছ কারণে, কুমারের সঙ্গে এই একবছরের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। সত্যিই কি একেবারে ছিঁড়ে গেল তার? কুমার কি ইচ্ছে করেই ছিঁড়ে দিল? ওর বোন আসবে সেই ভয়ে? ওর সেই রমলা? আঃ রমলাকে মনে মনে ঈর্ষ্যা করে মেরী। বোনই হোক আর যেই হোক, সে কুমারের কিশোর মনকে শ্রদ্ধা ও কল্পনায় রঙীন করে রেখেছিল, সন্দেহ নেই। মেরীর কাছেও তো কুমার শ্রদ্ধা নিয়েই এসেছিল। তবে কেন শুধু সেইটুকুতেই খুশী রইল না মেরী? কেন চাইতে

গেল ওর সবটা? সবটার জন্যে বোধহয় তখনো প্রস্তুত ছিল না কুমার। নারীর আহ্বানে, ওর মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছে পুরুষ। কিন্তু সেই নবজাতক তার বিরাট ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করতে এখনো কেন কেবলি দ্বিধা করছে? কিসের ভয়ে? ভাবতে চেষ্টা করে মেরী। ওর বাড়ীর ভয়েই বোধহয়, ওর পরিবার পরিজনের ভয়ে, যেমন শতকরা নব্বই জন ভারতীয় ছেলে করে থাকে, মা, বাবা, আর বিশেষ করে ঐ রমলার ভয়ে।

নিরুপায় ক্রোধ মেরীর চোখের মধ্যে জ্বলতে লাগল। নিশ্চয়ই, কুমার আজ ইচ্ছে করে ঝগড়া করছে ওর সঙ্গে। না হলে কেন এতদিন নিজের পরিবারের সবার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল সব কথা। অথচ মুখে তো কত কথাই বলত। তার মা নাকি ইংরেজী না শিখেও এত আধুনিক যে, কুমার যাকে ভালোবাসবে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। আর মেরীকেই যদি গ্রহণ করতে পারেন, তবে তার ছেলেকেই বা ভালোবাসবেন না কেন? মিথ্যে কথা! একবর্ণ বিশ্বাস করে না মেরী। ভারতীয়েরা যেমন ধূর্ত, তেমনি মিথ্যেবাদী। কত ছেলে তো এমনি এসে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে, শেষে লুকিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। যাক গে, কুমারের কথা আর ভাবতে পারছে না মেরী, তার চেয়ে টোনির কথা ভাবা যাক। মেরী কি টোনির কাছে চলে যাবে? ওখানে গিয়ে একটা কোন কাজের চেষ্টা করবে? নাকি মাসির বোর্ডিং হাউসেই সাহায্য করবে?

না না, মেরী এমন ক'রে নিজেকে একটা গ্রামের নগণ্য পরিবেশে শুধু শান্তির মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেবে না। শুধু বুড়োদের আর শিশুদের মধ্যে থেকে ওর যৌবনকে পিষ্ট হয়ে যেতে দেবে না। টোনির জীবন আর ওর হাতে নেই, বুঝেছে মেরী। এই ছ'বছর বয়সেই টোনি ওর কাছে পর হয়ে যাচ্ছে। যাবেই তো, পর হয়ে যাবার জন্যেই তো এসেছে ওরা,—ভাবী মানবের দল। মায়ের অস্তিত্ব ওদের মস্ত বাধা। মা যদি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু সন্তানের মধ্যেই সার্থকতা খোঁজে, তবে সেই প্রবল আকর্ষণ কি সন্তানের স্বাধীনতা খর্ব করে তার জীবনকে পঙ্গু করে ফেলতে চাইবে না?—না টোনির জীবনে আর ওর তেমন স্থান নেই। টোনি ওকে যতই ভালোবাসুক, কোথায় যেন বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে গেছে। টোনির চোখে ও সন্দেহের ছায়া দেখেছে। শিশুর চোখে ভাবীপুরুষের সন্দিগ্ধ চোখের ছবি। আজকাল আর কুমারকে

ভালোবাসে না ও। কুমারের কথা উঠলেই তীব্র মন্তব্য করে,—কেন বুঝতে পারে না রমলা, ওইটুকু ছেলে কি বুঝেছিল কে জানে? কিন্তু বোর্ডিংএ রেখে আসবার সময় সন্দেহে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—“তুমি কি ঐ ভারতীয়টার সঙ্গে থাকবে না কি”? মেরী এত অবাক হয়ে গিয়েছিল,—যে কথা বলতে পারে নি। ছ'বছরের শিশু গর্জে উঠেছিল,—“আমি ও লোকটাকে ঘৃণা করি।”—ভাবতে ভাবতে মেরীর প্রাণ যেন রুদ্ধ হয়ে এল। বাসের মধ্যে সে একলা যাত্রী। জানালার বাইরে জনহীন রাস্তার দুধারে রুদ্ধদ্বার বাড়ীগুলির বন্ধ কাচের জানালা থেকে যা দেখা যাচ্ছিল, তা আলো নয়, আলোর ছায়া।

সিটের পিছনে হেলান দিয়ে মেরী চোখ বুজল। বাসটা গজন করতে করতে ছুটছে। হঠাৎ মেরীর মনে হোল, ও যেন ভূতের গাড়ীতে চলেছে। এখনই যেন দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন্ মৃত্যুলোকের শূন্যে শূন্যে উধাও হয়ে যাবে। নিজের হাতের দিকে চোখ পড়ল মেরীর—তারাও আপন বিশিষ্টতা হারিয়ে ভূতের হাতের মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে।

সে নিজেও কি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে—না সেও ভূত? ফুরিয়ে-যাওয়া মৃতজীবনের বোঝা বয়ে ছুটে চলেছে এই বাসটারই মত। কেন? কিসের জন্যে? উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য কোথায়? এই সব প্রশ্নগুলি একসঙ্গে মেরীর মনের মধ্যে একটা প্রশ্নচিহ্নের মত জেগে রইল। অবাক হয়ে মেরী ভাবল—শেষে কি ওকে পুবদেশের ফিলজফির নেশায় পেয়ে বসল? কুমার কি যাদু করেছে ওকে? এই জন্যেই বোধ হয় অনেকেই তাকে সাবধান করতে আসত—ভারতীয় ছেলের সঙ্গে অত মিশো না, ভারতের ঐ সর্বনাশা ফিলজফি তোমায় হজম করে ফেলবে।

কে জানে কেন এত সব কথা মনে হচ্ছে আজ। এই অদ্ভুত ভয়, আর অদ্ভুত ভাব। কুমারের সঙ্গে কি এই চির-বিচ্ছেদ হয়ে গেল? আর কি কখনও দেখা হবে না? কিংবা যদি বা হয়, দুজনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আর কখনোই হয় ত তেমন করে কাছাকাছি আসা হবে না। কেজানে কি হবে। কিন্তু শনিবার দিন ঐ বিদেশী মেয়েটির আস্তানায় একবার যেতে হবে। দেখতে হবে, ওর মধ্যে কতখানি

সত্যি। সেই সত্য দিয়ে কুমারকে হয়ত খানিকটা বোঝা যাবে। হয়ত যাবে না।

ছুটে চলেছে বাস। দু'ধারে রুদ্ধদ্বার দোকানগুলির পুরু কাচের ভিতর দিয়ে বিচিত্র বেসাতি ঝলমল করছে। আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মসৃণ কালো রাস্তার স্রোত।

হঠাৎ মনে হ'ল, দেখা যে হবেই না, এমন নাও হতে পারে। মনে হয়েই মনে হ'ল—না হওয়াই সম্ভব। হয় ত দেখা হবে, হয় ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন আজকের মনোভাব নিয়ে ওরা হাসিঠাট্টা করবে। আর আজকের এই তীব্র দুঃখের মূল্য তুচ্ছ হয়ে যাবে সেই লঘু-ছন্দের সুরে। হয় ত আজই দেখা হয়ে যাবে। হয় ত, বাড়ী গিয়ে দেখবে ডিভানটার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে কুমার অপেক্ষা করে আছে। যদি হয়—যদি তাই হয় তা হলে কি করবে মেরী—কি বলবে! জানে না সে। একেবারে তাড়িয়ে দেবে, না কি মিটমাট করে ফেলবে। না না, এখনই নয়। এখনও ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় নি, এখন দেখা হলে আবার সংঘর্ষ বাধতে পারে, আবার জ্বলতে পারে আগুন। এখন দেখা হলে হয় ত কিছুই বলতে পারবে না মেরী—কিছুই না। না না, পরে যদি আবার কখনও দেখা হয় ত হোক কিন্তু এখন নয়, এখন নয়।

কিন্তু শুধু সেইদিনই নয়, তার পরে আরও অনেক—অনেকদিন কেটে গেল, তবু কুমারের সঙ্গে মেরীর আর দেখা হ'ল না।

সেদিন মেরী চলে যাবার পর বহুক্ষণ সেই নড়বড়ে চৌকিটার উপরে বসেছিল কুমার। মাথার মধ্যে ক্রমে যেন আগুন ছুটতে শুরু করেছিল—তার পরে কখন যে ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে শুরু করেছে, কখন যে চৌকিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে, কিছুই ওর মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল, তাকিয়ে দেখে হাসপাতালে শুয়ে আছে। শুনতে পেল ও দু'দিন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়েছিল, ডাক্তার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে এনেছে। ওর দুই বুকে নিউমোনিয়ার ডবল আক্রমণ।

শুনে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল কুমার। একেবারে নিউমোনিয়া! এ রাজকীয় চিকিৎসা চলবে কি করে। কোথায় টাকা। তখনই মনে হ'ল, ওঃ এদেশে ত আজকাল চিকিৎসার জন্যে টাকার দরকার হয় না।

সাদা রং করা খাটে—সাদা বিছানায় শুয়ে কুমার দেখছিল, সাদা এপ্রন-পরা সেবিকারা ঘোরাফেরা করছে। দেখে কুমারের মন খুশিতে গুনগুন করে উঠল—"আমরা সবাই রাজা।" আমাদের কবি বাঁধলেন গান, এরা তাকে রূপ দিল জীবনে। একেবারে বিনা পয়সায়, বিনা সুপারিশে এমন হাসপাতালে আসা সম্ভব হ'ল কি করে। যে করেই হোক, হ'ল ত। শুধু ক'দিন নয়, প্রায় এক মাস ভুগলো কুমার। ইতিমধ্যে যেদিক দিয়ে সূর্য ওঠে, সেই দিক থেকে অনেক হাজার মাইল নদী সমুদ্র পেরিয়ে অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত চিঠি এসে পৌঁছল কুমারের কাছে। প্রথম প্রথম নার্সেরা লিখে দিত ওর জবাব।

যেদিন ওর নিজে হাতে বাংলায় লেখা চিঠি মায়ের হাতে পৌঁছল, সেদিন বাড়ীতে নিশ্চয় উৎসব পড়ে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাল লাগল কুমারের। ওর নাম করে পাঁচটা পয়সা নিশ্চয় তুলে রেখেছিলেন পিসিমা। আর সেদিন হয় ত কালীবাড়িতে পুজো গিয়েছিল। আর বাবার সার্টে বোতাম বসাতে বসাতে মা হয়ত সাত হাজার মাইল দূরে বসে চুলে বিলি দিয়ে দিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

চিঠিভরা নানারকম দেশের খবর কুমারের লাগাত দোলা। বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ওর আর কত দেরি। কুমার মনে মনে হাসে—আরও মাসছয়েক ত বটেই। ইতিমধ্যে ব্রিস্টলের কারখানায় যদি কাজ করার সুযোগ পায়, তা হলে আরও কিছুদিন কাজ করে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে নিতে পারে, তা হলে ফিরতি পাথেয় আর বাবার কাছে নিতে হবে না। মোটমাট দেশে ফিরতে ওর আর বছরখানেক-বছর দেড়েক সময় ত যাবেই। ইতিমধ্যে রমলারা এসে পড়বে। খবরের মধ্যে রমলারা আসছে সেইটেই সবচেয়ে বড় খবর। ওরা জাহাজে উঠেছে—রমলা আর তার পার্থ। পার্থ এগারো বছর বয়সেই নাকি সংস্কৃত শিখেছে খুব। ওর বয়সী ছেলেরা যখন ইংরেজী বুকনি দেয় ও তখন সংস্কৃতে বুকনি ঝাড়ে। ওর স্কুলের নামটা জানাতে ভুলে গেছে রমলা। সে নিজে

কিন্তু লণ্ডনেই থাকবে, ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের কোর্সে ভর্তি হয়েছে। আবার তার ভাগ্নী কৃষ্ণাকেও নিয়ে আসছে, সে যাবে কেম্‌ব্রিজে। আর সবচেয়ে মজা, ওদের দলে আছেন মামা।

কুমারের নিজের মামা নেই। রমলার মামাকেই সে চিরকাল মামা বলে এসেছ। তাই শুধু নয়, তাঁকে একান্ত আত্মীয় বলেই চিরকাল জেনেছে। মামা শুধু মামা নন, শুধু গুরুজন নন, বন্ধুও বটে। মামার কাছে মনের কথা খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ হয় না। মামা আসছেন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিস-এ ছ'মাসের জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতের উপরে একটা লেকচারশিপ নিয়ে। মামাবাবুকে নিয়ে জাহাজে ওদের দিনগুলি নিশ্চয়ই সাতরঙা সুরের রামধনু হয়ে ফুটছে। আর যখন চাঁদ ওঠে, আর তরল জ্যোৎস্নায় অন্ধকার সমুদ্র সাদা হয়ে ঝিকমিক করতে করতে ছুটে চলে, তখন নিশ্চয়ই ওরা ক'জনে মিলে বিজাতীয় নৃত্যগীত ও পানোৎসবের হুল্লোড় এড়িয়ে ডেকের কোন নির্জন কোণায় জটলা করে বসে, আর মামাবাবু খুলে দেন তাঁর গলা—ঢেলে দেন তাঁর সুর—আকাশে-বাতাসে-জলে। আঃ, মামাবাবু এলে গান শুনে বাঁচা যাবে—"তোমাদের যেমন বাজনা, আমাদের তেমনি গান।"

মনে মনে মেরীর সঙ্গে তর্ক করে হাসে কুমার—"তোমাদের বেহালা, তোমাদের পিয়ানো, সুরকারদের আঙুলে ছোঁয়ায় মনকে প্রায় মূর্ছিত করে আনে, কিন্তু আমাদের গানও তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় জন্ম-জন্মান্তর পার করে।" মনে মনে তর্ক ওঠে ঘনিয়ে, কিন্তু হাতের কাছে ঘন হয়ে ওঠে না মেরীর সুগন্ধভরা দেহ। কেন কুমার সেদিন ওর উপরে অকারণ রাগ করেছিল? ও ত কোন দোষ করে নি, কুমারের জন্যেই ছুটোছুটি করেছে। বাড়ী খুঁজে বার করা কি সোজা কথা! মেরী দুবার সেই অসাধ্যসাধন করেছে। শুধু কি এই—আরও কত কি? বিদেশে ওর সমস্ত দুঃখ লাঘব করার হাজার চেষ্টা করেছে। সেই তাকেই কুমার কুবাক্য বলল কি করে। তবে কি মেরীকে ভালবাসে নি কুমার? কে জানে কাকে বলে ভালোবাসা? মেরীকে ওর ভাল লাগত সন্দেহ নেই। খুব তীব্র একটা নতুন রকম ভাল লাগা। এরই নাম বোধ হয় মোহ, তা যদি হয় তো হোক, এ মোহ সে ভাঙতে চায় না। কিন্তু মোহ মাত্রই বুঝি ভেঙে যায়। তাই ত গেল, কতকাল তার দেখা মেলে

নি, কোন খবরও পাওয়া যায় নি, কতদিন হয়ে গেল কাছে এসে একবারও কাছে বসে নি। বলে নি, "কেমন আছ?" এত অসুখ একবার খোঁজও করে নি। অবশ্য বাড়াবাড়ি অসুখের খবর মেরী পায় নি, জুনি বার্কার নাকি ওকে খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল। দিন আষ্টেক পরে একটু সামলে নিয়ে কুমার যখন জুনিকে জিজ্ঞাস করেছিল মেরীর খবর, জুনি বার্কার বলেছিল—"কাউকে খবর দেবার কথা মনেই ছিল না। সবই ত একা আমাকে করতে হয়েছে। তা ছাড়া এও ভেবেছিলাম, যে অসুখ দেখে গেল, নিশ্চয়ই একবার খোঁজ করবে। তা যখন এল না—"

—"তখন—।" কুমার বললে—"তখন আমার হয়ে তুমিই একবার ফোন করে দেখ।"

কিন্তু ফোন করে খোঁজ পেল না জুনি। মেরী তার ঠিকানা বদলেছে, কিংবা হয় ত লণ্ডনেই নেই। বন্ধুদের ওখানেও খোঁজ করেছিল কুমার। কিন্তু উদ্দেশ মিলল না, ছুটি নিয়েছে এক মাসের।

হঠাৎ সেদিন মার্কাসের কথা মনে পড়ল কুমারের। ও চেষ্টা করলে হয় ত কোন খবর এনে দিতে পারে এবং রমলাদের জন্যেও একটা থাকার ব্যবস্থা হয় ত হয়ে যেতেও পারে। ওর খাটের কাছেই ফোন এনে দিল সেবিকা। কিন্তু মার্কাস মেরীর কোন খবরই জানে না।

—"সেই যে তোমরা দুজনে এসেছিলে।" মার্কাস বললে,—"তার পরে ত আর তার দেখা পাই নি।"

ইতিমধ্যে একটা গ্রীক নাটককে ভেঙেচুরে গড়বার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ও। কিন্তু কুমারের অনুরোধে এ কাজটা করতে রাজী হয়েছে মার্কাস—রমলাদের জন্যে ফ্ল্যাটের চেষ্টাও করবে।

—"লণ্ডনের একটু বাইরে যদি হয়?"

—"সে তুমি যা বোঝ আর যা পাও।"

কুমার নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কুমারের অসুখ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল মার্কাস। মেরীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পালা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করে ফেলা উচিত এও তার মত।

—"শীগ্‌গিরই একদিন আসব তোমায় দেখতে।" মার্কাস বলেছিল। মার্কাসের বন্ধুত্বে কৃত্রিমতার বাধা নেই। ও সাহায্য করতে চায় বন্ধুর মতই।

এদেশের সব বন্ধুর মধ্যেই এ ভাবটা লক্ষ্য করেছে কুমার, সাহায্য করতে পেলে সে সুযোগ কিছুতে ছাড়বে না।

কিন্তু মার্কাসের বিশেষত্ব আরও বেশী। সে শুধু সাহায্য করেই এবং বন্ধুত্ব স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না। ও আসে জিজ্ঞাসা নিয়ে আর সে জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে মার্কাস আর জানতে চায় তার বর্তমান পরিণতি কি। ভারতের মেয়েদের বিষয়েও তার কৌতূহল খুব সজাগ। তবু, এখনও কোন মেয়ের সঙ্গে তেমন আলাপ জমাবার সুযোগ পায় নি। কুমার জানে, রমলার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে মার্কাস প্রতীক্ষা করে আছে। মার্কাসের বার বার মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধে যত প্রপাগাণ্ডা হয় তার অধিকাংশই সত্য নয়, সত্যের ভান মাত্র।

মার্কাস চেষ্টা করবে শুনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে হ'ল নিজেকে। কিন্তু মেরীর ইচ্ছে করে হারিয়ে যাবার কথা কুমারের মনের একটা কোণে সারাক্ষণ কাঁটা বেঁধাতে লাগল কবে কতদিনে সে কাঁটা উঠবে কিংবা একেবারেই উঠবে কি না কে জানে ?

ঠিক এক মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল কুমার। মনটা খুশিতে আছে এখন ওর। রমলারা এসে পৌঁছোচ্ছে কাল। ওদের জন্যে চেলসীতে তিনটে ঘর ঠিক করে রেখেছে মার্কাস, একটা বাড়ীতেই। একেবারে শহরের মধ্যে এতগুলি ঘর একসঙ্গে পাওয়া শক্ত। মার্কাস বলেছে, চেষ্টা করলে বোধহয় ওবাড়ীতে আরও একটা ঘর যোগাড় করতে পারা যেতে পারে, তা হ'লে কুমার সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠান হবে। কিন্তু আপাততঃ জুনি বার্কারের বাড়ী তার ঠিক আছে, অন্ততঃ তার আগের দিন সকালবেলা এসেও তাই বলে গেছে জুনি। জুনির সম্বন্ধে ধারণা ওর বদলে গিয়েছিল— অসুখের সময়ে এত যত্ন করেছিল ওকে। বেচারা এখনও তার জর্জকে ফিরে পায় নি। যখনই জিজ্ঞেস করে, শোনে, সামনের সপ্তাহে আসবে। তার জন্যে ঘর সাজাতে সাজাতে ছেলেমেয়ে সমেত হাঁপিয়ে উঠেছে জুনি। শোনা গেল, ছোট ছেলেমেয়ে দুটি ঘরের মেঝে পালিশ করেছে। আর জন ও মার্গারেট দেয়ালে ওয়াল-পেপার বসিয়েছে। জানালা দরজা রং করেছে। আর ও আর ওর ননদ দু'জনে মিলে সেলাই করেছে পর্দা, বেড-কাভার ল্যাম্পসেড ইত্যাদি।

—"সত্যি এবারে সামনের সপ্তাহ ঠিক ত ?" কুমার জিজ্ঞেস করেছিল।

—"দেখে নিও, এবারে ঠিক এসে যাবে," বলতে বলতে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল জুনি। বলেছিল—"বাড়ী যা সাজিয়েছি, দেখে আর চিনতে পারবে না।"

—"কিন্তু ঢুকতে পারব ত ?"

কুমার হেসেছিল—"নাকি আমার ঘরটা ইতিমধ্যে আর কাউকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছ।"

—"পাগল ?" জুনি আকাশ থেকে পড়েছিল, "আর আমি ঘরভাড়া দেব না। যাদের দেওয়া আছে, তাদেরই মধ্যে কিছু তাড়াতে চাই। জর্জ আবার বেশী লোক বাড়ীর মধ্যে পছন্দ করে না। ঐ ছোট ঘরটা বাচ্চাদের নার্সারী করে দেব। ফিলিপ আর ম্যাগিকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেব বোর্ডার করে। ঐ ননদটাকে আর তখন বাডীতে ঢুকতে দেব না কুমার, জর্জকে নিয়ে আমি সুখে থাকব।"

—"তা হলে কাল সন্ধ্যাবেলা আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

কুমার হেসেছিল, নিজে থেকে সেধে নেমন্তন্ন নিয়ে বলেছিল, "আমার জন্যে আইরিশ স্টু করে রেখ, প্লীজ।"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল জুনি বার্কার। কুমার জানত, ও খাওয়াতে ভালবাসে। যদিও নিজের এত অভাব, তবু ফস করে এক একদিন বেরিয়ে পড়ে, কোন জমকালো কাফেতে ঢুকে বেশ কিছু খরচ করে সঙ্গী-সাথীদের খাইয়ে দিতে ভালবাসে। কুমারকে অনেকবার সাধাসাধি করেছে আগে। কিন্তু কুমার রাজী হয় নি। আর তখন তার অবসরগুলির এমন সময় ছিল না, যা জুনির সঙ্গে নষ্ট করতে পারে! তাই আজ ওকে খুশি করতে চাইল কুমার।

সন্ধ্যাবেলা সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি করে যেতে যেতে কুমার দেখল, আলো ঝলমল অক্সফোর্ড স্ট্রীটের প্রত্যেকটি দোকানের কাচের জানলায় আসন্ন উৎবের সমারোহ। শিশুদের মন ভোলানো কত প্রচুর কত বিচিত্র সজ্জা, তার কত রং, কত কারুকাজ। সবুজ 'ক্রিস্টমাস গাছে'র সরু সরু নাইলনের পাতায় কত বিন্দু বিন্দু রঙীন আলো! সাদা তুলোর বরফের পাহাড়, বুড়ো ক্রিস্টমাসের সাদা দাড়িতে কত রামধনুর প্রতিফলন।

একটার পর একটা মোড পেরিয়ে বেকার স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে বার্কলে স্ট্রীটের মোড়ে এসে ১০নং বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামল। ভাড়া চুকিয়ে নেমে দাঁড়াল কুমার। কনকনে হাওয়া ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে ফরাসী টুপির ফাঁক দিয়ে ঢুকে, অনেক দিন পরে বাইরের নতুন বাতাসের একটা ঢেউ তুলে দিল। বাড়ীর দরজায় এসে কুমার বেল টিপলে. একবার দুবার তিনবার।

ভিতর থেকে ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, কাণে আসছে চাপা কথার আভাস। ওরা কি জানে না যে ওর আসবার কথা আছে—দরজা খুলতে এত দ্বিধা কেন, আবার রিং করল কুমার অনেকক্ষণ ধরে। দরজা খুলে গেল। জন আর মার্গারেট দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে একটি কুটকুটে কালো মাঝবয়সী মেয়ে। তাঁর পরণে একটা কটকটে হলদে রঙের ব্লাউজের সঙ্গে টকটকে লাল রঙের স্কার্ট। কুমার বুঝলে, জুনি বার্কারের এ পক্ষের নন। এরই ভয়ে এরা বাড়ীসুদ্ধ তটস্থ।

মার্গারেট পরিচয় করিয়ে দিল। এলসি ডেভিড আমার আন্টি আর আঙ্কল কুমার। বেটি আর পল এসে জড়িয়ে ধরল, আঙ্কল কুমার, আঙ্কল কুমার। মিষ্টি কৈ?" কুমার অবাক হয়ে ভাবল. এও নতুন। পকেট থেকে চারজনের জন্যে চারটে চকোলেটের চাক্তি বের করে দিয়ে কুমার বললে. "তোমাদের মা কোথায়?"

—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!" বেটী ছুটে সরে গিয়ে হাসতে লাগল। অর্ধেক কথা মুখে রেখে পল বললে. "তোমার ঘর নেই আঙ্কল কুমার। আজ তোমাকে এই সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" অবাক হয়ে গেল কুমার। বেটি হাসতে লাগল—"হিঃ হিঃ।" স্টপ ইউ তাকে ধমকে দিল মার্গারেট। এলিস ডেভিড বললে, "আমাকে একটু মাপ করতে হবে।" সে পালাল ঘরের ভিতর। কুমারের চোখে ঘনাল শঙ্কার ছায়া। এমন অভ্যর্থনার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।—"ব্যাপার কি মার্গারেট—সত্যি কি আমার ঘর তোমরা আর কাউকে ভাড়া দিয়েছ নাকি?"

—হাঃ হাঃ বেটি হেসে উঠল আবার। তোমার ঘরে এখন সিলোনের রাজা এসে আছে। এই দেখ, আমাকে দিয়েছে বালা। হাতের ঝলঝলে নতুন মালার মত বালা তুলে গর্বভরে দেখাল ন'বছরের বেটি। ছ'বছরের

পল লাল গাল ফুলিয়ে অর্ধেক কথা মুখে রেখে বললে, "আমাদের বাড়ীতে এখন একজন রাজা আছে, তুমি ত ছিলে মাত্র প্রিন্স।" কুমার নিজেই কবে বোধ হয় একদিন নিজের নামের ব্যাখ্যা করেছিল ওদের কাছে।

"—থাম থাম বোকার দল," মার্গারেট ধমকে উঠল,—"ও মোটেই রাজা নয়, রাজা শুধু ওর নাম। আঙ্কল কুমার তুমি এসে বোস, মা বলে গেছে তোমাকে আমাদের ঘরে অপেক্ষা করতে। যাক্ তবু এ আমন্ত্রণটুকু পেয়ে বেঁচে গেল কুমার। আর দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি এদের দু'চারটে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে, এই মুহূর্তে ওর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

মৌরীর কথা সেদিন কেন শোনে নি—এই আক্ষেপ গুমরে উঠল মনে, কিংবা বিশ্বাস কি, সন্দেহ কালো হয়ে ওঠে কুমারের মনে। কে জানে, সেই বা শেষ পর্যন্ত কেমন ব্যবহার করত, নইলে একটা সামান্য মুখের কথা সহ্য হ'ল না। একেবারে জন্মের মত চলে গেল, না বলে কয়ে। অথচ কতদিনই ত ওকে খুঁচিয়ে ওর দেশের নিন্দে করে কত কথাই বলেছে। কৈ কুমার ত তাতে অত রাগে নি কোনদিন।

এদিকে সাতটা ক্রমে আটটার দিকে চলল। জুনি বার্কারের তখনও দেখা নেই এবং এলিস ডেভিড যে কোথায় সরে পড়েছে কে জানে।

এদিকে ডাক্তাররা কড়া হুকুম দিয়েছে, খাওয়া দাওয়ায় যেন অনিয়ম না হয়, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। কিন্তু যেমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে আইরিশ স্টু এর আশা না রাখাই সঙ্গত। আবার সারা রাত না খেয়ে থাকাও ডাক্তারী কানুনে ওর বর্তমান শরীরের পক্ষে বেশীরকম অসঙ্গত। এই অসুখের পরে দেহের পুষ্টি তাড়াতাড়ি করে নিতে না পারলে, সেই রাজ-অসুখটার ভয় আছে। অথচ এই গনগনে আগুন ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না। বাইরে বেরুলে আবার ঠাণ্ডা লাগার ভয় যথেষ্ট আছে।

এদিকে হার্থের মধ্যে লাল আগুন ফোঁস ফোঁস করছে। ওদিকে প্র্যামের মধ্যে টুপসী ঘুমিয়ে আছে। সামনের ছোট কার্পেটটার উপরে আগুনের তাপে আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে ঝাঁকড়াচুলো 'এট্টিস্'। ঘরটা বোধ হয় সত্যিই আগের চেয়ে একটু সাজানো গোছানো

হয়েছে, মনে হ'ল কুমারের। কিন্তু কুমারের নিজের মনটাই যে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপার কি? সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ওকে জায়গা দেবে না নাকি। বাঃ রে, চালাকি নাকি। কুমারের জিনিসপত্র সবই ত এখানে। সেই বেসমেণ্টে রান্নাঘরে যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কুমার চেঁচিয়ে ডাকল,—"মার্গারেট।"

"ইয়েস" বলে সাড়া দিয়ে মার্গারেট বেরিয়ে এল। ওর একহাতে একখণ্ড রুটি, আর একহাতে ছুরি। দেখা যাক না রান্নাঘর হাতড়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা, ভাবল কুমার। ওর অনেক খাবার খেয়েছে ওরা। আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল কুমার, বললে, "কি হচ্ছে?"

একটু অবাক হয়ে ম্যাগি বললে, "কিছু না।"

—টেবিলের কাছে ময়লা চেয়ারটা টেনে এনে তাতেই বসে পড়ল কুমার। বলল, "তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কি করছিলে?"

—"এই যে লিফটের উপরে মায়ের সব কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছি। তার পরে বসে সাপারটা সেরে নেব ভাবছিলাম।"

সাপার বলতে কি বোঝায় তাকিয়ে দেখল কুমার। দু' টুকরো রুটি আর মাজারিন আর দুটো ছোট্ট টম্যাটোর বাচ্চা। বোতলে আধ বোতল দুধ ছিল, তা থেকে একটা কাপে একটুখানি ঢেলে নিয়ে চোরা চাউনিতে চেয়ে মার্গারেট বললে, "বলে দিও না যেন মাকে।"

—"এই খেয়ে তোমার পেট ভরবে?" বিস্মিত প্রশ্ন বেরুল কুমারের কণ্ঠে।

হৃত আত্মসম্মান ফিরে এল কিশোরীর, বললে, "বিকেলে অনেক খেয়েছি, কেক, স্যাণ্ডুইচ, বিস্কিট তাই খিদে নেই। বেটি চেঁচিয়ে উঠল পাশের গুদোম ঘর থেকে—"এই ম্যাগী তুই কি খাচ্ছিস?"

—"কিছু না, পাজী কোথাকার, ম্যাগী চ্যাচাল, চুপ করে ঘুমো।"

—"ওদের খাওয়া হয়ে গেছে"—প্রশ্ন করল কুমার?

—"কিছু দেয় নি খেতে, আঙ্কল, বেটি রেগে বললে। বিকেলে একটু দিয়েছিল বলে এখন খালি রুটি দিয়েছে, আর অল্প একটু মার্জারিন। নিজের জন্যে সব রেখেছে পাজী।"

অবাক হয়েছিল কুমার। এত কম খেয়ে ওরা বাঁচে কি করে? বেশ

হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল টকটকে চেহারা। তা ছাড়া কি খাটতেই পারে। অবাক হয়ে যায় কুমার। যতটুকু যা খায় সবটাই বোধ হয় লেগে যায় দেহপুষ্টির কাজে। কিংবা হয় ত দুপুরবেলা স্কুল থেকে যে আমিষ খাবারটা দেয়, সেইটেই যথেষ্ট সারাদিনের পক্ষে। যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে। জুনি বার্কার যখন ঠোঁট রাঙিয়ে, চুলে কোঁকড়া ফণা তুলিয়ে, গলায় নকল মুক্তার মালা ঝুলিয়ে নকল ফারের কোট পরে, কোন রেস্তোঁরায় বসে সবন্ধু কফি কিংবা চা খায়, তখন কে বলবে বাড়ীতে তার ছেলে-মেয়েগুলি খিদেয় কান্নাকাটি করছে।

সেদিন বসে বসে মার্গারেটের খাওয়া দেখতে দেখতে আর সমাজতত্ত্ব ও খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা যদিও কুমারের মনে হচ্ছিল,—তবু নিজের দেহের মধ্যে ক্ষুধাতথ্যও ওকে কম পীড়ন করে নি। কিন্তু সে সমস্যার কোন মীমাংসা হবে বলে মনে হ'ল না। কুমার বললে, "রোস তুমি খাও, আমি একটু বেরুচ্ছি, আমার সুটকেশটা রইল, বাকী জিনিস ত তোমাদের কাছেই আছে। এসে যেন দেখতে পাই শোবার ব্যবস্থা করে রেখেছ।"

—"আচ্ছা" বললে মার্গারেট। আমার এখনও অজস্র কাজ বাকী আছে। কাল সকালে স্কুলের জন্যে তিনজনের জামা ইস্ত্রি করে রাখতে হবে।

—"তার চেয়ে ভোরে উঠে করলেই পার," কুমার যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে মন্তব্য করে।

—"আমি কখন উঠি জান? ছ'টার সময়। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে, খেয়ে, নীচের ঘর সিঁড়ি ও ল্যাণ্ডিং-এর ছোট হলটা মুছে তবে স্কুলে যাই।"

যেসব জায়গাগুলি মার্গারেট মোছে বলে দাবি করলে, সেগুলি এত ময়লা যে, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কুমার। আর তাই দেখে রেগে উঠল মার্গারেট—"তুমি ভাবছ, এগুলো মোছা হয় না, কারণ নোংরা দেখাচ্ছে। তোমরা সবাই মিলে নোংরা করলে আমি কি করব। এই ত তোমার পায়ের ছাপ, তুমিই ত নোংরা করলে। আমি রোজ সাবানজল দিয়ে পুঁছব আর সবাই নোংরা করবে।" হঠাৎ যেন রাগে দুঃখে ওর চোখে জল এল। "সরি ম্যাগী, ভুল বুঝ না, আমি তোমার উপর একটুও সন্দেহ করি নি।" আস্তে উঠে এসে ল্যাণ্ডিং-এর এক কোণে রাখা হুকে টাঙানো

ওভারকোটটা পরে বেল্ট আঁটছে, পা টিপে টিপে চোরের মত উঠে এল বেটি। ওর কোটের বেল্ট চেপে ধরে চুপি চুপি বললে, "জান, কাল আমরা স্কেটিং করতে যাব, স্কুল থেকে বন্দোবস্ত করেছে।"

"সত্যি নাকি? বাঃ," কুমার উৎসাহ দেখায়।

কিন্তু, বেটি ইতস্তত: করে, "জান, আমাদের কিন্তু চাঁদা লাগবে দু'শিলিং করে।"

"—ও, তাই বুঝি," একটু ইতস্তত করে কুমার। এই বঞ্চিত শিশুদের চার শিলিং দিতে ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু হঠাৎ এরকম চাওয়া ওদের পক্ষে বেশ একটু অস্বাভাবিক। আগে কখনও এ ধরনের চাইতে শোনেনি কুমার। নিশ্চয়ই মার্গারেটই ওকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন? যে মেয়ে খালিপেটে কতবার খাবার প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই মেয়ে আজ স্কেটিং-এর লোভ সামলাতে পারল না। এই প্রথম কুমার যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারল যে, শুধু অভাব নয়, লোভই মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে।

কুমারের দ্বিধান্বিত ভাব দেখে বেটি ভয় পেয়ে আরও কাছ ঘেঁষে এসে বললে, "কুমার, দিদি বলেছে তোমার লেখা-টেখার যদি কিছু কাজ থাকে ত কাল রাত্তিরে এসে সব সে করে দেবে। আজ যদি তুমি আগাম পাঁচ শিলিং দাও।"

পার্স খুলে পাঁচ শিলিং বার করে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল কুমার। আর এক দমক হৈম বাতাস বন্ধঘরের ভ্যাপসা গরম ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ছুটে এসে ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল বেটি। কানের উপরে কোটের কলার তুলে দিয়ে বেরে টুপীটা কপালের উপরে নামিয়ে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল কুমার। কনকনে ঠাণ্ডা ক্রমশঃ ওর মন ঠাণ্ডা করে আনল।

খাবার দোকান এখন এ পাড়ায় খোলা পাওয়া যাবে না নিশ্চয়। টিউবে করে চট করে রাসেল স্কোয়ারের দিকে যেতে পারে দিশী ছেলেদের আড্ডায়। কিন্তু তাও কাউকে পাবে কি না ঠিক কি। অবশ্য শীতের সন্ধ্যায় বড় কেউ একটা বাইরে যায় না। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট নিশ্চয় সকলের চুকেছে। হঠাৎ গিয়ে খেতে চাওয়াটা হয়ত অশোভন ঠেকবে। কোন বিলিতী পরিবারে গিয়ে এখন খেতে চাওয়া অর্থহীন। দেশী পরিবার বলতে চেনে কেবল রমেন আর প্রতিমাকে। কিন্তু ওরাও তো ছুটি নিয়ে ইটালী গেছে। তা হলে

কি করবে এখন। এদিকে ঠাণ্ডাটা জমে গিয়ে কোটের একটু-আধটু ফাঁক দিয়ে ছুঁচের মত ঢুকে দেহ যেন করাত দিয়ে চিরে চিরে কাটছিল। ভয় হ'ল কুমারের। আর বেশীক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় অবশ হয়ে পড়ে যাবে পা। দেবীপ্রসাদের কাছে গেলে হয়, খাওয়াতে ভালোবাসে লোকটা। কিন্তু ওর ঠিকানা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। শেষ পর্যন্ত পিকাডেলিতেই যেতে হবে বোধ হয়, কিন্তু ঠাণ্ডায় ও যেন চলতেই পারছে না আর। কুমার বুঝল, এ বরফ জমানো ঠাণ্ডা। কি অদ্ভুত ঐ জুনি বার্কার, এত অনায়াসে এত অকারণ মিথ্যে বলে। সেদিন ওর মাথায় জ্বরের ভূত চেপেছিল, তাই মৌরীর কথা না শুনে ঐ অন্ধ নরকে রয়ে গেল।

উঃ, কবে যে এদেশের হাত থেকে রেহাই পাবে কে জানে। কেন এখানে এসেছিল কটা বেশী টাকা মাইনের লোভে। আজও কেন নিজের দেশে কাজ করতে গেলে নামের পিছনে বিদেশী তক্মা আঁটতে হয়।

কখন যে ঝুরঝুর করে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে, আপন মনে চলতে চলতে লক্ষ্য করে নি কুমার। দেখতে দেখতে তুলোর ফুলের মত কণা কণা বরফ ঝাপসা করে দিল দৃষ্টিকে। কোটের হাতে মাথার টুপীতে আর কাঁধে সাদা পুরু আলপনা আঁকা হয়ে গেল। পথের দুধারে বাড়ীর কার্নিশে, জানলার খাঁজে, আর পত্রহীন গাছের শুকনো ডালে গলে যাওয়া বরফের মলিন দাগের উপরে নতুন সাদা তুষারের মালা রচিত হতে লাগল। কুমার ভাবলে হয়ত আজ ওর মৃত্যুদিন, হয়ত এই ওর কপালে লেখা ছিল। সদ্য অসুখ থেকে উঠে এই বিদেশে শীতের রাতে অনাহারে ঘুরতে ঘুরতে শেষরাতের দিকে পথে পড়ে মরতে হবে ওকে। এখন ওর এমন অবস্থা যে, একটু বিশ্রামের জন্যে ও যে-কোন জায়গায় ঢুকতে পারে, কিন্তু কোন বাড়ীর কোন দরজায় একটু ফাঁক নেই। মনে হ'ল ভুল করেছে, খাবার সন্ধানে বেরিয়ে, সে ত ভাল করেই জানত, এদিকে এত রাতে কিছু খোলা পাওয়া যাবে না। জুনি বার্কারের ঘরে আগুনের ধারের চেয়ারে বসে থাকলে অন্তত জমে যাবার ভয় থাকত না।

হাঁটতে হাঁটতে দুটো স্টেশন মিছিমিছি ফেলে গেছে কুমার, ভেবেছে একটা ট্যাক্সি পাবার ভাগ্য এখুনি পেয়ে যাবে। কিন্তু যে সময় যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই সময়ই সেটি সবচেয়ে দুর্লভ। ট্যাক্সি কোথাও দেখা

গেল না, কিন্তু কপালটা একেবারে খারাপ নয়—দেখা গেল, ওদিকের রাস্তায় কয়েকটা বাড়ীর পরেই ঐ দোকানের পাশে সাদা বরফে ঢাকা লাল ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ীর রুদ্ধ জানালা দিয়ে আলোর ধারা বইছে। আর ভারী একটা হুড়মুড়ে আওয়াজ রুদ্ধ বাড়ীর ভিতর দিয়ে চাপা গর্জনের মত বেরিয়ে আসছে। ব্যাপার কি ভাবতে চেষ্টা করে কুমার, কি হচ্ছে ওখানে।

যাই হোক, এটুকু বোঝা গেল যে, বাড়ীটাতে মানুষজন বেশ ভাল মতন জেগে আছে। শুধু তাই নয়, বাড়ীর মাথা থেকে একটা হাতের মত বেরিয়ে একটা নেমপ্লেট ধরে আছে। হয়ত ওটা কোন দোকান কিংবা হতেও পারে একটা কাফে। মার্জিতরুচি সূক্ষ্ম মানসের অধিকারী সুসভ্য কুমারের চোখের সামনে কাফের আলোটা ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে মাংসখণ্ডের মত তীব্র আকর্ষণে জ্বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল কুমার। জমে-ওঠা পিছলে তুষার পায়ে পায়ে মাড়িয়ে। যা ভেবেছে সত্যিই—Snow Down Public Bar। তারই নীচে ছোট হরফে লেখা—'মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে।' ছাপার হরফ কটা অমৃতের ফোঁটার মত কুমারের চোখের সামনে ঝুলে রইল। পিতলের 'নব' ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল কুমার। গনগনে আগুন এবং মানুষের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ঘরের ঘনসন্নিবিষ্ট গরম ও উজ্জ্বল আলো শীতের রাতকে দরজার বাইরে বরফঝরা পথের মধ্যে ঠেলে বের করে দিল।

'বারে'র পাশের উঁচু টুলগুলির প্রত্যেকটাতে লোক। এ ধারের গদিআঁটা বেঞ্চি দুটোও প্রায় ভর্তি। ওদিকে কয়েকটা সোফা আছে, তার একটা খালি। কিন্তু পাশেই বসে আছে একটা জাঁদরেল সাহেব। তার আগুনের মত গনগনে রঙে প্রচণ্ড একজোড়া পাকানো গোঁফ। তার পাশের চেয়ারটা খালি থাকলেও কুমারের বসতে ইচ্ছে হ'ল না। ওদিকে একটা খিলেনে রঙীন কাঠির ঝিলমিলে পর্দা—সেদিক থেকেই বাজনার সুর আসছে। সেদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকল কুমার। সেখানে একটা কার্পেট মোড়া লম্বা দাওয়ার নীচে মস্ত দালান তার ছাদে আলোর ঝাড়ে রঙীন রহস্যের ছায়া। আলোর বন্যা থেকে থেকেই স্তিমিত হয়ে আঁধার ঘনিয়ে তুলছে। কুমার বুঝলে এটা পুরোপুরি নাইট ক্লাব। রাতের রহস্য আনার

জন্যে আলো বেশীক্ষণই আঁধারের দিকে চেয়ে আছে। তার থামগুলিতে বিলিতী লতার মাঝে আধুনিক ছবি। একপাশে ব্যাণ্ড বসেছে, আর মাঝখানে পানোত্তেজিত নরনারীর উল্লাসোদ্বেল নাচ। এদিকের কার্পেটে মোড়া দাওয়ায় ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা সোফা, তারই একটায় বসে পড়ল কুমার। নরম গদি দুহাত ভরে তাকে কোলে তুলে নিল। আরামে শরীর এলিয়ে দিয়ে কুমার নিঃশ্বাস ফেলল—আঃ।

লাল ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে, মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে লাস্যময়ী তরুণী এসে প্রশ্ন করলে, "তোমার জন্যে কি আনব মহাশয়?"

কুমারের জানা ছিল ঠাণ্ডার ওষুধ ব্র্যাণ্ডি। তাই হুকুম দিল—"নিয়ে এস ব্র্যাণ্ডি, আর খাবার যা আছে সবই।"

—ওয়ান মিনিট সার", তরুণী চলে গেল। নিয়ে এল একটা ছাপানো কার্ড, মদের লিষ্টি আর এক কোণায় স্বল্প কিছু খাদ্য-তালিকা।

এই লিষ্টি দেখে বাছাই করার মত অবস্থা তখন কুমারের নয়। তবু গরম ঘরে এসে শরীর একটু চনমনে হয়ে উঠেছে। তাই নিজের মেজাজ ফিরিয়ে আনতে চাইল কুমার। মিষ্টি হাসির ভাব ফুটিয়ে বললে, "ত্রাণ কর কুমারী আমি নেহাতই আনাড়ী। তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তে যা এনে দেবে তাই আমি নির্বিচারে খাব। শুধু এইটুকু জেনে রেখ যে, আমি সদ্যরোগমুক্ত এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমার এই মুহূর্তের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায়, আমি বোধ হয় এই টেবিল চেয়ার লাইট ফ্যান সব কিছু গ্রাস করতে পারি।" —খিল্ খিল করে হেসে উঠে, উচ্ছল যৌবনের ঢেউ তুলিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি বাহুর বিক্ষেপে।

ঝনঝন করে থেমে গেল বাজনা, নাচের একটা পর্ব শেষ হ'ল। জুড়িরা নতভঙ্গিতে পরস্পরকে নৃত্যনিয়মসম্মত বিলিতী নমস্কার জানিয়ে ক্ষণিকের জন্যে বিজোড় হলেন। পরক্ষণেই হাসিতে উছলে উছলে, হাতে হাতে ধরে তাঁরা উঠে এলেন। দপ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলো, ছাদ থেকে ঝোলান মালাগুলি ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল। ছোট দাওয়াটুকু গিসগিস করতে লাগল, রঙে আর কথায় আর গন্ধে—বিচিত্র মানুষের আর বিচিত্র সুরার একটা মিশ্র গন্ধ। আর তার সঙ্গে মিলে রয়েছে মেয়েদের গায়ের এসেন্স পাউডারের সৌরভ। যে যেখানে পারল বসে পড়ল, বেশীর ভাগই

রইল দাঁড়িয়ে। হাত তুলে নিল অর্ধপীত পানপাত্র, কেউ কেউ শূন্যপাত্র হাতে চলে গেল ভিতরে 'বারে'।

বিহ্বল হয়ে বসেছিল কুমার, এসব জায়গায় আগে বেশী আসে নি ও। সময়ই হ'ত না, পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হ'ত সারাক্ষণ। বিলেতে এসেই প্রথম দিকে, অশোক, সুধীর, বিনয়দের পাল্লায় পড়ে একটা স্কুলে নাচ শিখতে শুরু করেছিল। তার পরে মৌরিদের দলে পড়ে ছাড়তে হয়েছিল সে পাঠশালা। স্কুলে গিয়ে নাচ শেখার কথা বলে ফেলে একদিন হাসির ধাক্কায় বেশ কিছুক্ষণ নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল কুমারকে।

স্কুলে গিয়ে অত সিরিয়াসলি কি শিখছ তুমি? ব্যালে না ট্যাপ ড্যান্সিং।

কুমারকে সেদিন যথেষ্ট অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। অবশ্য মৌরিরাও যে না নাচত তা নয়, তবে তার মধ্যে সবটাই মজা, এমনকি শেখার অংশটুকুও। এক-একদিন ঘরের টেবিল-চেয়ার সরিয়ে খালি মেঝেতে নাচ হ'ত রেকর্ড বাজিয়ে, আর হাসির ঘণ্টা বাজত সকলের গলায়। সে ছিল শুধু খুশী মনের খেলার নাচ।

এদের দেশে নাচ শুরু হয় ছোটবেলা থেকে। নিজেদের বসার ঘরে, বাপ মা, ভাইবোন সকলের সঙ্গে মিলে। কিংবা স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে।

কুমারের মনে পড়ল, মাঝে মাঝে নাচের পার্টিতেও যে না গিয়েছে এমন নয়। কিন্তু সেগুলির পরিবেশ ছিল ভারী চমৎকার। কিন্তু এ রকম জায়গায় বন্ধুদের পাল্লায় পড়েও এসেছে বলে মনে হ'ল না।

শূকর মাংসের মোটা স্যাণ্ডউইচ আর বিলিতী সিঙারা নিয়ে এল রঙ্গিনী পরিবেশনকারিণী। গেলাস ভরে এল সোডামিশ্রিত জনি ওয়াকার।

"খুব হালকা করে এনেছি।" মিষ্টি করে হাসল সাকী।—"এইটেই এ সময়ের একমাত্র ওষুধ, পিও আর পিও। আমি আবার এসে তোমার তদারক করে যাব।" ভুরু নাচিয়ে চলে গেল সে।

খাওয়া শেষ করে, গরম ঘরে আরামে বসে চুমুকে চুমুকে সুরা পান করে কুমারের জমে যাওয়া রক্তে উত্তেজনার পোকারা শিরশির করে উঠল। বিলেতবাসের সেই প্রথম পর্বের স্বল্পশেখা নাচের তাল ওর মনের মধ্যে উঠে-পড়ে, আধুনিক আমেরিকান সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কনায় দিকভ্রান্ত হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হ'ল, পানীয় শেষ হ'ল, তবু ওর তৃষ্ণা মিটল না, শুষ্কপ্রাণ কামনা করল এক গেলাস জল। তার বদলে দ্বিতীয় পাত্র পূর্ণ করে সুরা নিয়ে এল নারী। মনকে বোঝাল কুমার—এই ভাল, দুধের সাধ ঘোলে না মিটলেও ঘোলের সাধ হয় ত দুধে মেটে।

মনকে ট্রেইন করবে ঠিক করল কুমার, খুব তরল ট্রেইনিং। জলের তৃষ্ণা মিটাবে হুইস্কিতে। অনেক দূরে মিলিয়ে আছে বাবার বিরক্ত ভ্রূকুটি, মায়ের চোখের পাতার ঘনায়মান শঙ্কার ছায়া সরে গেছে। আছে শুধু আলো আর রং আর উত্তেজনা। চঞ্চল স্নায়ুরা অবশ হয়ে আসে। বাজনা নয় ত যেন অস্ত্রের ঝনঝনা। সুরে সুরে মত্ত কোলাহল। তারই তালে তাল মিলিয়ে, পায়ে পায়ে পা জড়িয়ে, জুতোর হীল খটখটিয়ে রঙের ঘূর্ণী ঘুরছে সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে।

ওরা যেন মানুষ নয়, ঘর-সংসারের দিনরাতের বোঝা-বওয়া যে মানুষ। ওরা যেন কামনার ঝড়। তীক্ষ্ণ অদৃশ্য কামনারা যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রূপ ধরে নাচছে। প্রথমে আস্তে আস্তে, ক্রমশঃ অন্যমনস্ক দ্রুত চুমুকে বেশ কয়েক পাত্র স্কচদেশীয় বারুণী পান করল কুমার। অবশ স্নায়ুরা রিম্ রিম্ করে উঠল। মদিরাবাহিনী সাকী এসে প্রশ্ন করলে "আর চাই?"

—"নিশ্চয়ই, আরও আরও অনেক অনেক,"—তার তারাজ্বলা চোখের ভিতরে মত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কুমার হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "নাচবে সখি?"

—"তুমি নাচবে?" এবারে হাসির পালা সাকীর,—বললে, "তুমি নাচ জান নাকি? কোথায় শিখেছ?" কুমারের গলার ভিতর থেকে কোন মাতাল বলে উঠল। "আজ শিখব তোমার কাছে?"

—"শেখাতে পারি, প্রতি লেসন্ পাঁচ শিলিং।

—"বহুৎ আচ্ছা," ওর কাঁধ ধরে উঠে দাঁড়াল কুমার।

—"একি তোমার পা টলছে, তুমি অসুস্থ।" বিব্রত গলায় একটু চেঁচাল সাকী।

—"নিশ্চই অসুস্থ," কুমার তার বক্তব্য প্রমাণ করে ওর হাত ধরে একটু টানল, বলল,—"নিশ্চয়ই, নইলে এখানে আসব কেন?"

—"সাট্ আপ ইউ পিগ", চেয়ারের উপরে ওকে জোর করে ফেলে দিয়ে

ফিরে গেল নটী, ভরাপাত্রটা পড়ে রইল টেবিলে, সেদিকে আর হাত বাড়াতে ইচ্ছে হ'ল না কুমারের। চেয়ারের উপরে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে দিল। নৃত্যবিরতির অবকাশ ভরিয়ে দিল শূন্য চেয়ারের অবকাশগুলি।

কুমারের পাশের চেয়ারে যে এসে বসল, তার দিকে তাকিয়ে কুমার অবাক হয়ে গেল। লোকটিকে কোথায় কবে দেখেছে কিছুই মনে নেই। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী নিতান্ত পরিচিত। মনে হ'ল নিশ্চয়ই কুমার তাকে ভাল করেই চেনে, শুধু এখন মনে পড়ছে না—তাই অপরিচিতের রক্তবর্ণ মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল কুমার।

—"তুমি সেই জুনির ভারতীয় ভাড়াটে না?" বললে লালমুখাধিকারী।

—"হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু তুমি কে?"

—"আমি? তার বিযুক্ত স্বামী—এই আমার প্রধান পরিচয়।"

কুমারের ঝিমঝিমে মাথায় সবটা ঢুকল না। বললে,—"তুমি জর্জ বার্কার?"

—"না, আমি ডেভিড পিয়ার্সন, তার প্রথম স্বামী।"

—"ওঃ তাই এত চেনা লাগছিল। এগারো বছরের কিশোর জনের সঙ্গে তার যৌবনোত্তীর্ণ পিতার কি অদ্ভুত মিল।"

অবাক হয়ে কুমার বললে,—"তুমি আমাকে চিনলে কি করে?"

—"তোমাকে দেখেছি বলে, জুনির ভাড়াটে এবং প্রেমিক।"

—"কি করে দেখলে?"

—"জুনি প্রায়ই ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ গর্জন করে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জানালা দিয়ে তোমাকে দেখাতো। বলত, তুমি নাকি তাদের সংসারে অর্ধেকের বেশী খরচ দাও।

—"কি আশ্চর্য, হবেও বা,—কুমারের অবিন্যস্ত মস্তিষ্কে সেই পুরনো প্রবাদটা ভেসে উঠল—স্ত্রিয়াংশ্চরিত্রং···ও বললে,—"তুমি ত শুনেছি কাছাকাছিই থাক।"

—"ঠিকই শুনেছ, সেই জন্যেই ত হরদম এসে আমাকে তার ঐশ্বর্য দেখাতে নিয়ে যায়।"

—"তুমি যাও কেন?"

—"মজা দেখতে।" বিভ্রান্ত মাথায় কুমার ভাল করে বুঝতে পারল না, মজাটা কি।

জুনির প্রথম স্বামী বললে,—"এখন শেষ মজাটা দেখবার আশায় আছি। ওর দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে কেমন করে ঘরকন্না করে সেইটে দেখবার আশায়।"

একটু ভেবে কুমার বললে,—অর্থাৎ জর্জ বার্কার। সে কবে আসবে জান নাকি ?"

—"তুমি বুঝি তাকে কখনও দেখ নি ?"

—"আমি ? আমি কি করে দেখব ? সে ত শুনছি 'জামাইকা'তে প্র্যাকটিস করছে, মানে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-এ।"

—"হো হো হো হো করে হেসে উঠল ডেভিড পিয়ার্সন। কুমারের জন্যে আনা গেলাসের শেষটা একচুমুকে পান করে ডেভিড বললে,—"জর্জ বার্কারকে দেখতে চাও ত তাকিয়ে দেখ। আজ তোমার কপালগুণে জুনির দুই স্বামীকেই একসঙ্গে দেখতে পাবে।"

ডেভিডের নির্দেশমত তাকাল কুমার। মোহিত সরকারের সেই বর্ষীয়সী লেডী বান্ধবী, যার কালো রঙের সুপার স্নাইপে করে মোহিত ইংলণ্ড ঘুরেছিল।

—"কি আশ্চর্য, এই পাড়ায় এত রাত্রে একজন বর্ষীয়সী অভিজাত ঘরণী একজন লম্বাচওড়া খাস জামাইকানের সঙ্গে নাচতে আসবে, একি সম্ভব।"

—"কেন আসবে না," পিয়ার্সন বললে,—কালো রঙের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাইত জুনির এখন ভারতীয় অথবা সিলোনীজ যে কেউ হলেই হয়,—জর্জ যখন আসছেই না।"

"বাজে কথা," কুমার বলে, "শ্রীমতী বার্কার আমার সঙ্গে অন্ততঃ কোনদিন ভাব জমাতে আসে নি। সে যাই হোক, জর্জ বার্কার লণ্ডনে এসেছে অথচ জুনির কাছে নেই ?"

—"না, আমি জানি, ও ওই লেডী রিচার্ডের বাড়ীতেই আছে।"

—"শুনেছিলাম, জর্জ বার্কার দেশে আছে, আর তার বুড়ীমা তার ঘর দেখাশোনা করছে।"

—"হুঁ:, বুড়ীমার সঙ্গে আরও কেউ আছে। ধরতে পার, ওর চার বউ।"

মদ্যপ্রভাব ওর ভাষায় জোয়ার এনেছে বুঝতে পারল কুমার। নইলে এত অপরিচিতের সঙ্গে এত গল্প ইংরেজ করে না।—"দুটো কালো আর দুটো

সাদা, ডেভিড বলে, "একটাকে ডিভোর্স করেছে, আর দুটো আন-অফিসিয়াল দেশে আছে। এখানে ওই জুনি আর এই ত দেখছ।"

তাই ত দেখছে সত্যি। জর্জ বার্কারের চেহারায় তার দেশীয় ছাপ পুরোমাত্রায় বর্তমান। রঙ কালো, তবে একেবারে পালিস করা নয়, পুরু ঠোঁট আর ঘনকুঞ্চিত মোটা চুল। লেডা রিচার্ডস ওর মধ্যে কি এমন দেখতে পেয়েছে? কিই-বা দেখেছে জুনি বার্কার, যার জন্যে এমন সুপুরুষ স্বামীকে ছেড়ে ওর চার প্রিয়ার অন্যতমা হতে গেল? ওর চেহারায় কোন অন্তর্নিহিত মাধুর্যের ছাপ দেখতে পেল না কুমারের শিল্পরসিক চোখ। নেহাতই একটা খুব মোটা রকম ভাব,—যার একমাত্র নাম দেওয়া যেতে পারে ভালগার—এমন একটা অদ্ভুত অশ্লীল ভঙ্গি বেশী দেখা যায় না।

আশ্চর্য! কুমার ভাবে, আর সাইফুনের ভিতর থেকে সোডার ফেনা উপচে উপচে পড়ে। বোতলভরা মাদকতা মেশে তার সঙ্গে। ডেভিড পিয়ারসন বলে চলে,--তার গল্প তার জড়ানো কথার ধাক্কায় হোচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে চুপ করে যায় পিয়ারসন, নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকে। আবার শুরু করে তেমনি অর্ধোচ্চারিত ভঙ্গিতে। কষ্ট করে তার মানে বুঝতে বুঝতে কুমারের নেশা অনেক কমে এল।

লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড জর্জ বার্কার তার প্রায় সমমাপের পঞ্চান্ন বছরের প্রণয়িনীকে নিয়ে নাচছে,—হাতে হাত, পায়ে পা ঠেকিয়ে প্রেমিকের ভঙ্গিতে নাচছে। সেদিকে তাকাতে কেমন যেন ঘৃণা হ'ল কুমারের। মনের ভিতরটা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, কবে আমাদের সেই হিন্দুস্থান রোডের দোতলার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসব। ভাবতে গিয়ে মুহূর্তে যেন কলকাতার নীলাকাশ ভরা সমস্ত রোদ আর খুশী আর হাওয়া ওর সর্বাঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ল।

পিয়ারসন বলছে,—"জুনিকে আমি ভালবাসতাম। জান? ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ওর শরীরে আঠারো বছরের মায়া। সে কি সুন্দর, যেন স্বপ্ন। এতদিন ভুলে গিয়েছিলাম, আজ আবার ওর সেই চেহারা মনে পড়ছে। বোধ হয় আজ আমার মৃত্যু হবে, তাই।"

—"প্রেমের তুমি কিছু জানো? কাউকে ভালবেসেছ?" ডেভিড বলে, "জুনিকে? আরে ছিঃ, সে জুনি আর এ জুনি? সে মানুষ কি এই মানুষ?

আরে না, এ তার নামধাম চুরি করে নিজের বলে চালাচ্ছে—এ চোর। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম, সে ছিল মূর্তিমতী সৌন্দর্য—স্বর্গের কামনা। এক দিন বসন্তের বিকেলে, ফুলেভরা গোলাপকুঞ্জের ছায়ায় আমি তাকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম, সে হাসি দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছিল।"

চমকে উঠল কুমার, গল্পের এইটুকু তার জানা আছে—কবে যেন শুনেছিল। ওঃ হো, সেই জ্বরের দিন, মৌরীর সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রাক্কালে প্রথম পরিচ্ছেদটা শুনেছিল জুনির নিজের মুখে, আজ শেষটা শোনা যাক তার স্বামীর কাছে।

নড়ে-চড়ে উঠে বসল কুমার, এতক্ষণে উৎসুক হয়ে বললে,—"তার পরে ?"

—"তার পরে ? তার পরে জুনির হাসির ধাক্কায় আমি ঠিকরে চলে এলাম পুরনো জীবনের রুটিনে। দিনের বেলা কাজ, সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখা আর রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়া। হঠাৎ একদিন রাত তিনটের সময় ঘরের বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি খুব রেগে গালাগালি দিতে দিতে দরজা খুলে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে আমার দিনরাতের একটিমাত্র স্বপ্ন। ভয়ে ও উত্তেজনায় তার দেহ কাপছে। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। মুহূর্তে সেই হাতের উপরে ও ছেড়ে দিল নিজের ক্লান্ত দেহের ভার। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম একটা সোফায়। ও বসে পড়ে আমার দিকে একটা চাবি বার করে ছুড়ে দিল। শ্রান্ত গলায় বললে, 'বাইরে আমার গাড়ী খোলা পড়ে আছে।'

—"বুঝলাম ওর বাবার গাড়ীটা নিয়ে সারারাত ড্রাইভ করে এসেছে। কিন্তু কেন ? আমাকে ওর হঠাৎ এত কি প্রয়োজন পড়ল ? নিজেই একদিন আমার ঠিকানা চেয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু এত শীঘ্র তার প্রয়োজন হবে ভাবি নি ;

—"আমি বললাম, আমাকে একটা ফোন করে দিলেই ত আমি ছুটে যেতাম। এত রাতে এমন ড্রাইভ করে আসা -এ যে মস্ত রিস্ক।"

—"হাঁ, রিস্ক বটে, তবে না নিয়ে আমার উপায় ছিল না।",—ও রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে বলল।

আমি স্লটে পয়সা দিয়ে ঘরে গ্যাসের আগুন জ্বাললাম। তার পরে

এসে ওর পাশে বসে বললাম, "তোমার জন্যে কি করতে পারি জুন? কি করলে তুমি খুশী হও?" ও চেয়ারের হাতলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর দুঃখে আমার যাকে বলে বুক ফেটে যেতে লাগল। কান্না আমার গলায় আটকে আটকে কথা বন্ধ করে দিল। আমি নিঃশব্দে ওর পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম।

অন্যমনস্ক হয়ে গল্প শুনছিল কুমার, এ কথায় ফিরে তাকাল। ওর চোখে তীব্র চোখ রেখে বুঝতে চাইল—এ কি সত্যি? এই ছন্নছাড়া মাতাল মানুষটাই কি ওই রূপকথার প্রেমিক? কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গল্পের কথক যে স্বয়ং তার নায়ক, একথা ঐ ক'টা তুচ্ছ নাম আর স্মৃতির মালার ফাঁকেই আটকে আছে। আর কোথাও তার অবশিষ্ট নেই।

একথা কি তা হলে সত্য যে মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে জন্মায় আর মুহূর্তে মুহূর্তে মরে? তা হলে এক মাস আগেকার সেই প্রেমিক আর শিল্পরসিক কুমার কি আজও বেঁচে আছে?—এই যে মানুষটা এই মুহূর্ত আগে পঙ্কিল রসিকতায় পানশালার দাসীকে পর্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছিল, তার মধ্যে? আছে বৈকি, আজও বেঁচে আছে বলেই কুমার এখুনি পালিয়ে যেতে চাইছে, অনেক দূরে, অনেক দূরে—যেখানে শুধু হাওয়া আর আলো-আঁধারের রহস্য, যেখানে শুধু স্তব্ধতার সুর, দুঃখ যেখানে মিথ্যা, সুখ যেখানে তুচ্ছ, মৃত্যু যেখানে আনন্দ। কিন্তু সাহস নেই,—কুমারের সেখানে যাবার সাহস নেই। এই মুহূর্তেই দুই পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যেখানে আকাশ জুড়ে পুষ্পবৃষ্টি করছেন দেবতারা, মৃত্যুর তুষার পুষ্প,—তার শুভ্র পবিত্র দীপ্তির ছটায় কুশ্রী কালো লণ্ডন শহরটাও শঙ্করের ভস্মলিপ্ত ললাটের মত মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তার উপরে মৃদু চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ আলো। কিন্তু সেখানে যেতে সাহস নেই কুমারের। জড়িয়ে আছে দেহে মনে অনেক দুঃখের বাধা, ভয়ের নিষেধ। তাই এই বদ্ধঘরের রুদ্ধ বাতাসে বসে বসে হাঁপধরা প্রাণকে নিষ্পেষিত করতে হবে। পান করে যেতে হবে গেলাসের পরে গেলাস জ্বালাময়ী তৃষাহারিণীকে। যত পান করবে, তত আরও বাড়বে তৃষ্ণা, বুকে জ্বলবে অগ্নিকণা। দেহ, মন ছুটে যাবে ইচ্ছার বন্ধন মুক্ত হয়ে—মানবে না শাসন। আজ বসে বসে তিল তিল করে সেই কুমারের মৃত্যু ঘটাবে কুমার। তারপরে কাল যখন নতুন আলোয় নতুন

পৃথিবী জেগে উঠবে, তখন দেখবে কুমার, সেই নবজন্মে যে মানুষ বেঁচে উঠবে, সে কোন্ মানুষ, সে নিশ্চয়ই তার চিরকালের চেনা সুরস্বপ্নের মানুষ, যাকে মৌরী ভালবেসেছিল। আজকের এই দুঃখাভিভূত আচ্ছন্ন চৈতন্য জীবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কোন্ দার্শনিক কবে বলেছিল, সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে আচ্ছন্ন চৈতন্যের প্রদোষে, ভ্রষ্টচেতনার আকাশে। কেন চেতনা সত্যভ্রষ্ট হয়? কেন সে ঢাকা পড়ে কুয়াশার অন্ধকারে? যদি তাই সত্যি হয়, যদি সৃষ্টির প্রকাশ হয় অন্ধকারে, জগতের বিকাশ হয় ভ্রান্তিতে, তবে সত্য কি? অন্ধকার না আলো?

মদ খেলে নাকি অনেক সময়ে মাথার ভিতরে তত্ত্বকথারা সব গজগজ করে ওঠে—শুনেছিল কুমার অনেক অভিজ্ঞের কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কথা।

হেসে উঠল আপন মনে—কে জানে, হয় ত এই সংসারটাই কোন মাতালের মত্ত কল্পনা। তা নইলে এই জগৎজোড়া অসঙ্গতির ব্যাখ্যা সম্ভব কেমন করে?

দু'হাতে দু'গেলাস ভরে নিয়ে এসে কুমার একটা পিয়ারসনকে দিল। অন্য পাত্রে চুমুকের পর চুমুক দিয়ে কুমার একবার হো হো করে হেসে উঠল—একটা অত্যন্ত নাটকীয় হাসি, ওর হাসির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল পাশে রাখা একটা গেলাস।

পিয়ারসন বললে,—"জুনি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেভিড, তোমার কাছে ভিক্ষা আছে।"

"ভিক্ষা? আমার কাছে? ভেবে দেখ ছোকরা, আমার সর্বস্ব যার হাতে দিয়ে বসে আছি—তাকে আবার কি ভিক্ষা দেব? আমি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে তাকালাম। সে বললে, 'আর কিছু চাই না, শুধু একটা নাম ভিক্ষা দাও আমাকে, মাত্র একটা নাম, তোমার নাম—পিয়ারসন। জুন পিয়ার্সন।"

—'বল কি? জুন, জুন, তুমি চাইতে এসেছ না দিতে এসেছ?"

হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নাকি শোনান হয়েছিল তার রাণী হবার খবর। আমার জন্যে জুন যে খবর নিয়ে এল সে তারও চেয়ে দামী।

"এত কথা আমি কিন্তু বলতে পারি নি সেদিন, হাসতেও পারি নি ভাল

করে, শুধু বিহ্বল ভাবে চেয়েছিলাম। আর আমার চোখের সামনে নবযৌবনা মেয়ে তার ভরা দেহ চেয়ারে লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। ও এসেছিল আমার কাছে নাম চাইতে,—যে নাম দেবার জন্যে আমি এতদিন হাত বাড়িয়ে বসেছিলাম সেই নাম। কিন্তু শুধু ওর নিজের জন্যে নয়, ওর গর্ভে ছিল অন্যের সন্তান, তার জন্যে।"

এই পর্যন্ত বলে পিয়ারসন চুপ করলে। ডিকাণ্টার থেকে আরও পানীয় পাত্রে ঢেলে কুমার বললে,—"বল, বল, তার পরে ?"

—"তার পরে ?"

গুমরে উঠল পিয়ারসনের গলা,—"তার পরে, আমি তিন দিনের মধ্যে ওকে বিয়ে করলাম। এ তিন দিন ওকে যত্ন দিয়ে ঘিরে রইল আমার ভালবাসা। কিন্তু ওর দেহের মধ্যে অজাত অসহায় মানবসন্তান আমার বিকৃত ঈর্ষার অদৃশ্য উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল।"

"তিনদিন প্রবল মানসিক চেষ্টায় নিজেকে কোনমতে স্থির রেখেছিল জুন। বিয়ের পরেই তার সমস্ত জোর শিথিল হয়ে গেল, নাম সই করে খাতার উপরেই ঢলে পড়ল জুন। রেজেস্ট্রী আপিস থেকে সোজা নিয়ে যেতে হ'ল হাসপাতালে। পাঁচ ঘণ্টার মোটর ড্রাইভ এবং প্রবল মানসিক উত্তেজনায় ওর প্রথম শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এ জন্মের দায় ঘোচাল। তখনকার দিনে এত অবৈধ সন্তানের রেওয়াজ হয় নি। সমস্ত ব্যবস্থা করতে আমার অনেক হাঙ্গামা হ'ল, অনেক লজ্জা পেতে হ'ল আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে। তার উপরে জুনি তার অসুস্থ ক্ষীণ দেহে প্রতিদিন নূতন লাবণ্যের প্রভা বিকীর্ণ করে আমার সামনে জেগে রইল।"

"কিন্তু ডাক্তারের নিষেধে এক বছর ওকে ছুঁতে পারলাম না।"

"ক্রমে আমার ভালবাসা শুকিয়ে এল। সেই কোমল ফুলের মত ভালবাসা, যার মিঠে মিঠে, নরম নরম রঙে আমার আকাশ ভরে ছিল, তা শুকনো পাতার মত বিবর্ণ হয়ে উঠল, আর তাতে জ্বলে উঠল আদি কামনার আগুন। আমি তখন এত মদ খেতে শিখি নি, তবু আমার রক্ত মাতাল হয়ে উঠল।"

"আমি ওর সমস্ত রস নিংড়ে নিংড়ে পান করতে চাইলাম। ডাক্তারের নিষেধ ওর কাছে আশীর্বাদ ছিল। আমি জানতাম ও আমার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, কিন্তু ও আমাকে ভালবাসে না। তবু আমি দশ বছর ধরে ওকে

নিঃশেষে ভোগ করলাম। একটা পাপচক্র বলতে পার আর কি! যত ওর মন পেতাম না, তত ওর দেহকে জর্জরিত করতাম উন্মত্ত কামনায়। আর আমার বাসনার তাপে ওর মন আরও দূরে ছিটকে ছিটকে সরে যেত। ওকে কোনদিন সুখী করতে পারি নি, নিজেও হই নি। প্রতিদিন ওকে পান করেছি, কিন্তু তৃষা মেটে নি—ওরও নয়, আমারও নয়। আমার হাত থেকে রেহাই পাবে বলে, ও পালিয়ে যাবে ঠিক করল ভারতবর্ষে। ওখানে গিয়ে কোন রাজারাজড়ার বাড়ীতে গভর্নেস হয়ে থাকবে। ও ভেবেছিল, ভারতে গেলেই সেখানকার রাজা আর জমিদাররা ওর রূপের পায়ে তাদের ধনের থালা উজাড় করে দেবে। তাই রিস্ক নিয়ে ওর এত দিনের একটু একটু করে সংসারের খরচ থেকে জমিয়ে তোলা টাকা দিয়ে নৌকাভাড়া সংগ্রহ করলে।"

"আমি খবর পেয়ে ভারতে একটা চাকরী জুটিয়ে ফেললাম,—বিলিতী চায়ের কোম্পানীতে। আর সোজা এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অনেক চেষ্টায় ঐ এক জাহাজেই প্যাসেজ বুক করলাম। সে এক দারুণ নাটক।"

হো হো করে হেসে উঠল জুনির পূর্বস্বামী। বললে,—"আমি যে ওকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে পারতাম না। এতে ওর গর্বও একটু হয় ত ছিল, কিন্তু ঘৃণার যেন অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ কি মনে হয় জান," ডেভিড বললে—"আজ মনে হয় ও হয়ত ঘৃণা করতে করতে কখন আমায় ভালবেসে ফেলেছে। তা না হলে এখনও কেন ছুটে ছুটে আসে আমাকে ওর নতুন প্রেমের গল্প শোনাতে। আমি ত ওকে ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগে, ও কেন আমাকে আজও ছাড়তে পারছে না? কেবল আসবে টেনে টেনে ঝগড়া

বলে আবার হেসে উঠল ডেভিড। বললে,—"অথচ জান, আমাকে ডাইভোর্স করার পথ ছিল না ওর। ওর বাবা ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ওর সেই প্রথম অপরাধের পর থেকে। পিসি বলত, মরার সময় ওকে তার সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে। কিন্তু সে কবে ও জানত না। আমার সঙ্গে লড়াই করার মত অর্থ বা সামর্থ্য কিছুই ওর ছিল না।"

কুমারের মাথার মধ্যে কি যেন চনমন করে উঠল। স্নায়ুরা যেন ঝনঝন করে বাজছে, পিয়ারসনের অর্ধেক কথা বুঝতে পারছে না কুমার।

কুমার বললে—"কি বললে?"

ডেভিড বললে—"জর্জকে দেখে জুনি মত্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার মনে হয় জর্জকেও ও ভালবাসে নি।"

হা হা হা হা করে হাসল ডেভিড। "ও ভালবাসত সেই বদমাইসটাকে, যে ওর সেই অজাত সন্তানের পিতা।—তারপরে শোন মজা।"

ডেভিড বললে—"জাহাজে উঠেই জর্জের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমাদের। ও এসেছিল ওর সাদা মুরুব্বি উইলিয়মস্‌কে তুলে দিতে। আমরা ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া করলাম। যাবার আগে ও জুনির হস্তচুম্বন করে গেল। ষোল দিন জাহাজে একসঙ্গে কাটালাম, উইলিয়মসের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, জান,—ডেভিড হাসল—"উইলিয়মস্ বললে যে, জর্জ ওর হাতের পুতুল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ওরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত কালো দিয়ে কালো তোলার চেষ্টা করছে। কালোর বিপক্ষে কালোরা যেমন লাগতে পারে এমন আর কেউ নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়াতেও ত সেই ট্যাকটিক্‌সই চলছিল, শুধু ঐ গ্যানডির জন্যে হ'ল না, জান, আমি গ্যান্‌ডিকে দেখেছি।"

আবার হো হো করে হেসে উঠল ডেভিড চেয়ারে মাথা রেখে। কুমারের সমস্ত শরীরে একটা প্রবল উত্তেজনা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

ডেভিডের হাসি থামল না। বললে—"হা হা হা হা, সে বড় মজার লোক, বলে কিনা, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সব মানুষকে ব্রহ্মচর্য প্র্যাকটিস করতে হবে। ওঃ হো হো—"

—"খবরদার।" কুমার চেঁচিয়ে উঠল—"গ্যানডি গ্যানডি করো না।"

হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পিয়ারসন, পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল—"নিশ্চয় করব, আলবৎ করব, গ্যানডি, গ্যানডি, গ্যানডি—এই ত তার নাম।"

—"না।" গর্জে উঠল কুমার—"তার নাম মহাত্মা।"

—"হা হা মহাত্মা। আই নো, মহাত্মা great spirit হা হা This is my spirit।" ও সদ্য কেনা বোতল থেকে আবার ঢাললে মদ।

—"Hang it!" দু'হাতে বোতল নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল কুমার। তখন সবে নাচ থেমেছে, চকের গুঁড়ো মাখা পিছল উঠোন কাচের গুঁড়োয় আর পানীয়ে কদমাক্ত হয়ে উঠল। ঘুষি পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল পিয়ারসন। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ছুটে এল এ-ও-সে। অনেকে মিলে দুজনকে ধরে রাখল দু'দিকে। ওদের সকলেরই পা টলছে, শরীর কাঁপছে। মূর্তিমান

রসভঙ্গের উপরে ওরা রেগে উঠেছে। নানারকম মতামত নিয়ে ওরা চেঁচাতে শুরু করেছে।

—"কিক দেম আউট।"

—"বজ্জাত পাজী ভারতীয়গুলোকে কেন এদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়?"

—"ওরা ত অসভ্য জানোয়ার।" বললে কেউ কেউ।

—"নিশ্চয়। এখনও ওদের মধ্যে অনেক ক্যানিব্যালস আছে।"

—"নিশ্চয়।"

—"কেন ঢুকতে দেওয়া হয়?"

—"কেন, কেন?"

চেঁচিয়ে উঠল, কেউ-বা রেগে উঠল—"হবে না? তোমাদের পেয়ারের সরকার, তোমাদের লেবার গবর্নমেণ্ট? সেই ত ওদের এত দূর বাড়িয়েছে।"

—"এই চুপ, খবরদার। তোদের টোরি ত দেশটাকে বিকিয়ে দিচ্ছে ব্যবসাদারদের হাতে।"

—"চোপরাও।"

—"খবরদার।"

চীৎকার, চেঁচামেচি, মারামারি, টেবিল-চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, হট্টগোলের মধ্যে প্রায় নিত্যকার মতই আজকের পানোৎসবও শেষ হ'ল এদের। আর তারই ধাক্কার টাল সামলাতে সামলাতে কুমার এসে ছিটকে পড়ল বাইরে।

তখন মধ্যরাত্রের শেষে কৃষ্ণপক্ষের ছেঁড়া চাঁদ আকাশজোড়া কুয়াশার চাদরটার প্রান্তে এসে উঠেছে। তুষারাবৃত এজওয়ার রোডের প্রান্তে সেই শুষ্ক প্রচ্ছন্ন অবরুদ্ধ চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ভয় হ'ল, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে নাকি?

মদের ফেনার মত হাসির বুদবুদ ওর পিছনে গমকে গমকে ঝলকে পড়তে লাগল। ও চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে জানালার কাচের ভিতর থেকে পানশালার দাসীরা ওর দিকে রক্তনখর তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করে স্বল্পবাস দেহবল্লরী তরঙ্গিত করে হাসির হিল্লোলে দুলছে।

লজ্জা, অপমান, ঘৃণা আর অবসাদ কেমন করে সেদিন বহন করেছিল, সেকথা কুমারের তেমন মনে নেই। কে এসে পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত

রেখেছিল, তার পরে হিড হিড় করে টেনে নিয়ে গাড়ীতে তুলেছিল। তখন বুঝতে পারে নি কুমার।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, বুঝল সে পীয়ারসন। পীয়ারসন মাতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু জ্ঞান হারায় নি, হারায় নি মনুষ্যত্ব।

বেলা দশটা নাগাদ পরদিন যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে শীতের রোদ ওর মুখের উপরে থরথরিয়ে কাঁপছে।

প্রথম কথা মনে পড়ল—আজ রমলারা আসছে। দ্বিতীয় কথা মনে হ'ল ঘড়ির দিকে চেয়ে। দশটা বেজে পনরো মিনিট। আর ন'টা পনেরোয় ওদের ট্রেন এসে পৌঁছবার কথা।

স্টেশনে ওকে না দেখে ওরা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছেও যে, ও এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় নি। ট্যাক্সি করে ওরা এতক্ষণ হয় ত নিজেদের ঠিকানায় চলে গেছে। হাসপাতালেও হয় ত ফোন করেছে, আর খবর পেয়েছে, যে ও কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছে। আর সেকথা শুনে রমলার নাকের পাটা নিশ্চয় ফুলের পাপড়ির মত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমলার অভিমানের কথা সর্বজনবিদিত। তার উপরে এতখানি কারণ পেলে সে যে কি করবে, ভাবতে পারে না কুমার।

সব জুগুপ্সা ও দুর্বলতা নিমেষের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল কুমার।

এক পেয়ালা ধূমায়িত চা হাতে করে এনে পীয়ারসন বললে—"ভারতীয় যখন নিশ্চয়ই চায়ে দুধ-চিনি মিশিয়ে খাও ?"

"নিশ্চয়ই," কুমার হাসল—"আর তুমি ?"

—"আমি পান করি, টলটলে পাতলা চায়ে একটুকরো সুগন্ধি লেবুর রস দিয়ে।"

—"বল কি ? তুমি মানুষ খুন করতে পার।" একটু হেসে কুমার বললে—"আর মানুষ বাঁচাতেও। পীয়ারসন, তুমি না থাকলে কাল রাস্তায় পড়ে আমাকে মরতে হ'ত।"

পীয়ারসনও হাসল। তার উস্ক-খুস্ক চুল আর রেখাঙ্কিত উঁচু কপালে সকালের আলো এসে পড়ল। আর এক কাপ চা হাতে করে পীয়ারসন বললে—"ভারতের বিরুদ্ধে যা বলেছি কাল নেশার ঘোরে, সব আমি উইথড্র করলাম। কারণ ভারতবর্ষই আমাকে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় দান করেছে।"

—"সাধারণত ইংরেজরা ভারতে গিয়ে মাতাল, বদমেজাজী হয়ে ফিরে আসে। বোধ হয় অকারণ সম্মান আর অনুচিত প্রভুত্বের বোঝা বওয়া সাধারণ মস্তিষ্কের পক্ষে একটু মুশকিল হয়,—ভারসাম্য ঠিক থাকে না। কিন্তু আমার মন আগে থেকেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। পাহাড়ী প্রকৃতি আর পাহাড়ী মানুষ আমার সেই ক্ষতে ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগিয়েছিল। হিমালয়ের নিভৃতে সেই যে একটি বছর কাটিয়েছিলাম—," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডেভিড বললে—"তার স্মৃতি আমার মনে কখনও মলিন হবে না।"

কুমার অবাক হয়ে ভাবল—এই পীয়ারসনই যে কালকের রাতের মাতাল একথা কে বলবে। জুনির পূর্ব স্বামীর কথাবার্তা যে এত শিক্ষিত, এমনকি প্রায় সাহিত্যিক সেকথা আগে খেয়াল করে নি কুমার। এখন মনে হ'ল, আগেই বোঝা উচিত ছিল, জুনি যখন আত্মপরিচয়ের গল্প করছিল, তখনই। শিক্ষিত এবং সূক্ষ্মমনের অধিকারী না হলে কি ভালবাসা যায়? ভালবাসা মনের একটা বিশেষ সংস্কার, যার জন্যে বহুদিনের অজ্ঞাত প্রস্তুতি চাই। আর সূক্ষ্ম বলেই ডেভিডের মন প্রতিকূল আবহাওয়ায় মরচে ধরে ভোঁতা হয়ে যাবার অবকাশ পেয়েছিল।

পীয়ারসন বললে,—"পাইনের গন্ধঢালা বনভূমির প্রান্তে, সেই নীলে সোনায় মাখামাখি সকাল-বিকেলের আলোয়, ঝিঁঝির ডাকে ঘনমন্থর জোনাকজ্বলা সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার ভিতরকার দহনজ্বালাটা একটু যেন শান্ত হয়ে এল। তার উপরে পাহাড়ী মেয়ের সতেজ সুন্দর অকারণ হাসি। আমার জীবনের মূল্য ফিরিয়ে দিল ওরা, যে জীবন হাতে করে জুনির কাছে আমি ধরনা দিয়ে বসেছিলাম, অনাদায়ে যার দাম ডাকাতি করে কেড়ে নিতে চেয়েছি, তার মূল্য যেন না চাইতে নিজে থেকে হাতে এসে পৌঁছল।—"সাহেব, তিমি রামরু ছ"—এখনও যেন কানে বাজছে"। কুমার অবাক হয়ে দেখল, ডেভিডের কথা শুনতে ওর রীতিমতো ভালো লাগছে।—

কুমার বললে—"তোমার দেরি করিয়ে দিলাম নাকি? আপিসের বেলা হয়ে গেল?"

পীয়ারসন বললে,—"না, আপিসের বেলা হলে ভদ্রতার দায় মোটেই মানতাম না, ইংরেজ যদি কোথাও কাজ-পালায় ত সে ভারতবর্ষে। এদেশে

ওসব চলবে না, মদই খাও আর যাই কর, কাজ ফাঁকি দিতে পারবে না ; তাই আমি নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।”

—“ছেড়ে দিয়েছ না ছুটি নিয়েছ ?”

—“একেবারেই ছেড়েছি। আমি সারাদিন খেটে যা রোজগার করব তার অর্ধেকেরও বেশী জুনিকে দিতে হবে—তার ছেলেমেয়েদের জন্যে। কি বিচার! এরই নাম ব্রিটিশ জাস্টিস! তার চেয়ে আমি রোজগারই করব না। তা হলে ত আর ওকে দিতে হবে না। অবশ্য ও এখনও এ খবর জানে না, এখনি তা হলে এসে হাঙ্গামা লাগাত। ও জানবার আগেই আমি এখান থেকে চম্পট দেব।”

—“চম্পট দেবে ? বল কি, তা হলে তোমার সন্তানদের হবে কি ?”

—“ওঃ, তাদের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। অনেক সোসাইটি ইত্যাদি আছে, আর কিছু না থাকে ত আছেন আমাদের সরকার বাহাদুর—না খেয়ে কাউকে মরতে হবে না এদেশে। ছেলেমেয়েদের একটা-না-একটা ব্যবস্থা হবেই।”

একটা ক্ষীণ তুলনা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কুমারের মনের মধ্যে কাঁটার মত ফোটে। এদেশে মানুষের ভার মানুষেরই হাতে। আর ভারতে সব মানুষের সব ভার এক ভগবানের হাতে। বেচারা ভগবান, একা হাতে কত ‘যোগক্ষেমং’-এর ভার বইবেন, তার উপরে আবার শাস্ত্র বলছেন, তাঁর হাত নেই—অপানিপাদ।

তা যাক, ক্ষীণ হাসির অর্ধস্ফুট রেখা ঠোঁটের কোণে স্তব্ধ করে কুমার বললে,—“আর জুনি ? তার কি হবে ?”

—“তার বিষয়ে আমার ভাববার কথা নয়।”

—“স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি তাকে আজও ভালবাস ?”

—“ভুল দেখেছ, তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোমলতা আর আমার মনে অবশিষ্ট নেই। তাকে যে একদিন ভালবেসেছিলাম, এজন্যে রাগ হয় নিজের উপরে। ভেবে পাইনে কি করে দশ বছর তার সঙ্গ মুহূর্তের জন্য ছাড়তে পারি নি। আজ তার অঙ্গস্পর্শ করতে আমার ঘৃণা হয়। এ কি ভালবাসা ?”

জুনির জন্যে একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধ একটু কোমল করে আনল। কুমারের

মনকে বেচারা জুনি, ভালবাসার জন্যে চরিত্র খোয়াল, কিন্তু আজ কোথাও ওর জন্যে বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। কালকে ডেভিডের কথাবার্তায় কুমারের মনে হয়েছিল, এখনও হয় ত ওর নিহিত মনের গহনে জুনির প্রতি প্রেমের অবশেষ আছে। কিন্তু আজ সকালে সেকথা মিথ্যা মনে হচ্ছে। এই ঘৃণার তাপে সব প্রেম শুকিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই? নাকি এই তীব্র বিদ্বেষ তীব্র আকর্ষণেরই রূপান্তর?

পীয়ারসন বললে,—“এসব কথা থাক, এখন একটু রুটি মাখন খেয়ে পেট ভরিয়ে নাও।”

—“না থাক, তোমার কাছে অনেক নিতে হ'ল, আর বোঝা বাড়াব না।”

—“সে তুমি যা বোঝ।”

পীয়ারসন উঠে কাবার্ডের ভিতর থেকে রুটি-মাখন জ্যাম ইত্যাদি বার করল। একটা দুধের বোতলও বেরুল।

মুখ-হাত ধুয়ে পীয়ারসনের চিরুনি-ব্রাশে চুল আঁচড়ে কুমার যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখন পীয়ারসন কয়েক স্লাইস মোটা নরম রুটিতে পুরু করে মাখন আর মার্মলেড লাগিয়েছে। ওর পাশে রাখা সুগন্ধি কফির কাপের দিকে দৃষ্টিপাত করে কুমার বললে,—“আচ্ছা, আমাকেও বরং দু' স্লাইস্ রুটি দাও। তোমার কাছে এটুকু ধার আমাকে করতেই হবে। কারণ ডাক্তার আমাকে কিছুদিন নিয়মিত খেতে বলেছে।”

—“বেশ ত নাও না, তাই ত বলছি, এতে লজ্জার কি আছে?”

রুটির প্লেটটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে মুচকি হাসল পীয়ারসন,—আরে লজ্জা কি? ইংরেজ তোমাদের অনেক খেয়েছে, আজ না হয় দু'টুকরো রুটি খেয়ে তার শোধ দিয়ে যাও।”

'চেলসী'র বাড়ীটা যেন স্বপ্ন। বড় রাস্তা পেরিয়ে বাঁ-হাতি গলি ছোট একটা চতুষ্কোণ ভূখণ্ডকে বেষ্টন করে গেছে। স্কোয়ারের মরাঘাস এখন বরফে পিছল।

সোনাঝুরি গাছগুলির শুকনো কালো ডালে সাদা বরফের তুলোর সাজ ছিঁড়ে-খুঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

এ জায়গাটাকে অনায়াসে শহরতলী বলা চলে। এ পাড়ার সর্বাঙ্গ জুড়ে একটা কেমন যেন শহর-ছাড়া ভাব আছে। বাড়ীগুলি ছোটখাট নিচু নিচু, গাছের ছায়া ঢাকা ঢাকা, লতাকুঞ্জের ঘোমটা টানা টানা।

রমলা সেদিন বলছিল, এই শহরতলী দেখে ওর সেই শহরতলীর কথা মনে পড়ছে—সেই কলকাতার শহরতলী, সেই চারু এভিনিউ, সেই নাকতলা কলোনী। খোলা ড্রেনের পাশ দিয়ে জঞ্জালভরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, আর তার দু'ধারে বড় বড় তিন চার তলা বাড়ী। তাদের তলায় তলায় অসংখ্য ফ্ল্যাটে অজস্র বিভিন্ন পরিবার! তাদের ভিন্ন রুচির বিচিত্র শাড়ী ও ধুতি লম্বা লম্বা হয়ে বারান্দা দিয়ে ঝুলছে। খোলা ড্রেনের পচাগন্ধ মাঝে মাঝে বাতাস বেয়ে উঠে আসছে, এমনকি দোতলা তিন তলার উপরেও। আর সেই সরু রাস্তা কাঁপিয়ে, পথচারীদের নর্দমার মধ্যে ঠেলে দিয়ে গর্জন করে ছুটোছুটি করছে বাস, লরী আর মোটর। রমলা সেদিন অবাক হয়েছিল একথা ভেবে, যে, যেসব ইঞ্জিনীয়ররা পয়সা খরচ করে বিলেতে আসে ডিগ্রী নিতে, তারাই দেশে ফিরে অমন বিপরীত বিদ্যে দেখায় কেন?

এখানে এই ছোট্ট নিচু বাড়ীটায় ওদের এতগুলি লোকের দিব্যি এঁটে গেছে। কুমারের ত এ বাড়ীটা দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে, ও ত এখান থেকে যেতে নারাজ। এদিকে শীগ্‌গিরই হয়ত অন্য কোন শহরে ওকে যেতে হবে। কিছুদিনের জন্যে একটা চাকরী নেবে ঠিক করেছে কুমার, ফিরতি প্যাসেজটা জমিয়ে নেবে। যদি না অবশ্য কেউ প্যাসেজসুদ্ধ চাকরি দেয় দেশে। বাবা লিখেছেন, চাকরীর জন্যে ভেব না, আর কিছু না হোক ইঞ্জিনীয়ারিং কোন কলেজের প্রফেসারী একটা বাঁধা তোমার। কিন্তু কুমার পড়াতে চায় না, ও কাজ চায়, কোন গড়ার কাজ। শুধু বস্তুগড়া নয়, সেই সঙ্গে নিজেও প্রতিদিন নতুনভাবে গঠিত হয়ে উঠতে চায়। অন্ততঃ একটা কোন কাজ হাতে না করে দেশে ফিরে যেতে নারাজ কুমার। এত খরচ করে পাশটাশ

করে শেষে বেকার হয়ে দেশে ফিরবে না কি? এখন একটা মনোমত কাজের কথাই কুমারের মাথায় বেশী ঘোরে, মেরীর কথাও যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দেশের কথা মনে হলেই কুমারের মনটা পালাই পালাই করে। দেশ নয়, তবু যেন এখানে দেশের গন্ধ আছে। রমলা আর তার সব দলবল নিয়ে এই চেলসীতে ওরা যেন ছোট্ট এক টুকরো দেশ বানিয়ে তুলেছে। তার উপরে যখন-তখন মামাবাবুর গল্প আগুনজ্বালা শীতের সন্ধ্যাকে বড় বেশী আপনার করে তোলে।

প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী গেটের পাশ থেকে বরফ ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে রাস্তার এক পাশে ঠেলে রেখে দেয়। তাই দেখে অবাক হয়ে পার্থ বলে, কি সুন্দর!

বাড়ীটাতে ঢুকেই ছোট হলটার বাঁদিকে বসার ঘর আর তার পাশে উঠানের দিকে বেঁকে এগিয়ে যাওয়া ছোট ঘরটায় কুমার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আর ডান দিকের ছোট ঘরটা বাড়ীওয়ালীর স্বামীর বসার ঘর। এই ঘরটুকু আর উঠোন ছাড়া তাকে দেখা যায় না।

উঠোনের প্রায় কাঠাদশেক জমিতে চমৎকার বাগান ফলিয়েছে বুড়ো। টম্যাটো আর গাজর প্রায় কিনতেই হয় না। ঘরে বসে সারাক্ষণ টাইপ করে বুড়ো, খট্ খট্ খট্ খট্, আর তার পায়ের কাছে নরম কার্পেটে গরম আর গোল হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয় রোমশ কুকুর মাম্বো। আর পাশের ছোট্ট করিডোরটায় দাঁড়ে বসে দুলে দুলে ভুট্টা আর টম্যাটো খায় বুড়ী টিয়া পলি, আর চেঁচায়,—"ডারলিং ইওর কফি," কিম্বা গানের একটা লাইন—"লাভ ইউ আর লাভলি।"

বুড়ো কিন্তু এই বয়সেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে রসের গান গুন্‌গুন্ করে।

দোতলার একটা ঘরে থাকে একটি স্প্যানিশ ছেলে—নাম পিয়েত্রো। পাশের বড ঘরে রমলা থাকে তার ছেলেকে নিয়ে। ওপাশের কোণের ছোট ঘরটায় রমলার ভাগনী কৃষ্ণা তার বাক্স ইত্যাদি রেখে পড়ার টেবিলে বই গুছিয়ে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। ওর কেমব্রিজের টার্ম শুরু হতে এপ্রিল শুরু হবে, তাই এ তিন মাস একটা প্রাইভেট কোচিং নিচ্ছে কেমব্রিজে প্রবেশের জন্যে। আর দেড় তলার একটু বের করা লম্বাটে ঘরটায়

মামাবাবুর অধিষ্ঠান হয়েছে। এতগুলি লোক কিন্তু স্নানের ঘর একটি। ভারতে ইংরেজদের যেমন ঘরে ঘরে বাথরুম থাকে, এদেশে তার উলটো—একটি বাথরুম যথেষ্ট। আগে নাকি তাও থাকত না, বেশীর ভাগ বাড়ীতেই স্নানের ব্যবস্থা ছিল না। পিয়েত্রো বলে—ইংরেজরা ভারতের সংস্পর্শে এসে সভ্য হয়েছে, স্নান করতে শিখেছে। আমাদের দেশে এত স্নানের ঘরের বালাই নেই কিন্তু।

এই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঘরগুলির মধ্যে পার্থ তার সমস্ত চঞ্চলতা বাক্সে পুরে মনের মধ্যে তালাচাবি আঁটবার ইচ্ছায় ছিল। বুড়ী বাড়িওয়ালী সে তালাচাবি ভেঙে দিল। সমস্তক্ষণ সব কাজে ওকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিত, বাকি সময়টা কাটত মাম্বোর সঙ্গে ভাব করতে। পলির সঙ্গে কিন্তু বেশী জমত না পার্থের, কৃষ্ণাকেই পলি তবু একটু পছন্দ করত বোধ হয়। বুড়ো টমাস ফিন বলত—পলি একটা দারুণ ফেমিনিস্ট তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পছন্দ করে বেশী, আর সেকেলে সাফ্রেজিস্টদের মত কি দারুণ চেঁচায়।

বুড়ো জীবনে অনেক দুঃখ সয়েছে, অনেক সুখ বয়েছে। কাজ-অকাজ করেছে অনেক, এখন পেনসন নিচ্ছে আর বসে বসে নিজের জীবনী টাইপ করছে। সারাদিন খেটে যা লিখল, পরদিন হয় ত তা আর ভাল লাগল না। বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ বকে, ফের নতুন করে টাইপ করতে শুরু করল।

পার্থ বলে,—"কি তুমি লেখ আঙ্কল ?"

—"গল্প।"

—"কিসের গল্প ?"

বুড়ো হেসে বলে,—"জীবনের।"

মার্কাস বলে ভাগ্যে তোমরা এ বাড়ীটা পেয়েছ! এত মিশুকে ভদ্রতা বেশী দেখা যায় না, বিশেষতঃ এদের শিশু-প্রীতি। সাধারণতঃ ইংরেজরা বাচ্ছাকাচ্চার ঝক্কি সামলান বিশেষ পছন্দ করে না। তোমাদের জন্যে বাড়ী খুঁজতে কম জায়গায় ঘুরতে হয় নি, কিন্তু, প্রথম আপত্তি—"

—"ভারতীয়।" পাদপূরণ করে কুমার।

—"ইউ আর রাইট, ধরেছ ঠিক।"

কুমারের সহাস দৃষ্টির ফাঁদ এড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে মার্কাস বলে,

—"সবাইকে বোঝাতে বোঝাতে হয়রান হয়ে গেছি। এ এক আচ্ছা কুসংস্কার, কেন বল ত?"

—"এ যে দেখছি জাতবিচারেরই সামিল, প্রায় ছুঁৎমার্গ আর কি?

রমলার গলায় বিস্ময়,—"ভারতের ছোঁয়াচ নাকি?

—"দূর দূর, ছোঁয়াচে কিছু হয় না, ভিতরে যদি বিষ না থাকে। অন্ততঃ আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ত এই বলে।"

মামাবাবুর প্রবল হাসি এই সব আলোচনার অন্তর্নিহিত খোঁচাগুলি যেন বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল,—"তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রেও তাই বলেছে, দেহের অবস্থা যদি অনুকূল হয় তবেই বাইরের ছোঁয়াচ চেপে ধরে। মানুষের রক্তে রয়েছে এই বিষ। এক এক দেশ এক এক জাতে তার এক এক রকম প্রকাশ।"

কুমার বলে,—"কিসের বিষ মামা? মানুষকে অপমান করা, তাকে হীন প্রতিপন্ন করার দুরারোগ্য ব্যাধির?"

—"ব্যাধি? তাই কি?" ভাবতে চেষ্টা করে মার্কাস,—"আমার ত মনে হয় এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, স্বাস্থ্যের স্বভাবই হচ্ছে এই যে, সে, নিজেকে বাঁচাতে চায়। দেশের সব সমাজব্যবস্থার মূলেই রয়েছে এই বাসনা। এর মধ্যে অপরকে আঘাত করার ইচ্ছের চেয়ে নিজেকে রক্ষা করার বাসনাই প্রবল!"

—"ধর—।" টেবিলের উপরে মুঠো করে ধরে রাখা দু'হাত রেখে একটু ঝুঁকে, মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে,—"ধর, আমি যদি আজ গিয়ে তোমার দেশের কোন সাধারণ গৃহস্থ ঘরে অতিথি হতে চাই, তারা রাজী হবে কি?"

—"না হবে না।" মামাবাবু ঘাড় নাড়লেন।

—"তারা ভয় পাবে।" মার্কাস বললে,—"কেমন ত? ভাববে, আমি তাদের সমস্ত থেকে মূর্তিমান বিপরীত; ভাববে, তাদের সমাজব্যবস্থায় এ আমার অনধিকার প্রবেশ।"

—"এরাও ঠিক তাই ভাবছে ত? তা হলে তোমরা আমাদের চেয়ে উন্নত কিসে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে উঠে দাঁড়ায় রমলা।

—"হেভেন্স! নো!" মার্কাস বলে,—"আই নেভার থিঙ্ক উই আর

ইন এনি ওয়ে। সত্যিই আমি তা কখনও মনে করি না। উন্নত আবার কিসে?"

—"অন্ততঃ চেহারায়।" মামাবাবু হাসলেন।

—"মামাবাবু, তোমার কাছে একথা আশা করি নি। তুমি নিজেই ত অধিকাংশ ইংরেজের ঈর্ষার পাত্র। তোমার ত তবু বাদামী রং কিন্তু তোমাদের গাঢ় রংই আমাদের পছন্দ বেশী।—শ্রীমতী চ্যাটার্জি!" মার্কাস রমলার দিকে ফিরল,—"জেনে রেখ, তোমার পার্থ যেমন করে মিসেস গ্রেগারের হৃদয় দখল করেছে, সাধারণ ইংরেজের ছেলে তা পারত না। ওর বিদেশী টানের মিঠে মিঠে বুলি, আর ঐ মেটে মেটে রং এই দুইয়ে মিলিয়েই ও বুড়ীর মন ভুলিয়েছে সন্দেহ নেই।"

ছেলের প্রসঙ্গে রমলার শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটল। বললে,—"কিন্তু তুমি ত বলছিলে এ দেশে শিশুপ্রীতি কম।"

—"হাঁ সে ত বটেই।" মার্কাস বললে—"অধিকাংশ হোটেলেই ওদের রাখার নিয়ম নেই।"

কুমার বললে,—"শুধু হোটেলে কেন, প্রাইভেট বাড়ীতেও প্রায় তাই—ফিডিং বট্‌লের স্টেজ পেরোলেই ত বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

মার্কাস বললে,—"তোমার কি মনে হয় না যে বোর্ডিং-এর শিক্ষাই শিশু অথবা কিশোরদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। মা-বাবার আওতা থেকে সরে যাওয়াই ওদের মঙ্গল। ওরা বুঝতে শেখে যে ওরা শুধু মা-বাপের আদরের পুতুল নয়, ওরাও আর পাঁচজনের মত।"

—"ঠিক।" মামাবাবু বললেন,—"খুব ঠিক, বাড়ীতে ওরই জন্যে সব, আর বোর্ডিং-এ ওকেও অন্যের জন্যে সমানে করতে হয়। তা ছাড়া নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ এবং সংযত ব্যবহার বোর্ডিংয়েই মানুষ শেখে।"

মামাবাবুর মত মার্কাসের মতের সঙ্গে মিলে গেল, মামাবাবু হেসে বললেন,—"সেই জন্যেই ত পার্থকে এখানে আনলাম। ওখানে থাকলে ও মায়ের কোল ছাড়তে পারত না। যতই বড় হোক সে ওর পিছন পিছন ছুটত। আমাদের দেশে আজকাল ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং-এ দেওয়ার তেমন রেওয়াজ নেই। অথচ আগেকার দিনে অধিকাংশ ছেলেকেই গুরুগৃহে যেতে হত।"

—"ঠিক ঠিক।" মার্কাস হেসে উঠল—"তোমাদের সেই গুরুগৃহ আর আমাদের এই বোর্ডিং আদর্শের দিক দিয়ে অনেকটা এক।"

—"কি আশ্চর্য।" এতক্ষণে রমলা কথা কইলে। রমলার গলার স্বরে কি একটা আছে যা মানুষকে একসঙ্গে দূরে ঠেলে এবং কাছে টেনে আনে। রমলা বললে—"সেকালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে আধুনিক বোর্ডিং স্কুলের তুলনা কি করে সম্ভব আমি ভেবে পাই না। দুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে।"

রমলার দুই কাজলকালো চোখের ভরা দৃষ্টির উপরে নিজের সোনালী পক্ষ্মঘেরা ছোট ছোট নীল চোখের গভীর দৃষ্টি মেলে মার্কাস বললে,—"কি রকম?"

—"কি রকম তা অবশ্য এক কথায় বলা যায় না, তবু বলি—"

রমলার কথা শেষ হতে চায় না, পুরুষের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির সামনে ওর চকিত দৃষ্টি অস্বস্তিতে মুষড়ে পড়ে, সঙ্কোচে নেমে যেতে চায়। মার্কাসের দৃষ্টি নড়তে চায় না, থামতে জানে না, একটা নিশ্চল জিজ্ঞাসার জিদ চোখের সামনে মেলে ধরে নিঃশব্দে পড়ে থাকে।

কুমারের চোখের কোণে ছলকে ওঠে হাসি। বলে,—"ঘাবড়াস নে রমু, এদের রকমই ওই। চোখে চোখ রেখে কথা বলা এদের স্বভাব। ওদের কাছে এইটেই সভ্যতা, আমাদের কাছে যা ঘোরতর অসভ্যতা।"

চোখের হাসি চোখে রেখে গম্ভীর ভাবে কুমার কথাগুলি বললে, তেমনি সুরেই জবাব দিতে চাইল রমলা,—'কি করে জানলে যে আমি ঘাবড়ে গেছি,' কিন্তু পারল না। কথা শেষ করার আগেই হেসে ফেলল হঠাৎ। যেমন-তেমন হাসি নয়, একেবারে যে পাগলাঝোরার হাসি। দেখে মনে হল হঠাৎ যেন মুহূর্তে ওর বয়স কমে গেছে, নেমে গেছে সংসারের ভার দেহ থেকে, মন থেকে খসে গেছে জীর্ণতা, যেন কোন কষ্ট ওর নেই কোনকালে, ও যেন বিরহিনী নয়, দুঃখিনী নয়, বিধবা নয়। ও যেন বসন্তের একটি আনন্দলতিকা। সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুমারের মুখ আর মামাবাবুর কপালে নামল স্নেহের ছায়া। দুজনের উৎসুক দৃষ্টি তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ওদের দুজনের স্নেহ-করুণ ভালবাসা যেন হাতে হাতে ধরে ওকে আগলে ঘিরে রইল। সেখানে মার্কাসের প্রবেশের পথ রইল না।

অপ্রস্তুত চোখ তুলে দ্বিধামিশ্রিত ছোট্ট একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে সে

বললে,—“এ অন্যায়, রীতিমত অন্যায়। এতে হাসির কি থাকতে পারে? আমার গুরুগম্ভীর আলোচনার উত্তরে, এই অকারণ হাসি রীতিমত অপমান।”

শুনে রমলা হাসি থামিয়ে বলেছিল,—“পার্ডন, তোমার কথায় হাসি নি, হেসেছি কুমারের কথায়।”

—“ওঃ, কেন?”

রমলার মুখের চাপা হাসি লাল হয়ে কুমারের চোখে চোখে নিষেধের ইশারা করল।

মামাবাবু বললেন,—“এরই নাম আনফেয়ার এ্যাডভ্যানটেজ নেওয়া। মার্কাস তোমার অভিযোগে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।”

—“কিছু ভাবনা নেই।” মার্কাস বললে,—“আমিও বাংলা শিখছি। তখন আর আমাকে এমন অপদস্থ করতে পারবে না।”

—“ব্রাভো! সত্যি শিখছ?”

—“নিশ্চয়, দুটো সেনটেন্স পুরো জানি।—টুমার নাম কি? আমার নাম পার্ট।” বলতে বলতে সত্যি এল পার্থ। ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেল ড্রইংরুমে।”

সেখানে অনেকে অপেক্ষা করছে।—ওদিকে থেকে এসেছে অমিতাভ আর সিরাজ আলি—ওরা দুজনেই ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করে। সিরাজের সঙ্গে কুমারের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। ওদের একসঙ্গে দেখলেই মার্কাস বলত—কই তোমরা লড়াই করছ না ত—হিন্দুস্থান পাকিস্থান। আজকাল আর মার্কাস এ ধরনের ঠাট্টা করে না, একটু যেন বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে। কুমার মনে মনে হেসে ভাবে—সেটা বোধহয় ভয়ে, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে ঠিক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না বলেই বেশীর ভাগ চুপ করে থাকে। অথচ ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছে খুব বেশী বলে, না এসেও পারে না। রোজ সন্ধ্যেবেলা সাউথ কেন্‌স থেকে চেলসীতে এসে গল্পগুজব করে যাওয়া ওর রুটিনে দাঁড়িয়েছে প্রায়।

অমিতাভ আর সিরাজ দুজনেই সভাসমিতি করতে খুব ভালবাসে। এদের চেষ্টায় থেকে থেকেই লণ্ডন শহরের নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ক্লাব বা সঙ্ঘ গজিয়ে ওঠে, আবার কিছুদিন পরেই মিলিয়ে যায় ফেনার বুদ্বুদের মত। ওরা ঘোরতর দার্শনিক, তাই জানে যে, জীবনটার মতই সভা-

সমিতিগুলিও ভবের পদ্মপাত্রে জল—সদাই করতেছে টলমল—একটুখানি মতান্তরেই অমনি রসাতল। একথা জানে বলেই সভামৃত্যুতে ওরা আর শোকাতুর হয় না—এমনকি সভা বা সঙ্ঘ ইত্যাদির জন্মদিনেই তারা তার মৃত্যুর তারিখটা পর্যন্ত অনুমান করতে পারে। তবু ওদের অফুরন্ত উৎসাহ। একটা সঙ্ঘ শেষ হতে না হতেই নতুন সঙ্ঘসৃষ্টির কথা ভাবে। এমনই একটা নতুন সঙ্ঘের উদ্বোধনে ওরা নিমন্ত্রণ করতে এসেছে মামাবাবু ও তাঁর পার্টিকে।

হঠাৎ ঈভ এসে পড়ল। মুখে চোখে উৎসাহের বাতি জ্বালিয়ে বললে,—"চললাম,—অনেক সাগর পেরিয়ে।"

—"অর্থাৎ?"

—অর্থাৎ বোঝা গেল, যে জাহাজে চাকরি নিয়েছে ঈভ, আর চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে ওকে নিশ্চয়ই ওর নতুন পাওয়া তরুণ ভক্ত টমসন্।

ড্রইংরুমের মাঝখানে এখনও ক্রীস্টমাস ট্রীটা জরির তুষারমালা ডালে ডালে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ছাদে ঝুলছে রঙীন কাগজের মালার নক্শা। দু'একটা বেলুন এখনও উঠে বসে আছে ছাদের গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে কুমারের সেদিনের সেই স্বপ্নের মত উৎসব-রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন এ ঘরে আলোর বন্যা জ্বলেছিল। এখানে-ওখানে রঙীন আলোর মালা। পিয়ানোয় বসে বুড়ী গ্রেগার 'ক্যারল' বাজাচ্ছিল আর ওরা সবাই সাধ্যমত যোগ দিয়েছিল। অনেকে ছিলেন নিমন্ত্রিত, তার মধ্যে ঈভকেই কুমার আগে থেকে চিনত।—ওর বাবা দক্ষিণ ভারতীয় আর মা বাঙালী ক্রিশ্চানের মেয়ে। শুধু এইটুকু ছাড়া ওর পূর্বপরিচয় আর কিছু জানে না কুমার। ও নিজে দশ বছর বয়েস থেকেই বিলেতের বোর্ডিং স্কুলে আছে। সম্প্রতি নার্সিং পরীক্ষায় পাস করে সার্টিফিকেট পেয়েছে। ঈভ যদিও পুরোপুরি বিদেশিনী,—তবু ওর রঙে চেহারায় বাংলা দেশের ছাপ আছে। দেখে কুমারের অবাক লাগত।—মনে হোত ঈভ যদি একখানি রঙিন ডুরে শাড়ি পরে কপালে টিপ এঁকে ঘুরে বেড়াত তবেই ওকে মানাত বেশী। তাই ঈভকে ও দাদা বলতে শিখিয়েছে। ঈভ সেদিন তার বন্ধু ডরোথিকেও নিয়ে এসেছিলো।

ওদের ছিল সাপার পার্টি—স্যাণ্ডউইচ আর শুকনো পাই আর নতুন

ক্রীস্টমাস কেক্। তারই সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ বছরের পুরনো কেকের ছোট একটা টুকরো। সকলের ভাগেই তার অতিক্ষুদ্র ভাগ রইল।

শ্রীমতী গ্রেগার বলেছিলেন,—"এই কেক পঞ্চাশ বছর ধরে আমার কাছে আছে। প্রায় প্রতি বছরই এর দেহ থেকে খসিয়ে নিই একটু-আধটু অংশ। স্বাদ পাই পঞ্চাশ বছর আগের—যখন আমার বাইশ বছরের নতুন জীবনে প্রথম উৎসবের আহ্বান এসেছিল। সেদিন আমার পাশে যে সঙ্গী আমার সব কাজের হাতে হাত লাগিয়েছিল তারও স্পর্শ যেন লেগে আছে এর মধ্যে। শুনে রমলার কৌতূহল হয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল কুমার, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে নি।

বুড়ো গ্রেগার দুঃখের ভান করে বুকে হাত দিয়ে বলেছিল—"ওহো-ও, তোমার সেই প্রথম স্বামীর কথা আর আমার সামনে বলো না, শুনলে এখনও আমার ঈর্ষায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়।"

শুনে ওরা সবাই হেসেছিল, হাসাবার জন্যেই বলেছিল বুড়ো। বিষাদের যে কুয়াশাটা জমে উঠব উঠব করছিল হাসি দিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে। তবু কুমারের মনে হয়েছিল কথাটার মধ্যে হয় ত খানিকটা সত্য আছে লুকিয়ে।

গ্রেগার বলেছিল,—"আর সে গতকথায় কাজ কি সখি, আমরা দুজনেই ত সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলি পার করে হঠাৎ একদা প্রৌঢ় জীবনের শুরুতে, 'উইণ্ডারমীয়ার' হ্রদের ধারের এক ছোট্ট রেস্তোরাঁয় পরস্পরকে দেখে বললাম—'ওয়েলকাম'।

—"সেদিন প্রৌঢ়ত্ব যে আনন্দ, যে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছিল যৌবনে তার সন্ধান পাই নি।"

শুনে শ্রীমতী গ্রেগার আবার একটু হেসেছিল, আলো-ঝলমল উৎসবের মাঝখানে মুহূর্তের জন্যে যেন একটা ছায়া পড়েছিল, পরক্ষণেই ছুটে এসেছিল ঈভের বন্ধু ডরোথি। লেস-সাটিনের সাদা স্কার্টের কোণ বাঁ হাত দিয়ে ঈষৎ তুলে ধরে ডান হাতে মিসিলটো নিয়ে কুমারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"**Under the mistleto**।"

সঙ্কুচিত লজ্জায় দু'পা পিছিয়ে এসেছিল কুমার। মামাবাবু মুখ টিপে হেসেছিলেন, কৃষ্ণা আর রমলা তাদের দু'জোড়া কালো চোখ বড় করে

অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিল ঈভ, বুড়ী গ্রেগার উৎসাহে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন,—"ছাড়াছাড়ি আর নেই, চুমু তোমাকে খেতেই হবে। ক্রীস্টমাস-ঈভের দিন—তরুণী মেয়ে হাতে মিসিলটো নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর তাকে ফিরিয়ে দেবে তুমি? এমন আনশিভ্যলরাস্ কাণ্ড ঘটতে দেবো না, খাও চুমো।"

আদেশ পালন করতে বার বার এগিয়ে এসেছিল কুমার, বার বার তন্বী তার তনু নত করে হেসেছিল আর সেই হাসির ধাক্কায় বার বার ফিরে এসেছিল কুমার। শেষে একসময়ে মরীয়া হয়ে ধাঁ করে একটা চুমু দিয়েছিল কুমার। পরক্ষণেই অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়েছিল রমলা আর কৃষ্ণার দিকে। রমলার চোখে ছিল কৌতুক হাস্য, আর কৃষ্ণার চোখে কি তা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে নি কুমার। তার আগেই হাত বাড়িয়ে ডরোথি বলেছিল,—"দাও, দস্তানা দাও।"

—"দস্তানা?" কুমার যেন হঠাৎ বোকা বনে গিয়েছিল।

বুড়ো বললে,—"হ্যাঁ, দস্তানা বই কি? সিল্কের কিংবা লেসের কিংবা ঐ রকম কিছু। মেয়েকে চুমু খেলে দস্তানা দিতে হয়, আর ছেলেকে রুমাল।"

—"রুমাল দেবার জন্যে আমার হাত ছটফট করছে—এই দেখ।"

পিয়েত্রো যাদুকরের ভঙ্গীতে কোটের হাতের ভিতর থেকে অসংখ্য ছোট ছোট লেসের পাড়বসানো বিচিত্র রুমাল বার করলে, দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে বললে,—"এই দেখ, আমি আগে থেকে দান সংগ্রহ করে রেখেছি, এখন বল দেখি কার কাছে আগে যাব?"

—"খবরদার!" বুড়ো গ্রেগার চেঁচিয়ে উঠল—"তুমি যার কথা ভাবছ আমিই যাব আগে তার কাছে।"

ওরা দুজনেই দুটি ডাল নিয়ে এগিয়ে গেল কৃষ্ণার দিকে। দেখে কৃষ্ণা ভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। সেদিকে তাকিয়ে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বুড়ী দয়াপরবশ হয়ে বললে,—"ওকে ছেড়ে দাও, বেচারী মাত্র সাত দিন হল এদেশে এসেছে।"

—"হ্যাঁ, এই সমস্ত বর্বর কাণ্ডকারখানা ধাতস্থ হতে সময় লাগে বই কি,"

পিয়েত্রা হেসে হেসেই সরে এসেছিল,—"নেভার মাইণ্ড, আমরা না হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে আগাম দাদন হিসেবে রুমালগুলি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম।"

উপস্থিত সব মেয়েরা এমনকি বুড়ী গ্রেগারও পেল তার ভাগ।

পিয়েত্রা বললে,—"মেয়েমাত্রই আমার মনে দোলা লাগায়, বুড়ী-ছুঁড়ি মানি না।"

সবাই হাসল আর তার মধ্যে গ্রামোফোনে নাচের সুর বাজিয়ে দিল ওরা। ফক্সট্রটের নৃত্যরাগিনীর মায়াময় স্বপ্নরা উড়ে বেড়াল, বেলুনের ফাঁকে ফাঁকে রঙীন আলোর ঝরনায়।

আরও কয়েকজন গেস্ট ছিল গ্রেগারদের। মাঝবয়সী বিধবা 'সারা' ও তার তরুণী মেয়ে 'শীলা' আর বস্‌ওয়েল বেকার। আরও কে কে যেন মনে নেই কুমারের।

সবাই নাচল, শুধু কৃষ্ণা আর রমলা চুপ করে বসে বসে দেখল। ঈভের সঙ্গে নাচতে নাচতে পিয়েত্রা কৃষ্ণাদের কথা জিজ্ঞাসা করল,—"ওরা নাচবে না?"

—"না বোধ হয়, ভারতে কেউ জুড়িনাচ পছন্দ করে না," ঈভ তার সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করেছিল।

—"কেন করে না?" পিয়েত্রা জিদ করেছিল।

—"আমি জানি না।" ঈভ বলেছিল,—"তুমি কুমারকে জিগ্যেস কর।"

'সারা'র সঙ্গে নাচ সেরে মামাবাবু কৃষ্ণাকে এসে ডেকে নিলেন। মামাবাবুর শিক্ষিত পদক্ষেপের তালে তালে কৃষ্ণার পা পড়তে লাগল। ও মামাবাবুর পায়ের দিকে নজর করে বেশ নাচতে লাগল।

মামাবাবু বললেন,—"পায়ের দিকে চেয়ে নাচে না বোকা মেয়ে। মুখ তুলে চাও আর ফিসফিস করে গল্প কর।"

মামাবাবুর কথা শুনে হেসে ফেলেছিল কৃষ্ণা। ফিসফিস করেই বলেছিল,—"কি গল্প করব দাদু?"

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে চুপি চুপি বললেন,—"আর কিছু ভেবে না পাস ত বল না হয় আমার একটা গাধা ছিল—তার কান দুটো সাদা"।

—"আমার একটা গাধা ছিল," বলতে বলতে হাসতে হাসতে কৃষ্ণা মুখ

তুলে তাকাল। সামনেই ডরোথি আর কুমার নাচছে। আর মামাবাবু যেমন বললেন তেমনি ফিসফিস করে কথা কইছে। দেখে কৃষ্ণার হাসি একটু থমকে গিয়েছিল, বলেছিল,—"আচ্ছা দাদু, আন্দাজ কর ত ওরা ফিসফিস করে কি বলছে? গাধার কথা কি?"

—"দূর দূর।" মামাবাবু হাসলেন—"কুমার কি বলছে জানিস?"

—"না,—কি?" কৃষ্ণার চোখেমুখে কৌতূহল উৎসুক হয়ে উঠল।

—"কুমার বলছে—দেখ ডরোথি ঐ যে কালো মেয়েটি আমার ভুঁড়িদার মামার সঙ্গে নাচছে—ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে মন করেছেন আমাদের বড়রা। তাই কুমারী ডরোথি, তোমার সঙ্গে আমি এখন বেশী প্রেম করতে পারব না।"

—"যাও দাদু, তুমি এত বাজে বকতে পার।" কৃষ্ণা নাকি রেগে মুখ লাল করে আবার পায়ের দিকে তাকিয়ে নাচতে শুরু করেছিল। অন্ততঃ মামাবাবু কুমারকে তাই বলেছিলেন পরে।

হঠাৎ এক মুহূর্তে ক্রিস্টমাস ট্রীটার দিকে তাকিয়ে সে রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল কুমারের। হঠাৎ একদিনে ওরা সকলেই কেমন পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ধর্ম, সংস্কার, জাত ও ভদ্রতার আড়াল ঘোচানো বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গ সুর ওদের সকলেরই মনে মনে কোথা থেকে উঁকি মারছিল। শুধু রমলা সেদিন চুপ করে বসেছিল। আজও তেমনি করেই বসে আছে। এই রমলার সঙ্গে কুমারের চিরদিনের চেনা দুরন্তপ্রাণা রমলার মিল নেই। বিষাদ যেন এখনও ওকে একটা পাতলা কুয়াশার আবরণে ঢেকে রেখেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমার বললে,—"ঈভ, তোমার জাহাজ কবে ছাড়বে বল, আর কোন্ ডক থেকে? যদি টিলবেরী থেকে ছাড়ে ত আমরা তোমায় বিদায় দিতে যাব।"

অমিতাভ বললে,—তারা এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করেছে, প্রতি পূর্ণিমায় তার অধিবেশন হবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এক এক দিন এক এক বিষয়ে আলোচনা থাকবে। এবারে ফরাসী পণ্ডিত দকতর এন ব্রস্তেকে আনবে ওরা, তিনি নাকি লণ্ডনে এসেছেন। মামাবাবুর গান দিয়ে উদ্বোধন করতে চায়। মামাবাবুর সঙ্গে যদি আর কেউ গায়, তো, খুব ভালো।

শিরাজ আর অমিতাভ ভীরু চোখে তাকাল কৃষ্ণা আর রমলার দিকে। তাই দেখে মামাবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন,—"হ্যাঁ, ওরা দুজনেই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গলা মেলাবে। তাতে ভারি জমে উঠবে।"

অমিতাভ খুশী হয়ে বললে,—"দেশী লোকদের সব খবর দেবে।"

শিরাজ বললে,—"না, বিলিতীদেরও। হতভাগারা ভাল গান কখনও শুনতে পায় না, তাই দেশী সুরের প্রতি এত অবজ্ঞা।"

—"শুনলেই কি বুঝবে?" কুমার বললে,—"এরা যা কনভেন্শনাল জাত বুঝতে পারলেও ভান করবে যেন বোঝে নি। ভাল লাগলেও সেকথা মানতে এদের অহঙ্কারে ঘা লাগবে।"

—"এ কথায় কিন্তু সায় দিতে ঠিক পারছি না।" মার্কাস বললে,—"অবশ্য যদি বল যে, না বুঝলেও ভদ্রতা করে মিথ্যে বলা উচিত, তা হলে না হয়, না বুঝেও জোর দিয়ে বলতে পারি যে অতি চমৎকার হয়েছে।"

—"অর্থাৎ?" প্রশ্ন করলেন মামাবাবু।

কুমার ভয়ে ভয়ে তাকাল রমলার দিকে। এই বুঝি সে কোন তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে, এই শান্ত সন্ধ্যার বুকের মাঝখানে সেই কাঁটাটা বিঁধিয়ে দেয়, যা আজও ওর বুকের মধ্যে রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু রমলা কিছু বলল না, হঠাৎ ও যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এমন ও প্রায়ই হয়ে যায়, কে জানে হয় ত সেই মুহূর্তে রঞ্জন এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল। না কি সুকান্তর শোকে আজকাল আর রঞ্জনকে মনে পড়ে না।

হঠাৎ কুমারের মনে পড়ল, রঞ্জনের কথা নিয়ে একদিন মেরীর সঙ্গে তর্ক বেধেছিল। মেরী বলেছিল,—"তোমার ব্যাখ্যা থেকে কিন্তু বোঝা গেল না রঞ্জনের সঙ্গে রমলার কি সম্পর্ক ছিল—ভক্তি না ভালবাসা?"

—"ও দুয়ে বিশেষ তফাত আছে কি?" কুমার হেসেছিল,—"যদি—"

ওর কথা শেষ করতে দেয় নি মেরী। বিদ্রূপ চমকানো গলায় বলে উঠেছিল,—"ভালবাসাকে ভক্তির নাম করে লুকিয়ে রাখা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।"

সেই মুহূর্তে মেরীকে অসহ্য লেগেছিল ওর। মনে হয়েছিল হৃদয়হীন, মনে হয়েছিল ওর জীবনের সবচেয়ে দরদের স্থানটাতে ও যেন ইচ্ছে করে বারে বারে হাসির ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। কেন বুঝতে পারত না কুমার, এক-একবার

সন্দেহ হ'ত যে, রমলার প্রতি কুমারের আন্তরিক স্নেহকে হয় ত ঈর্ষা করে মেরী, তখন রাগ হ'ত মেরীর উপরে। ওর অতি নির্দিষ্ট সুকঠিন মতামতগুলি সহ্য হ'তে চাইত না—কিন্তু ওর সঙ্গর দুর্নিবার আকর্ষণের হাত এড়ানো কুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতই রাগ হোক, মেরী এসে ঘন হয়ে কাছে বসলে ওর আর সেকথা মনে থাকত না। কিন্তু—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুমার ভাবলে—এই ত আজ কতদিন হল মেরীর সঙ্গে দেখা নেই, তবু দিন ত চলেই যাচ্ছে বেশ ভাল ভাবেই, খুব যে একটা দুঃখে বুক ফাটছে তাও ত নয়। হঠাৎ কথার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কুমার। ওদের বাড়ীর ধরনই এই। কৃষ্ণা মামাবাবুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললে,—"দেখুন দাদু, আপনাদের কুমার কার্তিকটি পাঁচজনের মাঝখানে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে দূরযানী ডরোথির ধ্যান করছেন।"

মামাবাবু হেসে বললেন,—"ও মনকে স্যুইচ অফ করে দিয়েছে। গ্রেট-ম্যানরা এ রকম করে থাকেন শুনেছি, কাজেই অন্ততঃ এদিক দিয়ে ওর মহত্বে সন্দেহ করতে পারবি নে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনের বাতি যে নিবাল, সে ডরোথি না কৃষ্ণা তা হলপ করে বলতে রাজী নই।"

কৃষ্ণা হেসে বললে,—"অর্থাৎ ?"

ওদিকে মামাবাবুর 'অর্থাতে'র উত্তরে, এতক্ষণ মার্কাস খানিকটা লেকচার দেবার চেষ্টা করছিল। অর্থাৎ ভারতীয় নাচ তার ভাল লাগে, বিশেষতঃ ভরতনাট্যম। কুমারী শান্তার নৃত্য দেখেছে। অমন অদ্ভুত, অমন অপরূপ, অমন প্রচণ্ড, অমন দুরন্ত উচ্ছ্বাস আর কোথাও দেখেছে বলে মনে হয় না। এ ত নাচ নয়, যেন নায়গ্রার জলপ্রপাত। রমলা আর্টিস্ট, এ নাচ তাকে প্রেরণা দিতে বাধ্য। শান্তা এখন ফ্রান্সে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছে, অন্ততঃ একদিনের জন্যে হলেও রমলার দেখে আসা উচিত। রমলা যদি চায়, তা হলে মার্কাস সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারে।

—"বুঝলাম।" রমলা বললে,—"সবই বুঝলাম, কিন্তু কথা হচ্ছিল গানের, এর মধ্যে নাচ এল কোথা থেকে ?"

—"নাচ ও গানের উৎসমূল একই, তাই মাঝে মাঝে পরস্পরে ডাক বদলে নেয়।" মার্কাস হাসলে,—"এটা আমার সাফাই, অর্থাৎ তোমাদের গান তেমন ভাল না লাগলেও নাচ আমাদের মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য যারা

সত্যি নাচ জানে তাদের দেখেই—এখানে ত প্রায়ই দেখি, বিভিন্ন ভারতীয় জলসায় নাচের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকটি তরুণী সংগ্রহ করে নেহাতই মামুলী ধরনের হাতপায়ের কয়েকটা অতি প্রচলিত ভঙ্গী আর তার সঙ্গে তেমনি কথা বলা গান কিংবা টমটম"।

—"টমটম কি?" কৃষ্ণার গলায় অবাক বিস্ময়?

কৃষ্ণার মৃদু স্বর কানে গেল শিরাজ আলির। বললে,—"টমটম ম'নে নিশ্চয় তবলা।"

মার্কাস বলে,—"শাস্তার নাচের সঙ্গেও ভারতীয় গান শুনেছি, কিন্তু কি রকম যেন একঘেয়ে গোঙানির মত।"

অনেকক্ষণ পরে ঈভ কথা বললে,—"ডরোথিও কিন্তু তাই বলে,—ভারতীয় গান ওদের কানে কান্নার মত শোনায়।"

বলতে বলতেই বাইরে ঘণ্টা বাজল, ডরোথি আর ঈভের সেই বন্ধু টমসন্।

ডরোথি বললে,—"হ্যালো কুমার, তোমার দেনার উপরে ডিক্রিজারি করতে এসেছি।"

—"তোমার মোজা আমার কাছেই আছে, এই নীচের ঘরে—কুমার তার পরদিনই কিনে এনে দিয়েছে।" শ্রীমতী গ্রেগার তার ঘরের দিকে গেলেন।

কুমার বললে,—"দেখলে ত আমি কেমন ভালমানুষ, ঋণশোধের ব্যবস্থা আগেই করে রাখি।"

ডরোথি তার তারার মত উজ্জ্বল চোখ কুমারের কালো চোখে ফেলে রেখে হাসল। তার তরুণ সুন্দর পুরন্ত মুখে আর বাঁশীর মত সরু নাকের ভঙ্গীতে বিজয়িনীর গর্ব। ওর ওই নীল চোখের সোনালী পক্ষগুলি কি করে ও রকম ধনুকের মত বেঁকে উল্টে গেল—ভাবতে চেষ্টা করে কৃষ্ণা, কিন্তু স্পষ্ট করে ওর দিকে তাকাতেও পারে না যেন। মাগো, কি লজ্জা! অমন করে কোন মেয়েকে পুরুষের চোখের দিকে তাকাতে দেখে নি কৃষ্ণা আগে। ও লজ্জায় নিজের চোখই সরিয়ে নেয়।

ঈভ বললে,—"জান, ডরোথি একজন বেশ পাকা গাইয়ে।"

—"সত্যি নাকি? তা হলে পিয়ানোয় বসোই না।"

—"রক্ষে কর, গানের রিসাইটেল দিতে আমি রাজী নই, তার চেয়ে

বরং শোনাই ভাল। এখানে যখন এত ভারতীয়, তখন ভারতীয় গানই হোক না, যদি কারও জানা থাকে।"

পিয়েত্রা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল। যখন অনেক লোকে কথা বলাবলি করে তখন এইটেই তার ভঙ্গী। টম-ডরোথির হঠাৎ প্রবেশে বাক্যস্রোতটা একটু যেন থামল, সেই সুযোগে পিয়েত্রা বললে, —"রাইট ইউ, ম্যাম্যাব্যাবো আপঁনি গান ধরুন, শ্রীমতী গ্রেগার পিয়ানোয় বসুন, আর আমি টমটমের বদলে টিমটিম বাজাই।" ও বড় বড় নিঃশব্দ পা ফেলে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল ক্যাস্টিলোনো আনতে।

শ্রীমতী গ্রেগার উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলেন, বললেন,— "যথেষ্ট কথার স্রোত বয়ে গেছে এতক্ষণ, এবারে গানের ঢেউ বয়ে যাক, তার পরে—"

—"আমি সবাইকে কফি খাওয়াব।" রমলা পাদপূরণ করে।

—"তোমার বন্ধুদের এক কাপ করে কফি খাওয়াতে আমি ফতুর হতাম না রমলা।"

শ্রীমতী গ্রেগার বললেন,—"বাট ইফ ইউ সো উইশ,—তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ।" শ্রীমতী গ্রেগার পিয়ানোর ডালা খুলে বললেন,—"নাউ, আমি আগে শুরু করি, তার পরে রায়, তুমি গলায় তোমার ট্রাম্পেট বাজিও। তোমার সঙ্গে যদিও আমি চলতে পারব না, অর্থাৎ তোমাদের মত সুর শুনে বাজাতে পারব না, কিন্তু তোমার জন্যে পথ প্রস্তুত করে রাখতে পারব। অর্থাৎ এই কথার কচকচিভরা সন্ধ্যেবেলাটাকে দলাই-মলাই করে তোমার জন্যে একটি সুরের 'এটমোসফিয়ার' তৈরি করার চেষ্টা করব।"

পিয়েত্রা তার ক্যাস্টিলোনো বাজিয়ে বললে,—"নাউ, নাউ, নাউ।"

অমনই শ্রীমতী গ্রেগারের সত্তর বছরের ফোলা-ফোলা মোটা-মোটা আঙুলগুলি ঝনঝন করে পিয়ানোর উপরে বেজে উঠল।

কি সুন্দর সেই সন্ধ্যাটা—শ্রীমতী গ্রেগার একটা আদ্যি-কালের সুর ধরলেন, সেই সঙ্গে অনেকেই গুনগুন করে উঠল :

In the isle of Capri, I found her.

কৃষ্ণা দৌড়ে গিয়ে মামার ঘর থেকে নিয়ে এল তানপুরা আর করতাল।

কুমার তখন তৎপর হয়ে বললে,—"তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি তবলা।"

মামাবাবু বললেন,—"তবলার দরকার নেই, আমার খঞ্জনীই যথেষ্ট আর আছে পিয়েত্রার ক্যাস্টিলোনো। এখন দেখ দেখি পিয়েত্রা এর সঙ্গে আমাদের খঞ্জনীর মিল আছে কি না।"

ধীরে ধীরে গুনগুন করতে করতে মামাবাবুর গম্ভীর গলায় মীরার ভজন হঠাৎ এক সময় জয়ভেরীর মত বেজে উঠল :

"চাকর রহসু বাগ লাগাসু,
নিত উঠি দরশন পাসু,"

চাকর রব, বাগান সাজাব, নিত্য তোমার দরশন পাব,—তবু এ যেন প্রার্থনা নয়, নিবেদন। অনুনয় নয়, এ যেন অর্ঘ্যদান।

ভজনের পরে কীর্তন ধরলেন মামাবাবু, একেবারে পুরনো কায়দায় থেমে থেমে,—দুই নারীকণ্ঠ মিলিয়ে খঞ্জনীর দ্রুত ঝঙ্কনায় মামাবাবু গাইলেন। ঘরটা যেন রমরম করতে লাগল। কুমার দেখছিল মার্কাস মুগ্ধবিস্ময়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে, ভ্রূ একটু কুঁচকে যেন যাচাই করছে মনে মনে, কিংবা বুঝতে চেষ্টা করছে তাও হতে পারে। কিন্তু কুমারের অবাক হবার পালা এল, যখন দেখল মার্কাসের চোখ বুজে এসেছে, কুঞ্চিত ভ্রূ সোজা হয়ে মিলিয়ে গেছে, যাচাই করার স্পৃহা ডুবে গেছে গীতরস ভোগের আনন্দে—

বল বল বঁধু ভাল ত ছিলে ?

গান শেষ হয়ে গেল, স্তব্ধতা নিবিড় হয়ে আলোকিত ঘরটাকে অন্ধকারের মত ঘিরে ধরল যেন। কিছুক্ষণ পরে মার্কাসই প্রথম কথা কইলে, বললে,—"এ কি গান? এর মানে কি ?"

—"মানে এমন বেশী কিছু নেই।" মামাবাবু বললেন,—"তত্ত্বকথা বেশী কিছু নেই এতে, তথ্য যেটুকু তাও সামান্য। বহুদিন পরে ফিরে এল প্রিয়তম, তাই রাধা বলছেন, এতদিন ভাল ছিলে ত ?"

ছোট্ট একটি প্রশ্ন—কেমন ছিলে? এর অর্থ সুরবাহিত হয়ে বাক্যকে কতদূরে ছাড়িয়ে যায়। মামাবাবুর মত মার্কাসও হয়ত এই কথাই ভাবছিল, সুরের ধুয়া নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মাথার মধ্যে ভ্রমরের মত ঘোরে।

একটু চুপ করে মার্কাস বললে,—"এ গান কি টাগোরের রচনা ?"

—"না না।" মামাবাবু হাসলেন,—"এ বাংলার নিজস্ব সুর—শ'পাঁচেক বছর আগেকার।"

—"বল কি ? অত আগের ?" মার্কাসের গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

—"আচ্ছা টাগোরের গানেও কি বেশীর ভাগ এই ধরনের সুর ? না খানিকটা ইউরোপীয় ধরন মেশানো আছে। উনি ত এই শতাব্দীরই লোক ছিলেন ?"

রমলা বললে,—"এর উত্তরে মামা, আপনাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতেই হবে।"

মামা বললেন,—"না রে, এর উত্তর তোর হাতে। তুই তোর সুরেলা গলায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরে এই কীর্তনের মোহটা আগে ভেঙে দে। তার পরে আমি আবার গাইব এখন। লোকে মনে করে বাংলা ভাষায় গান নেই, গান সব হিন্দী সংস্কৃতির দান। কিন্তু বাংলার বাউল, ভাটিয়ালী সর্বোপরি কীর্তনের আবেদন যত গভীর, সাধারণ মার্গসঙ্গীতে সে গভীরতা আনা যায় না। ও সিলেক্ট লোকের গান, যারা নিজেরা তার মধ্যে ভাল করে প্রবেশ করেছে, তারাই পারে ওর রসভোগ করতে। কিন্তু বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে কাজেকর্মে সর্বত্র গান। রাজদরবারে যদি বা তার স্থান না হয়ে থাকে, মানুষের প্রাণের মন্দিরে তার জন্যেই পাতা ছিল শ্রেষ্ঠ আসন। তার পরে এযুগে দেখ, ভারতের সব সুর সব রাগরাগিনীর ঐক্যধারাকে আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ, আর তা থেকে যে নতুন সুরধারা সৃষ্টি করলেন বাংলা ভাষার মাধ্যমেই হ'ল তার প্রকাশ। এর মূল্য যে সামান্য নয়, ভাবী ভারত তা নিশ্চয়ই একদিন বুঝতে পারবে। ভারতের সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানিস, সে নিজের ধন নিজে দেখতে না পেয়ে গরীব সেজে বসে থাকে। থাক, সেকথা।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মামা তাঁর কথা শেষ করলেন,—"আজ তোর কণ্ঠ থেকেই ঝরুক সেই ঐশ্বর্যের পরিচয়। শোনা একটা গান।"

তানপুরাটা তুলে নিল রমলা, কিন্তু কি গান গাইবে ভাবতে চেষ্টা করল একটু। মামাবাবু সুর করে বললেন,—"বল না—তোমায় গান শোনাব—"

সেদিন রমলা আর একটা কি গান গেয়েছিল মনে নেই, তার পরে মামাবাবু আবার গলা খুললেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা একটা নিবিড় ঘন রসধারায় মন্থর হয়ে উঠল। কুমারের মনে আছে, দেখতে দেখতে মার্কাসের সমস্ত মুখটা যেন টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল, দু'হাত মুঠো করে ও বসেছিল, ওর মধ্যে না-চেনা ইমোশানসগুলির লড়াই লেগেছিল বোধ হয়। পিয়েত্রা বসেছিল নিঃশব্দে গদীতে মাথা রেখে। তার ফ্যাকাসে মুখ আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই সুন্দর সন্ধ্যাটায় বুকের মধ্যেও কোথা থেকে একটা কাঁটা বিঁধে কেবলই খচখচ করতে লাগল— সে ওই টমসন। যত বার ওর দিকে তাকিয়েছে, কুমারের মনে হয়েছে ওর চোখের কোণে আর মুখের রেখায় বিদ্রূপের হাসি। দু' একবার ঈভের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ইশারা করতেও দেখেছে কুমার, এত সূক্ষ্ম অথচ এত গভীর সুরের লীলা বোঝার মত মন ছিল না ওর, তাই কখন যে হঠাৎ পালিয়ে গেল টের পায় নি কুমার, টের পেল যখন দেখল ঈভও চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করে চলে গেল। কুমার ভেবেছিল, টমকে বিদায় দিয়ে ও আবার ফিরে আসবে, কিন্তু এল না, যাবার আগে একবার বলেও গেল না, না বলে-কয়ে ফস্ করে কোথায় উঠে চলে গেল।

কফি আর বিস্কুট খাবার সময় খোঁজ পড়ল ওদের—খোঁজ মিলল না। এসেছিল ঠিকানা দিতে আর নিতে, ওর বাবার ঠিকানাও চেয়েছিল কুমার, কিন্তু কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে। টমসনকে কুমারের ভাল লাগে নি, ওর মত লোকের বন্ধুত্বের দাবি মেনে দীর্ঘদিন ধরে ঈভকে এক জাহাজে থাকতে হবে—এ কথায় মন সায় দিতে চাইছিল না। ঈভকে ওর পর বলে মনে হয় না, ওর মধ্যে ভারি একটা শান্তশ্রী আছে বাঙালী মেয়ের মত। আর সত্যিই ত ও বাঙালী মায়ের মেয়ে বটে। ওকে যেন বিপদ থেকে বাঁচাতে ইচ্ছে হয়।

—"কিন্তু পারবে না বাঁচাতে।" মামাবাবু হেসেছিলেন,—"দেখ নি, ও যে আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে। ও যখন টমের পিছু পিছু উঠে গেল, তখন গাইতে গাইতেই আমি এক নজরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। সে মুখ যদি তখন দেখতে তা হলে বুঝতে কি দুর্নিবার নেশা ওকে এই গানের মায়া থেকে টেনে নিয়ে গেল, একেবারে সেই যাকে বলে— পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু।"

সেদিনকার খুঁটিনাটি সব কথা মনে রাখবার মত নয়,—মনেও নেই তাই।

শুধু মনে আছে, মার্কাস যাবার সময় একবার রমলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার পরে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,—"তোমাদের ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমরা দুজনে আমাকে পূর্ণ করে রেখেছিলে।"

ডারোথি মার্কাসের গাড়ীতে গেল, কিছুদূরে গিয়ে টিউব ধরবে।

ওদের গাড়ীতে তুলে দিতে কুমার যখন গেটের বাইরে এল মার্কাস বললে,—"তোমাকে ধন্যবাদ কুমার, তুমি আমাকে নতুন পৃথিবীর খবর দিয়েছ—

শুনে কুমার অল্প একটু সিনিক্যাল হাসি হেসেছিল,—বলেছিল,—"নতুন বলেই হয় ত এত ভাল লাগছে, দু'দিন গেলেই হয় ত দেখবে এও বাসি হয়ে উঠেছে।"

—"তা হোক।" মার্কাস ওকে শেষ করতে দেয় নি কথা—"ভবিষ্যৎকে আমি ভয় করি না, আমি বর্তমানের পূজারী। কবে চোখ খারাপ হবে বলে আগে থেকে চশমা পরা আমার মত নয়। আমি মুহূর্তের রস পান করব মুহূর্তেরই পাত্রে। পরে যদি পেয়ালাটা ভাঙে ত ভাঙুক না, আমি পরোয়া করি না।"

মার্কাস নিজে গাড়ীতে উঠে ডরোথির জন্যে দরজা খুলে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কুমারের ডান হাত নিজের হাতে নিয়ে, চোখে তারার ঝিকিমিকি চিকচিকিয়ে ডরোথি বললে,—"অনেক ধন্যবাদ মোজার জন্যে।"

কুমার একটু হাসল, এই প্রথম ওর ধরা হাত একটু আদরের ভঙ্গীতে নেড়ে দিয়ে বললে,—"ধন্যবাদ,—দিতে দিয়েছ বলে।"

ডরোথি খুশী হয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। আর সেই মুহূর্তে কুমারের মনে পড়ে গেল মেরীকে।

কবে যেন একথা কে তাকে বলেছিল, তার সেই কথা নিজের অজান্তেই চুরি করে রেখেছিল মন। আজ সন্ধ্যায় অন্য কাকে ফিরিয়ে দিল সেই চোরাই মাল। সে ত বেশী দিন নয়, এই ত গত বছর শীতের আগে, মৌরী নিজের জমানো টাকা থেকে ওর জন্যে মোটা নরম উল কিনে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিল। সেটা গায়ে পরে' ছেলেমানুষের মত খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল কুমার। আয়নার সামনে নানা ভঙ্গীতে ঘুরেফিরে দেখে মৌরীর

দু'হাত ধরে কষে ঝাকানি দিয়ে বলেছিল,—"কি করে ধন্যবাদ জানালে সবট খুশি বোঝান যাবে মৌরী।"

শুনে মৌরী কুমারের ধরা হাতে তার সেই বিশেষ ধরনের চাপ দিয়ে গভীর স্বরে বলেছিল,—"ধন্যবাদ,—দিতে দিয়েছ বলে।"

সেই স্বর, সেই চাওয়া হঠাৎ সেদিন মনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠেছিল। আশ্চর্য, ভালোবাসার আরও কত স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ পরিচয় ত গেছে ভুলে। কিন্তু এই ধরনের ছোট্ট কথা, ছোট্ট ইঙ্গিত, মাঝে মাঝে কোন অমৃত পান করে বিস্মৃতির মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় কে জানে।

রমলারা এসেছে মাসকয়েক হয়ে গেল। স্কুল-কলেজ খুলতে এখনও দিনকতক দেরি আছে। কেম্ব্রিজে যাবার আগে কৃষ্ণা একবার তার বিদ্যেটা প্রাইভেট কোচের কাছে ঝালিয়ে নিচ্ছে। আর রমলাকে কয়েকটা সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক কাগজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মার্কাস। তাদের জন্যে কিছু কিছু কাজও করে দিচ্ছে রমলা। কলেজে ঢোকার আগেই যদি হাতেকলমে বেশ খানিকটা শেখা হয়ে যায় ত মন্দ কি?

কিন্তু এসবে রমলার তত মন নেই যত মন আছে গানে। আসলে ও শিল্পী। ওর ফুলন্ত সুন্দর মোটা থেকে সরু হয়ে এসে মাথার কাছে গোল হয়ে ফুলেওঠা আঙুলগুলি সেতারের ঝঙ্কারের জন্যেই তৈরি।

—"গানই তোর লাইন।" কুমার একদিন বলেছিল,—"তুই যদি 'মিউজিকের' একটা কোর্স নিয়ে যেতিস তবে তুই পড়তে পেতিস না। জার্নালিজম শিখে হবে কি? ভেবেছিস 'বাজার' পত্রিকাগুলিতে ঢুকবি,—অসম্ভব, সে আশা ছুঁড়ে ফেলে দে।"

—"আহা! আনন্দবাজার আর অমৃতবাজার ছাড়া কি আর কাগজ নেই দেশে, কি করে জানলে যে আমি—"

কথা শেষ না করেই রাগ করে উঠে দাঁড়াল রমলা।

—"রাগিস নে রে রাগিস নে, আনন্দবাজারে তুই তো রয়েইছিস, আর অমৃতবাজার তোর মনে।" কথার 'পান্' দিয়ে কথা ঘোরাতে চাইলেন মামাবাবু।

—"মামা, তুমি ত জান, কেন আমি 'জার্নালিজম' পড়তে এসেছি!"

রমলার গলার স্বরটা হঠাৎ কেঁপে গেল। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল কুমার, অনেকদিন পরে রমলার সেই পরিচিত অভিমানের আভাস শঙ্কিত করে তুলল কুমারকে।

রমলা বললে,—"তোমরা ভাবছ আমি শখ করে বিলেতে বেড়াতে এসেছি। তোমরা ভুলে গেছ, আমাকে কাজ করে খেতে হবে, চিরজীবনের পথ করে নিতে হবে—"

অবাক হয়ে গেল কুমার,—"এত কথা আসছে কিসে, ওসব কথা আমি ভাববই বা কেন শুধু শুধু।"

—"জানি, জানি।" রমলা ওকে কথা শেষ করতে দিল না,—"তোমরা সবাই ভাব আমি খেয়ালি। খেয়ালের ঝোঁকেই—"

কথা শেষ না করেই নাকের পাটা লাল করে অন্য ঘরে চলে গেল রমলা।

—"এ কি অন্যায় বল ত মামা?" উঠে দাঁড়াল কুমার,—"ও কি চিরকাল এই রকম অকারণ তম্বি করেই চালিয়ে যাবে? তোমরা ছোট থেকে আদর দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ।"

মামা বললেন,—"ওর কথায় দুঃখ পাসনে কুমার, আমাদের উপরেই ও অভিমান দেখায় বটে, আসল অভিমান ওর সেই ভগা মাস্টারের উপরে, যে ওকে বার বার এক পথ থেকে আরেক পথে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। মনে আছে—" মামার চোখে অতীতের স্বপ্ন ভেসে উঠল,—"ছোটবেলায় যে ওকে একবার দেখত আর ভুলত না। ওর মধ্যে দুরন্ত প্রাণোচ্ছাস সর্বদা টলমল করত। সবাই বলত বিধাতার এ কি ভুল? এই দীপ্ত প্রাণাবেগকে নারীদেহের পাত্রে ভরে দিলেন কেন। জন্মের আগেই ওর সম্বন্ধে বিধাতার সেই প্রথম ভুল। তোকে আর লতুকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত, মনে নেই? তার কিছুটা আভাস পার্থের মধ্যে আছে।"

—"না।" কুমার বললে,—"পার্থ মোটেই ও রকম নয়।"

—"নয়? বলিস কি রে? মনে নেই 'ওদের ড্রাইভার'কে রোজ কি রকম ঘোড়দৌড় করাত? একবার ওদের বাড়ীর কোন এক বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে ঘরমোছা বালতির ভিতরে বসিয়ে দিয়েছিল।"

—"ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ।" কুমার হেসে উঠল,—"মনে আছে, বড্ড দুষ্ট ছিল।

একবার টীয়াদির ছোট্ট ছেলেটাকে ধরে ওর বাবার ক্ষুর দিয়ে কি রকম দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল মনে আছে। কিন্তু এবারে ওকে একেবারে অন্য রকম দেখছি। ও যেন হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।"

—"সত্যিই, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে রে, হঠাৎ এক দিনেই যেন ওর বয়স বেড়ে গিয়েছিল। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর দিন। কে ভেবেছিল সুশান্তর মত অমন সুস্থ-সবল লোক তিন দিনের সাধারণ একটু জ্বরে একেবারে মারা যেতে পারে, অত সবল শরীরে এত দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র! সত্যি, অমন সব ভয়ঙ্কর দিন যে মানুষের জীবনে আসতে পারে তাই বা কে জানত? তুই ত ছিলি না।"

—"মামা, দূরে থাকা যে কাছে থাকার চেয়ে আরও কত ভয়ানক সে তুমি জান না। মায়ের চিঠিতে যখন সব খবর পেলাম, তখন সুশান্তর মৃত্যুর সাত দিন পেরিয়ে গেছে—"

—"হ্যাঁ, অনেকে বলেছিল তোকে টেলিগ্রাম করতে, আমি বারণ করেছিলাম। খারাপ খবর যত দেরিতে জানা যায় ততই ভাল।"

—"সেদিন কলেজে বাড়তি ক্লাস ছিল না, সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরে পেলাম ঐ চিঠি। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। কি অদ্ভুত! মামা, আমার বিশ্বাস মনটা শরীরেরই 'প্রোডাক্ট'!—কিম্বা কি জানি, শরীরটাই মনের। নইলে মনের কষ্টে শরীরে অমন কষ্ট হবে কেন?"

মামা বললেন,—"আহা রে, একা একা এসব খবরের ভার বহন করা বড় কঠিন।"

মেরীর কথা মনে পড়ল কুমারের। যদিও মেরীর সঙ্গে আলাপ তখনো বন্ধুত্বে পৌঁছয়নি। তখনো মেরী তার বাড়ীওয়ালীর মতই একজন আলাপী মাত্র ছিল। কিন্তু সেই আলাপটুকুতেও সেদিন কুমারকে যে স্নেহ যে যত্ন দেখিয়েছিল তাতে কুমারের আহত মন অনেক শান্তি পেয়েছিল সন্দেহ নেই। নিজে বেশী আসত না, টোনিকে পাঠিয়ে দিত। সেই শিশুর সাহচর্যই ওর শুশ্রূষা ছিল। মেরীর কথা মনে পড়ে অনেকদিন পরে মন কেমন করে উঠল কুমারের। নিজের পরমাত্মীয়ের কাছে আজও তার কোন পরিচয় দেয় নি, এ কি অকৃতজ্ঞতা নয়?

কুমার বললে,—"মামা, সেই দুর্দিনে একটি মেয়ে অন্তরের বেদনা দিয়ে

আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিল। তার ছোঁয়ায় আমার মন জেগে উঠেছিল। একদিন তার গল্প তোমাদের কাছে করব। নইলে অকৃতজ্ঞ নাম রটবে বিধাতার দরবারে।"

মামা বললেন,—"কে সেই মেয়ে? কোথায় আছে? এতদিন কেন আনিস নি তাকে?"

—"তারও মধ্যে রমলার ভাবটাই প্রধান। অভিমানে বোধ হয় সব মেয়েই সমান। সেও অভিমান করেই চলে গেছে আজ মাসচারেক হ'ল। এখনও তার খোঁজ পাই নি, হয়ত আর কোনদিন পাব না। যেমন হঠাৎ ওর আবির্ভাব হয়েছিল জীবনে, তেমনি হঠাৎ হয় ত গেল মিলিয়ে। কিন্তু এই এক বছরে ও আমাকে যা দিয়ে গেছে তার মূল্য কোনদিন কমবে না।"

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই কৃষ্ণা এসে দাঁড়াল। বলল,—"এ কি দাদু, তোমাদের দেখছি আজ আর নড়বার নাম নেই, ব্যাপার কি? মামী রান্নাঘরের জানালা দিয়ে কি একটা 'স্কেচ' করতে বসে গেছেন এমন গম্ভীর মুখে, যে, কথা বলতে সাহস হ'ল না।"

মামা বললেন,—"রমলা তা হলে রেগে-মেগে স্কেচ করতে বসেছে গিয়ে শেষে!"

কুমার বললে,—"কিন্তু রান্নাঘরের পিছন দিকটা কি খুব 'আর্টিস্টিক'?"

কৃষ্ণা বললে,—"নিশ্চয়ই, আজকের দিনে শিল্প ত কুরূপের মধ্যেই সুন্দরকে খুঁজে বের করতে চায়, সেই ত তার অ্যাম্বিসন। তা যাকগে যাক, তুমি তা হলে এখন আর উঠবে বলে মনে হচ্ছে না, কেমন ত দাদু?"

—"কেন বল ত?" মামা বললেন,—"আমাকে ওঠাতে তুমি এত ব্যস্ত কেন কৃষ্ণারাণী?"

—"বাঃ, ভাবছিলাম আমাকে 'এসকর্ট' করবার মহৎ ভারটা আজ তোমাকেই দেব।"

—"ছিঃ ছিঃ কৃষ্ণা।" মামাবাবু হেসে উঠলেন—"বিলেতে এসে লোকে প্রথমেই রাস্তা চিনতে শিখে নেয়, আর আজ তিন মাস ধরে কৃষ্ণারাণী—"

—"বাঃ, তুমি বুঝি তাই ভাবছ?" অপ্রস্তুত হাসিটা কৃষ্ণা কথার সঙ্গে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেয়,—তুমি বুঝি ভাবছ, একা গেলে আমি পথভুলে মরব, তা নয়, এই একটু গল্প করতে করতে যাওয়া, তোমার একটুখানি সঙ্গসুখ।"

—"বেশ ত কৃষ্ণা," কুমার বললে,—"আজ না হয় দাদুর বদলে আমাকেই সে সুখটা দিলে। আমাকে সত্যি এখনই বেরুতে হবে, তোমার শিল্পিকার ক্লাসও ঐ পাড়ায়। কাজেই চল একটু আগে রওনা হয়ে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই।"

মামা হাসলেন,—"আরে ছিঃ ছিঃ কৃষ্ণারাণী, একটু যদি নজর করে চলে রাস্তাঘাটগুলো চিনে ফেলতে তা হলে আর এই ফাজিলটার কাছে মান খোয়াতে হ'ত না।—অনায়াসে ঘাড় বাঁকিয়ে রাঙা ঠোঁট গোল করে বলতে পারতে—ধন্যবাদ মহাশয়, আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারি।"

কৃষ্ণা তার ঢাকাই শাড়িঢাকা জঙ্ঘাযুগল ঈষৎ নত করে বিলিতী কায়দায় 'কার্টসি' অর্থাৎ ভদ্রতা জানাল—"ধন্যবাদ মহাশয়, সত্যিই আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারি, কিন্তু যেন পারি না—এমন ভাব দেখাই। সে কেবল তোমাদের খুশি করবার জন্যে। আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, আমার উপরে সর্দারি করতে তোমরা সকলেই বেশ ভালবাস। 'প্রোটেক্টার' সাজার এমন জায়গা আর পাবে না। আমি যে কিছুই পারি না, নেহাত ছেলেমানুষ একথা ভাবতে ভাল লাগে তোমাদের। তাই তোমাদের সেই অহঙ্কারকে খাদ্য জুগিয়ে একটু আনন্দদান করে থাকি। তা বলে ভেব না সত্যি তাই। দেখ না, আজ সব কাজ সেরে আসব, হারাব না।"

কুমার চেঁচিয়ে বললে,—"মামার কথা শুনো না কৃষ্ণা, আমার ওদিকে কাজ আছে, যেতেই হবে তোমার সঙ্গে।" ভিতর থেকে জবাব এল না।

মামা হেসে বললেন,—"এদেশের হাওয়ায় জাদু আছে। কেমন করে কথা কইল দেখলি। দু'মাসে অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে ও।"

—"তা হোক।" কুমার রাগ করলে,—"কিন্তু আপনি ওকে ক্ষেপালেন কেন মিছিমিছি, এখন আর কিছুতেই যেতে চাইবে না হয় ত। অথচ একা একা এখানে-ওখানে ঘুরে মরবে।"

—"আমি ইচ্ছে করেই ওকে ক্ষেপিয়েছি।" মামা হাসলেন,—"রাস্তাঘাট একটু-আধটু চিনতে শেখা ওর সত্যি দরকার। তোমার কাছে যা সব শুনলাম তাতে ত মনে হচ্ছে যে চিরজীবনের মত ওকে পথ দেখাবার দায়িত্ব নিতে তুমি হয় ত রাজী হবে না। তা হলে কেন আর মিছিমিছি?"

—"সে কি মামা?" কুমার বাধা দেয়,—"দু'একবার পথের সঙ্গী হলেই যে, চিরজীবনের মত সে ভার নিতে হবে, তার কি মানে আছে?"

—"হ্যাঁ ভাই, আমাদের দেশে চিরকাল আমরা ঐ রকম মানেই করে এসেছি। সেই জন্যেই এবার থেকে দেখতে হবে যাতে ও তোর ওপরে নির্ভর করতে না শিখে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে শেখে। আর তা ছাড়া আজকালকার যা ব্যাপার-স্যাপার পুরুষ জাতটার উপর নির্ভর না করাই ভাল, মেয়েরা যে একালে স্বাবলম্বিনী হচ্ছেন এতে করে—"

—"পুরুষেরা যে খুব জব্দ হবেন এমন কথা মনেও করো না মামা।" কুমার পাদপূরণ করে,—"দেখো পুরুষেরা তখন খুব চটপট নিরাবলম্ব হয়ে পড়বে। কারণ, আমার মনে হয়, আশ্রয় পেলে সেটা নির্বিবাদে গ্রহণ করা মনুষ্যস্বভাবের অন্তর্গত। ওর মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। শুনেছি বর্মায় স্ত্রীরাই স্বামীদের পোষে। এদেশেও দেখছি ছেলেরা তাদের প্রিয়াদের জন্যে যত খরচ করে মেয়েরা তাদের প্রিয়দের জন্যে তার চেয়ে কিছু কম খরচ করে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে স্বাবলম্বন যে পক্ষেই হোক সমাজের ভারসাম্য ঠিকই থাকে। এ পক্ষের লাভ ও পক্ষের ঘাটতি থেকে পুষিয়ে যায়।"

—"মানলাম না হয় তোর কথা, তা সত্ত্বেও মেয়েদের স্বাবলম্বন শিক্ষাই দেওয়া উচিত। তাতে করে আর অত সহজে ওদের ভোলান চলবে না।"

—"মামা, এ ব্যাপারে চিরকাল স্ত্রীপুরুষ উভয়পক্ষই পুরুষদের গালাগাল দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ সাম্যের যুগে কথাটাকে একটু অন্য দিক দিয়ে দেখবার সময় এসেছে। আচ্ছা, সত্যি করে বল ত, মেয়েরা যে প্রবঞ্চিত হয় সে কি শুধু পুরুষের জন্যে? মেয়েদের শত রকমের সহস্র লোভও কি তার জন্যে দায়ী নয়?

"—বেশ মানলাম।" মামাবাবু ঘাড় নাড়লেন,—"তা হলে লোভ জাগাবার প্রয়োজনই বা কি? তাই ত আরও বলছি, কৃষ্ণায় মনের সামনে তুমি লোভের বাতি জ্বালাতে এস না। ও ছেলেমানুষ, যদি সে আলো দেখে ভুলে মরে? তুমি ত আর ওকে সব দিতে পারবে না? যেটুকু শুনলাম তাতে ত মনে হ'ল সে সবের অনেকখানিই অন্যের দখলে, কাজেই ও একটু-আধটুর জন্যে আর কি হবে।"

—"বল কি মামা, সব দিতে পারব না বলে যেটুকু পারব, সেটুকু দিতেও কেন কুণ্ঠিত হয়ে হাত গুটিয়ে নেব ?"

—"হ্যাঁরে, সেই ভাল, আমাদের দেশের মেয়েরা যে একেবারে সবটাই চায়। ওসব আধাআধি বখরায় তাঁদের বিশ্বাস নেই।"

সুর করে মামা বললেন,—"আমার ষোল আনা দাম চাই, আমি আট আনা নিই না, আমায় দশে-ছয়ে যোগ করে ষোল আনা দিয়ে যাও।"

—"বুঝলাম না।" একটু চুপ করে থেকে কুমার বলে,—ষোল আনার মূল্য আমি অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু একথাও জানি যে, জীবনে দু'পয়সার দামও তুচ্ছ নয়। ষোল আনা খরচ করতে পারবে না বলে দু'পয়সার ভোগটুকু থেকেও নিজেকে বঞ্চিত রাখবে, এত বোকা নয় এ যুগ।"

ততক্ষণে একটা কাজকরা খদ্দরের থলি কাঁধে ঝুলিয়ে সরু কোমরে কাশ্মীরি সিল্কের আঁচল গুঁজে কালো চুলের লম্বা বিনুনীর নিচে রেশমের থোপনা দুলিয়ে ছাঁচিপানের মত ফ্যাকাসে শ্যামল সুডৌল মুখের ভাসা-ভাসা দুই কালো চোখে কিছু বেদনা, কিছু অভিমান আর কিছু অকথিত ভালবাসা ভয়ে নিয়ে, বাঁ হাতে কোট আর ডান হাতের ছোট থলিতে একটু পাউডার, একটু গর্ব আর কিছু বিলিতী পয়সা নিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে,—"দেখ দাদু, কত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছি। এইবারে সব কাজ সেরে আসব, তখন বলবে, হ্যাঁ করিৎকর্মা মেয়ে বটে!"

একটা দেখান হাসি দিয়ে হঠাৎ নিভে-যাওয়া মনের যে ঈষৎ ছায়াটা মুখের উপরে পড়েছিল সেটা ঢেকে দিল। তার পরে দরজা খুলে যেই বেরুতে যাবে লাফিয়ে উঠল কুমার,—"এক মিনিট কৃষ্ণা, 'প্লীজ' একটু দাঁড়াও, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে আসছি, মামার কথা শুনো না।"

—"কিচ্ছু দরকার নেই।" কৃষ্ণা বললে,—"কেন মিথ্যে কষ্ট করবেন ?"

—"কষ্ট আবার কি, আমাকেও ওদিকেই যেতে হবে। বেশত একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। একা একা খবরের কাগজ মুখে করে ঘোরাঘুরি করাটা যদিও আজকাল আমার বেশ ধাতস্থ হয়ে এসেছে কিন্তু তেমন মনস্থ হয় নি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।" ও বড় বড় পা ফেলে এক নিমেষে ভিতরে চলে গেল।

কৃষ্ণা লক্ষ্য করল ও প্রায় ছুটে গেল, কিন্তু আওয়াজ হ'ল না। ছোট-

বেলায় মামীর সঙ্গে যখন মাঝে মাঝে তার বাপের বাড়ী যেত, দেখত, বারান্দা থেকে ঘরে আসতে ওর হাত-পায়ের ধাক্কায় ছোটখাটো টেবিল-চেয়ারগুলি প্রায় টলমল করে উঠত। আজ সেই মানুষের ছুটতে পায়ে শব্দ হয় না। বড় বেশী যেন. সাহেব সাহেব ভাব—ভাবল কৃষ্ণা। মুখ তুলে দেখল, মামাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে আছেন আর নিঃশব্দ হাসিতে তার চোখ চিকচিক করছে,—"হাসছেন যে ?" কৃষ্ণা একটু রাগ দেখায়।

—"কেন ভাই, হাসব না এমন কোন কড়ার তোমার কাছে কোনদিন করেছি বলে ত মনে পড়ে না।"

—"বারে, কড়ার না করলেই কি শুধু শুধু হাসতে হবে ?"

—"হয়ত শুধু শুধু নয়, হয় ত কোন কারণ আছে।"

—"কি শুনি ?

মামা মৃদু গলায় সুর করে বললেন,—"রেখে দে সখি রেখে দে,—মিছে কথা ভালবাসা, পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রু সাগরে ভাসা—রেখে দে সখি, রেখে দে—"

কাঁধের উপরে কোট ফেলে ট্রাউজারটা একটু টেনেটুনে ঠিক করতে করতে কুমার এল,—"ব্যাপার কি মামা ? আবার গান জুড়েছ ?"

—"গান ঠিক নয় রে। ওটা হ'ল ভূমিকা—আসল কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, তুই এসে পড়লি একেবারে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত।"

—"আসল কথাটা কি শুনি ? হলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে 'টাই'টা ঠিক করতে করতে কুমার বললে।

—"আসল কথা মনে পড়েছিল তোর দু'পয়সার লজেন্স খাবার ইচ্ছে শুনে, তাই কৃষ্ণাকে বলতে যাচ্ছিলাম। এ যা দেশ, এখানে যেন খুব করে হিসেব কষে থাকে, কিছুতে যেন দাম না কমায়। দু'পয়সার লোভে যেন ফস্ করে কোন দিন ওর ষোল আনাটি খুইয়ে না বসে।"

—"তাতেই বা ক্ষতি কি ?" মামার মুখের দিকে চেয়ে কুমার এক রকম করে হাসল। অমন বিচিত্র হাসি এর আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ল না কৃষ্ণার।

কুমার বললে,—"অত হিসেব কষে কত জমিয়েছ মামা জীবনভোর ? ষোল আনা খসাবার ভয়ে ষোল আনাই যে তাকে তুলে রেখেছ ? শেষে

যদি কোনদিন তল্লাস করতে যাও, দেখবে ও ষোল আনাই বরবাদ হয়ে গেছে। রাজামার্কা গোটা টাকাটাই এ যুগে অচল। লেনদেন কর, তবে না কারবার জমে উঠবে?"

—"রক্ষে কর ভাই, এ বয়সে আর নতুন করে কারবার ফাঁদতে মন নেই। আমার ঐ অচল টাকাই ভাল।"

—"বেশ, মানলাম তাই, কিন্তু তোমার মত কেন আমাদের উপর চাপাতে চাইছ?"

—"কৃষ্ণাকে বলেছি, তোকে নয়।"

—"কৃষ্ণাকেই বা কেন বলবে? ওর এই জীবন-প্রভাতে ও বুঝি শুধু হিসেব কষেই দিন কাটাবে? ঘরের সব কয়টা দরজা খুলে দিয়ে উধাও হাওয়ায় উড়ে যেতে পারবে না।"

—"রক্ষে করুন।" কৃষ্ণা হাসল,—"আমার ডানা নেই, চলতেই পারি না ভাল করে, তায় উড়ব! দাদু নিশ্চিন্ত থাক। যদিও তোমাদের কারু কথাই ভাল বুঝলাম না, তবু যদি কোনদিন তোমার কথামত কোন টাকা-কড়ির সন্ধান পাই ত নিশ্চয় ফস্ করে বেহিসেবী খরচ করে বসব না, কিন্তু আজ আর সময় নেই। দাদু, তোমরা তর্ক কর—টাকা জমানোর চেয়ে তর্ক জমানো ভাল। আমি যাই।"

দরজা খুলে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা, পিছনে পিছনে কুমার এসে দাঁড়াল, বলল,—"রাগ করেছ?"

—"না ত।" ঘাড় বাঁকিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাল কৃষ্ণা,—"রাগ করব কেন শুধু শুধু?" নারীত্বের অভিমান ওকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে সন্দেহ নেই। পাশের লোকে দেখে তাকে চিনতে পারে, কিন্তু ওর নিজের কাছে তার রূপটি তেমন স্পষ্ট নেই। যদিও ওর বয়স প্রায় উনিশ, তবু এখনও ওর মধ্যে সেই চিরকিশোরীর বাস, যে এখনও বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করেনি, যে এখনো বাস করছে সেই প্রয়াগের ধারে—যেখানে শৈশব ও যৌবনের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম চলছে। তাই বললে, রাগ করব কেন? কিন্তু রাগ ও সত্যিই করেছিল হয় ত। ওর স্নিগ্ধ সরল টানা-টানা চোখের ভিতর থেকে মৃদু অভিমান ওর প্রতিমার মত মুখের উপরে অল্প একটু ছায়া ফেলেছিল। সেদিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে গেল কুমার। এই প্রথম যেন ভাল করে তাকিয়ে

দেখল ওর দিকে—এ যেন সেই রূপকথার স্বপ্নপুরীর দেশের মেয়ে। কিন্তু ও যত মৃদু, যত মধুরই হোক, লণ্ডনের এই দ্রুতধাবমান কর্মব্যস্ত রাজপথে একটু যেন বেমানান। যে রকম আস্তে হাঁটছে তাতে আর ঐ বাসটা ধরার আশা নেই। তার চেয়ে টিউবে যাওয়াই ভাল। ট্রেনের বিদ্যুৎগতি ধীর চলনের ব্যালান্স করবে খানিকটা। এদেশে আর একটু চন্‌মনে চট্‌পটে না হলে কোন মেয়েরই চলে না। তাই কুমার ভাবল, ওকে পথচলা সম্বন্ধে একটু লেকচার দিলে কেমন হয়! ঠিক লেকচার নয়, মৃদু একটু উপদেশ।

কুমার বললে,—"তোমাকে একটু পরামর্শ দিতে পারি কৃষ্ণা?"

চমকে ফিরে কৃষ্ণা বললে,—"কি?"

কুমার বললে,—কৃষ্ণা তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি বাংলাদেশের পটুয়াদের আঁকা পট থেকে উঠে এসেছ। আর জান, মার্কাস বলে তুমি নাকি মূর্তিমতী ভারতবর্ষ, আর পিয়েত্রো বলে, তুমি রূপকথার স্বপ্ন।"

একটু অবাক আর একটু লাল হয়ে কৃষ্ণা বলল,—"তারপর?"

কুমার হাসল,—"তার পরে আবার যেন রেগো না,—পিয়েত্রোর সঙ্গে যদিও আমি একমত, তবু তোমাকে বলতে চাই এই যথেষ্ট নয়। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে উঠে আসতে হবে, ভারতকে পিছনে বেঁধে বেড়ালেই চলবে না, ইংলণ্ডে এসেছ, সেকথাও মনে রাখতে হবে।"

—"অর্থাৎ?" কৃষ্ণা বললে,—"রূপকথা থেকে নিজেকে 'থ্রিলার' বানাতে হবে?"

কৃষ্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে কুমার হাসল,—"কে বলে কৃষ্ণা তুমি কথা জান না?"

কৃষ্ণাও হাসল,—"সবাই বলে এবং কথাটা সত্যি। হঠাৎ এই কিছুদিন হ'ল দেখছি কথা আপনি আমার মুখে এসে জুটছে ঠিক সময়ে, আমাকে তার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে না।"

—"ব্রাভো।" কুমার উৎসাহ দেখাল—"বাঙালীরা জাতকবি, অনেক শতাব্দী ধরে কথা মুখস্থ করে এসেছে। কথা আমাদের শেখাই আছে। কিন্তু,—"

—"কিন্তু কি?" কৃষ্ণা বড় চোখ স্থির করে কুমারের মুখের দিকে তাকাল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কুমারের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা বলল,—"বলুন।"

—"না।" অল্প হেসে চোখ নামাল কুমার।

—"কেন?" কৃষ্ণার চোখে হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এল একটুকরো আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ঘাড় বাঁকিয়ে দৃপ্তরাণীর মত বললে,—"কেন?"

—"এমনিই।" কুমার হাসল,—"সত্যি, বলতে ভয় পাচ্ছি কৃষ্ণা।"

—"ভয়? কাকে?"

—"কেন তোমাকে?"

এইবারে হেসে উঠল কৃষ্ণা, স্বচ্ছ সরল হাসি। ওকে যে কেউ ভয় করে, এই খবরে খুশির হাসি,—"কি যে বলেন।" কৃষ্ণা হাসল,—"আমাকে আবার কেউ ভয় করে নাকি?"

—"আমি করি।"

—"সত্যি?" আর একবার জলতরঙ্গ-হাসি ঝরিয়ে কৃষ্ণা বললে,—"অভয় দিলাম। বলুন আর কি শিখতে হবে?"

—"তা হলে নির্ভয়ে বলি।" ছোঁয়াচে হাসি কুমারের মুখেও জলে উঠল,—"কথা শেষ হয়ে গেছে কৃষ্ণা, এবারে শিখতে হবে চলা।"

—"চলা?"

—"হাঁ চলা।" কুমার বললে,—"তোমাদের গজেন্দ্রগামিনীর চাল এদেশে চলবে না, কৃষ্ণা তোমাকে হনহন করে হাঁটতে শিখতে হবে, আরও অনেক 'স্মার্টলি'।"

—"আর কত শিখব?" হঠাৎ একটা অবোধ্য অপমানের গ্লানি ওর শরীরে অবসাদের মত নেমে এল। অবাধ্য ক্লান্তি ওর কণ্ঠ থেকে বললে,—"আমি যা, আমি তাই। তার চেয়ে বেশি হতে চাই না।"

ও তেমনি চটি ঘষে ঘষেই চলল। চলার ভঙ্গি বদলাল না একটুও।

গলায় সত্যি সত্যি দুঃখ ফুটিয়ে ইংরেজী করে কুমার বললে,—"দুঃখিত কৃষ্ণা, আমি ঠিক ও ভাবে বলি নি, ভুল বুঝো না 'প্লীজ'। আমি শুধু বলছিলাম, ওই চটি ঘষে ঘষে চলার আওয়াজটা অত্যন্ত 'ডিপ্রেসিং' অর্থাৎ অবসাদজনক। তুমি যে আসছ ওই শব্দে তার প্রমাণ নেই। একঘেয়ে একটানা ক্লান্ত আওয়াজ। আবির্ভাবের আগমনীর সুর নেই ওতে।"

—"আপনি দেখছি ভীষণ রকম কবি,—" হেসে ফেলল কৃষ্ণা, ছোট্ট

একটুকরো মুগ্ধ-সরল হাসি,—"আচ্ছা বেশ, কেমন করে হাঁটব তবে শুনি ? দেখিয়ে দিন।" ও চট করে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে কুমারের পদক্ষেপের দিকে তাকাল।

—"এ কি, দাঁড়লে কেন ?" কুমার চট করে পাশে এসে ওর হাত ধরল,—"চল। আবার দেখবে কি ? চলতে চলতেই চল। শিখতে হয়—সাঁতারের মত। তুমি আমার সঙ্গে একসঙ্গে পা ফেলে চল, যেমন এরা যায়। দেখবে কিছু এমন শক্ত নয়।"

—"শক্ত আবার কি—বাঃ ?" দম্ভভরে এগিয়ে চলল কৃষ্ণা আর ভাবল, হাতটা এবারে ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। ভাবতে ভাবতে যেটুকু দেরি হয়ে গেল তার মধ্যেই কৃষ্ণার হাতটা কুমারের হাতের মধ্যে ভারি একটা নরম নরম খুশিতে মেতে উঠেছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে কুমারের উপরে বিরক্ত হতে চাইল কৃষ্ণা। কুমার কেন ওকে অন্যরকম হতে বলবে ? কেন ও যেমন আছে তেমনই ওকে ভালবাসবে না ? আয়নায় দেখা নিজের চেহারাটা মনে পড়ল কৃষ্ণার। রঙটা ফরসা না হলেও নিজেকে দেখতে ত ভালই লাগে কৃষ্ণার। আর এই মামা-দাদু ত ওকে দেখলেই গান ধরেন :

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।'

ও যেমন তাই কেন কুমারের মনের মত নয়। কেন ওকে আবার মনের মত অন্যরকম করে গড়ে নিতে চায় ও ? কিন্তু সত্যি কি কৃষ্ণা পারবে কোনদিন কুমারের পছন্দমত করে নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে, ওর ওই শীলা, ক্লারা, ডরোথির মত ? না, কৃষ্ণা কিছুতেই ও রকম হতে পারবে না। এই ত অন্যমনস্ক পা এখনই আবার ঘষে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আবার স্খলিত পদক্ষেপ সংশোধন করে নিজেকে ধিক্কার দিল কৃষ্ণা। ছিঃ ছিঃ. কেন এল এর সঙ্গে,—না এলেই হ'ত, দাদু ত বারণ করেই ছিলেন, নানারকম ভাবে। কেন ও শুনল না,—তাই এই লজ্জা পেতে হ'ল, ও যেন কিছুই পারে না, এমনকি একটু ভাল করে 'স্মার্টলি' হাটতেও। মনে মনে ক্ষুণ্ণ অভিমানে পীড়িত হলেও কৃষ্ণার মুখে তার সেই স্নিগ্ধ-শান্তিটি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি। সে দৃঢ়পদক্ষেপে বিলিতী মেয়ের সমতালে চলতে লাগল।

—'ব্রাভো।' বাহবা দিয়ে হাসল কুমার। এ যে একেবারে রীতিমত 'প্যারেড' চলেছে আমাদের—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত।"

—"হঠাৎ ক্লাস 'টু'-এর ছাত্রের মত এক দুই গুনতে শুরু করেছেন যে?"

হাসি দিয়ে মনের ক্ষোভ ঢাকতে চাইল কৃষ্ণা। কুমারের ইচ্ছে হ'ল, বলে, টয়েন চলেছি তাই 'টু'-এর কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সামলে গেল—বলল না। মামাবাবুর শাসন মনে পড়ল—একতিল বাড়াবাড়ি চলবে না। এ মেয়ে যা বোকা, মামাবাবু যার নামকরণ করেন সরল,—ঠাট্টা রসিকতা হয়ত বুঝবেই না, সত্যি ভেবে বসে থাকবে। তাই কুমার একটু হাসল। বলল,—"হঠাৎ ছেলেমানুষ হতে ইচ্ছে হ'ল, ছেলেমানুষের সঙ্গে চলেছি বলে বোধ হয়। শিশুসঙ্গের দ্বারা শৈশবকে ফিরে পাচ্ছি।"

ঘাড় বাঁকিয়ে কৃষ্ণা বললে,—"ঈস্।" আর ওর অজ্ঞাতে একটা শাণিত কটাক্ষ ওর চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হ'ল। ও বললে,—"মনে হচ্ছে একথায় রীতিমত অপমান বোধ করা উচিত। আমি মোটেই শিশু নই।"

—"কেন কৃষ্ণা, শিশু হওয়া কি অন্যায়? শুনেছি এদেশের গুরু বলেছিলেন, শিশুরাই ধন্য। কারণ তারা স্বর্গের অধিকারী?"

কৃষ্ণা বললে,—"সংস্কৃতে স্বর্গ মানে সুখ।"

—"হ্যাঁ সুখই ত।" কুমার বললে,—"সরলতার সুখ, বাঁকাপথ থেকে মুক্তির সুখ। সেই সুখস্বর্গ প্রতি মানুষকেই একদিন পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু তা বড় ক্ষণিক, ঊষা ফুটে প্রভাত হতে না হতেই মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। তবু যে মানুষ আপন স্বভাবে যৌবনেও শৈশবকে চিরসঙ্গী করে রাখতে পারে সে নিশ্চয়ই ধন্য। তার মহিমাকে স্বীকার করা যে তাকে অপমান করা, এমন কথা তুমি ভাবলে কি করে কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা মুখ তুলে চাইল, এতক্ষণের অভিমান সব গলে গিয়ে ওর বিশাল চোখে নবীন প্রেম কথা কয়ে উঠল। চটুল সুরে কৃষ্ণা বললে,—"আপনি ভারি চালাক ত, গালাগালিকে ফস্ করে খোসামদে রূপান্তরিত করতে পারেন। সত্যি আপনিই ধন্য।"

কুমার বুঝেছিল হঠাৎ শিক্ষা দিতে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। তাই ভাবলে একটু স্তবগান দিয়ে নতুন পরিচয়ের ভারসাম্যটা আবার ফিরিয়ে আনবে। তাই বললে,—সত্যি আমিই ধন্য, তোমার সঙ্গে আসতে পেলাম বলে আর তোমাকেও ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আসতে রাজী হলে বলে।

পথ ত কেমন ভাব হয়ে গেল। একসঙ্গে না চললে কখনও বন্ধুত্ব হয়? পথচলাতেই বন্ধুত্বের শুরু।"

কৃষ্ণার মনের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ দুলে দুলে উঠল। কি এক আশ্চর্য ভাবে ওর গলা বুঁজে এল। কুমারের এই নেহাত সাধারণ কথাগুলি অসামান্য হয়ে ওর কানের কাছে গানের মত বাজতে লাগল। কষ্টে নিজেকে সামলে কৃষ্ণা হালকা সুর আনল গলায়। বললে,—"তোমাকেও ধন্যবাদ। কেমন পথচলার ট্রেনিং পেয়ে গেলাম।"

হাঃ হাঃ করে কুমার হেসে উঠল,—"তুমি শিখলে চলা, আমি পেলাম বন্ধুত্ব,—সমানে সমান। এখন চল—খট্‌খট্ খট্‌খট্। কুমার আবার বললে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—"

সেই মুহূর্তে কৃষ্ণার সেই গম্ভীর সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ে গেল—সেই সপ্তপদীর মন্ত্র। বিয়ের সব মন্ত্রের চেয়ে এইটে কৃষ্ণার বেশী ভাল লাগে।

সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ম্।

তুমি সপ্তপদ গমন করিয়া আমার সখা হও। আমি যেন তোমার সখ্য লাভ করতে পারি।

সখ্যাৎ তে মা যোষং সখ্যান্ মে মা যোষ্ঠাঃ।

আমি যেন তোমার সখ্য হতে বিযুক্ত না হই। তুমিও যেন আমার সখ্য হতে বিযুক্ত না হও।

মনে মনে শ্লোকটা আর একবার উচ্চারণ করলে কৃষ্ণা—তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু হও, আমিও যেন তোমার চিরসখী হতে পারি।

টিউবে ওরা বসতে পেল না, বেশ ভিড় হয়েছিল। ওরা দুজনে একটা হ্যাণ্ডেল ধরে দাড়াল। কৃষ্ণার ঠিক পরেই কুমার। বিদ্যুৎযানের তীব্র গর্জনে কারু মুখে কথা নেই। কৃষ্ণার মনে হ'ল—সেই সশব্দ নির্জনতা যেন ওদের দুজনকে লাজবস্ত্রের মত ঘিরে রইল। ওদের কথা কওয়া হ'ল না, শুধু গাড়ীর দুরন্ত গতিবেগের ঝোঁকে ঝোঁকে ওদের পরস্পরের গায়ে গায়ে বারবার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। বার বার ফিসফিস করে কুমার বললে,—"কষ্ট হচ্ছে না ত?" বার বার ঘাড় নেড়ে কৃষ্ণা জানাল—না কষ্ট হয় নি। তবে কি হয়েছে কে জানে, বুকের মধ্যে যেন বোবা সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, গর্জন

করতে পারছে না, কাঁদতে পারছে না, হাসতেও পারছে না। কষ্ট? না কষ্ট না ত। তবে কি সুখ, কে জানে কি—সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

কোচিং স্কুলের বাড়ীর দরজার সামনে ওকে নামিয়ে দিয়ে কুমার বললে,—"কখন ক্লাস শেষ হবে বল?"

কৃষ্ণা হাসল—এ সুযোগ ছাড়বে না সে। বললে,—"কেন কি দরকার? আবার এসে নিয়ে যাবেন বুঝি? খুব একটা শিভ্যলরি দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন যা হোক।"

—"বেশ যদি বারণ কর, না হয় আসব না, কিন্তু যাবে কি করে শুনি? আসবার সময় দেখেছি, তুমি পথের কিছুই লক্ষ্য করলে না।"

—"নিশ্চয়ই করেছি, খুব করেছি,—" কৃষ্ণা বললে,—"দেখবেন আপনার আগে গিয়ে বাড়ী পৌঁছে যাব।"

—"অ্যাজ ইউ প্লীজ, মাদাময়সেল," একটু নত হয়ে বাউ করার ভঙ্গীতে মৃদু হেসে চলে গেল কুমার।

ক্লাসে গিয়ে পড়তে পড়তে কতবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল কৃষ্ণা। মিস রথচাইল্ড বললেন, "কি হ'ল ডিয়ার, আজ তোমার মন ভাল নয় কি?" ভাল ভাল -বেশী রকম ভাল। এত ভাল যে, সে আর নড়তে চাইছে না। বার বার সেই একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে। পার হয়ে আসা মুহূর্তগুলিতে লুব্ধ ভ্রমরের মত ফিরে ফিরে উড়ে যাচ্ছে। যেন সেই মুহূর্তের ফুলগুলি এখনও তাদের মধুভাণ্ডে অনেক মধু চুরি করে জমা করে রেখে দিয়েছে। ওর মন যখন প্রথম তাদের উপর দিয়ে উড়ে এসেছিল তখনও যেন তাদের ভাল করে ভোগ হয় নি, শুধু স্পর্শ করা হয়েছিল মাত্র। এখন আবার সেইখানে ফিরে যেতে চায় মন। চেখে চেখে পান করতে তার শেষবিন্দু রস, ডুবে যেতে চায় রোমন্থনের সুখে।

ক্লাসের শেষে যখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে তখনও ওর ঘোর কাটে নি; যেন মোহতে চলেছে।

হঠাৎ মনে হ'ল বাড়ী ফিরতে হবে ত? 'অলডুইচ' স্টেশনটা ত বাঁদিকে পড়বে? যেতে পারবে ত? নিশ্চয়ই, কি এমন শক্ত? কিন্তু যেতে গিয়ে দেখলে বাঁদিকে ত কোন আণ্ডারগ্রাউণ্ড নেই,—তা হলে? ওঃ! ত

হলে স্টেশনটা ত বরাবর ডানদিকেই আছে। অথচ কৃষ্ণা বরাবর ঐ ল্যাণ্ডমার্কটিকে বাঁয়ে বসিয়ে এসেছে। কি কাণ্ড! কৃষ্ণা সত্যিই এদেশের অনুপযুক্ত। হাঁটতেও ভুলে গেল আবার এরই মধ্যে। সেই খট্‌খট্‌ পথ চলার কায়দা! নবযুগের মার্চকরা সপ্তপদীগমন।

আসতে আসতে অনেকবার অনেক ভুল করল কৃষ্ণা। কলকাতায় বরাবর গাড়ী করে সব জায়গায় যেত। পুরনো ড্রাইভার সব কিছুই চিনত জানত। গাড়ীতে বসে ঠিকানা বলে দিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে যেত কৃষ্ণা। হয় গুনগুন করে গাইত আপন মনে, নয়ত অন্যমনে চেয়ে থাকত রাস্তার বিচিত্র জনপ্রবাহের দিকে। কিছুই লক্ষ্য করত না,—এজন্যে অনেক ঠাট্টা সইতে হয়েছে ওকে, তবু নিজেকে সচেতন করে তুলতে পারে নি। কিন্তু আজ মুশকিলে পড়ে, সারা পথটা ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে অনেককে জিজ্ঞেস করে, ভুলে ভুলে অনেকবার মোড় পেরিয়ে যখন ফিরে এল তখন বিকেলের আলো মিলিয়েছে আকাশের প্রান্তে, আর তার ছায়া পড়েছে ভাবনার মত সকলের মনে। রমলা এসে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বুড়ী মিসেস গ্রেগারও টুপী পরে ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়াল। আজ রাত্রে রোস্টমাটন্ হবার আর আশা নেই। ঠাণ্ডা-বাক্সে তুলে রাখা শূকরের মাংসের টুকরো আর স্যালাড খেয়েই কাটাতে হবে। কারণ বুড়ীর মন এখন আর রান্নাঘরে নেই। মার্কাস পার্থকে নিয়ে গেছে 'সায়েন্স মিউজিয়ম' দেখাতে। ওরা এখনও ফেরে নি। কুমার কখন আসবে কে জানে। রমলা আর মিসেস গ্রেগার দু'জনে দু'রাস্তায় গেল কৃষ্ণার খোঁজে। সাড়ে তিনটে থেকেই রমলা একটু একটু করে ব্যস্ত হচ্ছিল। পৌনে পাঁচটায় আর ওকে রাখা গেল না। শুধু মামাবাবু আছেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

—"আমিই তোকে সর্বপ্রথমে খুঁজে পাব বলেছিলাম। তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

কৃষ্ণা নিঃশব্দে হাসল।

মামা বললেন,—"ক'বার পথ হারিয়েছ বল দেখি মহারাণী? ক'টা ভৃত্য এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে?

—"সত্যি দাদু।" কৃষ্ণা হাসল,—"সাহায্য অনেক নিতে হ'ল। পথে পথে ভুলও অনেক করেছি,—কিন্তু তা সত্ত্বেও এসে ত গেছি।"

—"হ্যাঁ।" মামা বললেন,—"আলডুইচ থেকে চেলসী পর্যন্ত যদি নির্বিঘ্নে পৌছতে পেরে থাকিস্, তবে একদিন জীবনের পথও এমনি করেই পার হয়ে যেতে পারবি।"

—"হ্যাঁ দাদু।" উদ্ভাসিত মুখে কৃষ্ণা বলল,—"ভুল হবে অনেক জানি, কিন্তু সে সব শুধরে লক্ষ্যে পৌছতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস।"

মামাবাবু হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন,—"না ভাই,—শহরের পথে যত ভুলই হোক, জীবনের পথে খুব বেশী ভুল হবে না তোমার। স্পষ্ট দেখছি, তোর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে একজন গাইড সর্বদা তোর সঙ্গেই আছে। ঠিক পথেই বোধ হয় নিয়ে যাবে তোকে। তুই যদি বেশী স্মার্ট হতিস তাহলেই হয়ত সে অপ্রয়োজনীয় বোধে তোকে ছেড়ে যেত।"

—"তার মানে কি বলুন?"

—"আজ আর নয় দিদি,—অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা এসে পড়বার আগেই মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও।"

—"কিন্তু বকুনিটা 'মিস্' করতে ইচ্ছে করছে না।"

—"না না, সে আর একদিন হবে, আজ তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

সেদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণা একটু বিশেষ করে সাজল। চোখে কাজল ঘন করে দিয়ে, ঠোঁটে এঁকে দিল মৃদু রক্তিমা। 'ডোনাট' দিয়ে মস্ত কালো খোঁপা করে রূপোর মালা দিয়ে সাজিয়ে দিল। হলুদে রঙের কটকি সিল্ক-শাড়ির চওড়া রেশমী আঁচলে আধখানা কাঁধ বাঁকা করে ঢেকে কুমারের জন্যে প্রতীক্ষা করে রইল। এলে দেখিয়ে দেবে, অচেনা পথেও কে আগে এসে পৌছেছে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কুমারের ফিরতে কেবলই দেরি হতে লাগল। পার্থকে নিয়ে ফিরে এল মার্কাস। ওকে মিউজিয়াম দেখিয়ে, হাইড পার্কে নৌকো চড়িয়ে, 'লায়ন্সে'র বড় দোকানে চা খাইয়ে নিয়ে এসেছে। পার্থর মুখে গল্পের ফোয়ারা—মোটরগাড়ীর পরিণতির ইতিহাস,—আর রেলগাড়ীর জন্মের। পার্থ আশ্চর্য হয়ে গেছে, আর ওর প্রশ্নে প্রশ্নে মার্কাস কেন যে এখনও পাগল হয়ে যায় নি, একথা ভেবে রমলাও আশ্চর্য হয়ে গেছে।

মার্কাস কিন্তু অস্থির হয় নি মোটেই, বরং ধীরভাবে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে, ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে মার্কাসের। বাইরে থেকে পার্থকে দেখতে যদিও শান্ত ধীর,—কিন্তু যে একবারে ওর মনের

কাছাকাছি এসে যেতে পারে, তার কাছে ওর দুরন্ত কৌতূহল অজস্র প্রশ্নে লাফালাফি করতে থাকে।

মার্কাস বললে,—“ছুটি ফুরোবার আগে আগামী সপ্তাহে একবার পার্থকে আমার মা-বাবার কাছে ঘুরিয়ে আনতে চাই। ওরা প্রত্যেক চিঠিতে তোমাদের খবর জানতে চান। বিশেষতঃ পার্থকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন তাঁরা।

—“বেশ ত”, রমলা হাসল, “তুমি যদি শখ করে কষ্ট করতে রাজী থাক, আমি কেন বাধা দেব?—কিন্তু দেখ, শেষকালে তোমার মা-বাবা না ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।”

—“বেশ ত”,—রমলার চোখে আবার চোখ রেখে হেসে ওঠে মার্কাস,—“বেশ ত,—তা হলে ওর মাকেও নিয়ে চল না ওর সঙ্গে, শুধু ওকে সামলাবার জন্যে?”

বলতে বলতে নরম হয়ে এল মার্কাসের গলা,—“মা-বাবা দু’জনেই যে কত খুশি হবেন, তুমি ভাবতেও পার না। চল না,—যাবে? মাত্র ত একদিনের জন্যে?”

—“আমি?” অল্প হাসি দিয়ে মস্ত দ্বিধা ঢাকতে চাইল রমলা,—কি মুশকিলেই পড়ে গেল হঠাৎ। কি জবাব দেবে? কি বলা উচিত?

—“হাঁ, নিশ্চয়ই তুমি। দেখ, কৃতজ্ঞতা শোধবার এমন সুযোগ হারিও না,—তুমি শুধু একবার আমাদের বাড়ী পদার্পণ করলেই আমি তোমার কাছে অনেক বছর পর্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।”

মামা বললেন,—“যাও না, দুটো দিন ঘুরে এস, ভালই লাগবে,—নতুন পরিবেশে, জার্নালিস্ট হিসাবে যত বেশী ঘোরা যায়, যত বেশী দেখা যায় ততই

—“তা বটে,” রমলা হাসে,—“কিন্তু—”

—“কিন্তু আবার কি? ও ‘কিন্তু’কে উড়িয়ে দাও,—একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও,—তা হলে পরের শুক্রবার আমি বেলা তিনটের সময় গাড়ী নিয়ে এসে হর্ন দেব,—তোমরা নেমে আসবে। একেবারে গর্জের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের।”

—“ওঃ হো, চেডার গর্জ?” উৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল পার্থ।

—"তুমি চেডার গর্জের কথাও জান?"

—"হ্যাঁ, জানি বৈকি,—ঐ পাহাড়েই ত স্ট্যালেকটাইটের গুহা আছে?"

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মার্কাস বললে,—"ভারতবর্ষের শিশুরা কি আশ্চর্য!"

—"হাঁ", মামাবাবু হাসলেন,—"ভারতের শিশুরা সত্যিই ফাদার অব ম্যান,—মানবের পিতা, যুবাদের পিঠ চাপড়ে চলে।"

—"আহা জানিস নে? ভারতের বুড়োরা একেবারে শিশু, চির-খোকা, কিছুতেই তাদের চোখ ফোটে না।"

মার্কাস বললে,—"তা হলে এই কথা রইল,—শুক্রবার। মামাবাবু আর কৃষ্ণাকেও আমার নিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে, সেটা এর পরের বারে হবে। কারণ আমার গাড়ীটা নেহাতই সুকুমারী,—দু'তিনজনের বেশী সে ভার বইতে পারে না,—" মার্কাস হাসলে।

মামাবাবুও হাসলেন,—"তা ছাড়া রমলার সঙ্গে আমাদের না যাওয়াই ভাল। রমলা সকলকে এত বেশী ইমপ্রেস করবে যে, আমি আর কৃষ্ণা একেবারে ব্যাক্‌গ্র্যাউণ্ডে পড়ে যাব। তার চেয়ে আমাদের পরে যাওয়াই ভাল। কি বল কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসি শুনে মার্কাস ওর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখ তুলে তাকাল।

কৃষ্ণার মন সারাদিন খুশিতে টলমল করছিল। হাসতে পেয়ে বেঁচে গেল ও। কিন্তু যার জন্যে সারাদিন ধরে ওর মনের মধ্যে হাসির অর্ঘ্য রচিত হয়ে উঠেছিল, সে দেখতে পেল না। ক্রমে সন্ধ্যে ঘন হয়ে এল। মার্কাস ফিরে গেল। বুড়ী গ্রেগার টেবিলের উপরে স্যালাড আর পর্কসেদ্ধ, রুটি আর 'চীজ' সাজিয়ে সবাইকে ডাক দিল। খেতে বসে কুমারের কথা মনে পড়ল সকলের।

—"দুষ্টু ছেলে, খাবে না, এ খবরটাও ত জানানো উচিত ছিল। এত দেরি ত কখনও করে না।" বললে রমলা। ও ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। ঘরপোড়া গরুর মত একটু দেরি হলেই ওর ভাবনা শুরু হয়।

পার্থ শুধু অস্থির হয়ে উঠল, আজকের দিনের সব আশ্চর্য গল্পগুলো কুমারকে

হলতে দেরি হয়ে যাবে। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজল। কুমারের ফোন, বিশেষ কাজে আটকা পড়েছে, যেতে দেরি হবে, খাবে না বাড়ীতে। শুনে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল,—খবরটা বলেই মামাবাবু হঠাৎ একবার কৃষ্ণার দিকে তাকালেন, কিন্তু উত্তরে কৃষ্ণার চোখ প্রতিবারের মত হেসে উঠল না। কাঁটা-ছুরি নিয়ে টুংটাং করতে করতে কৃষ্ণা ফিরিয়ে নিল চোখ, নামিয়ে নিল মুখ।

পিয়েত্রা বাইরে থেকে খেয়ে এসেছিল, এদের সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে বার বার কৃষ্ণার সাজের দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু ওর সাজের উপরে ততক্ষণে মন খারাপের ছায়া পড়ে গেছে। এলো খোঁপার সাদা রূপো স্তিমিত হয়ে এসেছে যেন। আর কালো চোখে অভিমানের টুকরো টুকরো জ্বালা হীরের মত জ্বলে উঠেছে। ফোনে কুমার একবারও খোঁজ করে নি—কৃষ্ণা ফিরেছে কি না।

খাওয়া হয়ে গেলে ওরা সবাই রাস্তায় একটু পায়চারি করতে করতে গল্প করতে লাগল। পার্থর গল্পই সবচেয়ে বেশী। নতুন জীবন ওকে হাতছানি দিয়েছে।

—"Science দিয়ে কত কি করা যায় দাদু, এ ত মস্ত ম্যাজিক!"

—"ম্যাজিকই বটে", দাদু বলেন,—"একেবারে আলাদিনের প্রদীপ। এইটি হাতে পেয়েই ত হঠাৎ মানুষের এত বাড বেড়ে উঠেছে।"

—"মানে?"

—"মানে আর একটু বড় হলে বুঝবি।" মামা হাসেন।

কৃষ্ণা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ বললে,—"আমার মাথা ধরেছে মামা, গা কেমন করছে, আমি শুতে যাই?"

পিয়েত্রা ওর মুখ চেয়ে হাসলে,—"হ্যাঁ সত্যি, শিশুদের রাত করে শুতে নেই।"

কৃষ্ণার মুখের ম্লান ছায়া আরও একটু কালো হয়ে উঠল। ওকে দেখে সকলেরই বুঝি শুধু শিশু বলে মনে হয়, ওর প্রতি মনোযোগ দেবার কথা কারও মনেই থাকে না। পিয়েত্রার কথার জবাবে হাসল না কৃষ্ণা, অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে রইল। পিয়েত্রা অবাক হয়ে ভাবল, হ'ল কি!

মামা বললেন—"সত্যি কৃষ্ণা, তোমাকে ক্লান্ত লাগছে দেখতে। বিশ্রাম নেওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন, শুতে যাও ভাই। গুডনাইট।"

অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পিয়েত্রা বললে,—"গুডনাইট।"

তেমনি ওরই শুভরাত্রি জানাল কৃষ্ণা, অন্যমনস্ক নত চোখে শুতে চলে গেল।

সবাই একে একে ঘরে গিয়ে যখন আলো নিভিয়ে দিল, মামাবাবু নিজের দেড়তলার ঘরে শুতে এসে দেখলেন, কৃষ্ণার ঘরের নীলাভ আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরে এসে গলাবন্ধ গরম কোট আর ট্রাউজার বদলে শাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামার উপরে মস্ত মোটা ড্রেসিং গাউনটা পরে মামা এসে বন্ধ জানালার কাছে বসলেন। এখানে এসে অবধি প্রত্যহ শোবার আগে কিছুক্ষণ এই জানালার ধারে বসা মামাবাবুর একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসেছিলেন ডিসেম্বরের শেষে। তার পরে শীতের দুটো মাসে প্রায় রোজ রাতেই বরফ নিয়ে হোরিখেলা শুরু হ'ত। কার যেন মস্ত লেপটা ছিঁড়ে ফেলে আকাশ জুড়ে তুলো ছিটিয়ে ধুনুরীরা তুলো ধুনত।

আজ কিন্তু আকাশ নীল, আর চাঁদের আলোয় যেন থমথম করছে চারিদিক। এ যে লণ্ডন শহরের এক কোণার ছোট্ট এক টুকরো পৃথিবী, তা যেন মনেই হচ্ছে না। এই মুহূর্তে এই জায়গাটা বিশেষ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে শুধুমাত্র এই বিশেষ কালখণ্ডটুকুর মধ্যে অবস্থান করছে,—এই চন্দ্রালোকিত রজনীর বিশেষ ক্ষণটুকু। সবটাই অস্পষ্ট, সবটাই ঝাপসা, সবটাই সুন্দর, সবটাই মায়া। এই মায়ায় ঢেকে গেছে, যা কিছু বিরূপ কুশ্রী, যত কিছু গ্লানি। মনে হচ্ছে এখানে যেন দুঃখ বলে কিছু নেই। প্রেমের যেন কোন বিষয় নেই, প্রেম যেন আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে আকাশ জুড়ে টলটল করছে,—কোন বিশেষ দেশকে এর বিষয় করে নি। অর্থাৎ এই সৌন্দর্যের প্লাবনে যে কোন দেশের বিশেষত্বই অবান্তর। এ রস নিজের মধ্যেই পূর্ণ, তাই সব দেশকেই সমান ভাসিয়ে নিতে পারে। এ যেন সেই প্রাচীন ভারতের সতী নারীর প্রেম। মনে মনে উপমা খুঁজছিলেন মামাবাবু, স্বামী যেই হোক, তারি জন্যে ঘট পূর্ণ করে রাখে। বিচার করে না যোগ্যতা, চায় না প্রতিদান, এমন কি স্বামী বেঁচে আছে কিনা তারও পরোয়া করে না। শুধু নিজের মধ্যেই পূর্ণ প্রেমরস স্বামী-বিষয়কে অবলম্বন করে আনন্দে সতী অর্থাৎ সত্য হয়ে থাকে। আজকের এই বিশেষ ক্ষণটুকুও যেন কার প্রেমবিহ্বল চোখের ঝাপসা দৃষ্টির আলো

এই আলোয় মিলিয়ে গেছে ওপারের বাড়ীর মাথার কুশ্রী কালো চিমনীগুলো। রূপোর কুয়াসা দিয়ে মায়াজাল বুনছে জ্যোৎস্না। এই মায়ালোকে দুঃখকে তেমন সত্য বলে মনে হচ্ছে না। মামাবাবু ভাবলেন, দুঃখ হয় ত এখনো আছে, কিন্তু যেন মিথ্যা হয়ে আছে। এই যে উপরের এক রুদ্ধ ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে নবীনা কাঁদছে প্রথম-প্রেমের বেদনায়। আর তার পাশেই আর একটা অন্ধকার ঘরে, শুষ্ক চোখে বিনিদ্র বিছানায় বঞ্চিত জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে পূর্ণ-যৌবনা নারী। তাদের দুঃখ থেকে ক্লেদটুকু ধুয়ে ফেলে, শুধু মাধুরীটুকুই যেন ফুটিয়ে তুলেছে এই জ্যোৎস্না। শুধু কি এই? শুধু কি এখানেই? কোথায় কোন্ দূরদেশে নদীর জলে বান ডেকেছে, মৃত্যু হানা দিচ্ছে ভাঙা ঘরে। হাহাকার করে ফিরছে ক্ষুধা! তার জ্বালায় লুপ্ত হয়ে গেছে সব মাধুরীর আবেদন। পচা ডোবায় নোংরা খানা কন্দরে, খোলা নর্দমার ধারে, দুর্গন্ধ ক্লেদাক্ত পরিবেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে মানবজীবনের চরম অপমান। কুৎসিত নরকের মধ্যেও প্রাণের বিষাক্ত গ্যাসটা কোনমতে জ্বালিয়ে বেঁচে আছে মানুষ। এই মুহূর্তেই হয়ত কোথাও ঈর্ষাদ্বেষের গুপ্ত মন্ত্রণা ফেনিয়ে উঠছে। প্রবৃত্তিতে পাগল হয়ে মানুষ খুন করছে মানুষকে। কোথায় মতে মতে বাধছে সঙ্ঘর্ষ—পথে পথে লড়াই উঠছে মাতাল হয়ে। রাজনীতি হানা দিচ্ছে মানবনীতির গুচ অন্তঃপুরে। হিংস্র লোভ দুর্বিষহ মূঢ়তায় আচ্ছন্ন করছে মানুষের শুভ চৈতন্য। কলুষিত হচ্ছে পবিত্রসুন্দর, যেমন দগ্ধ হচ্ছে আত্মা। কিন্তু সেখানেও এই চাঁদের আলো সেই কুৎসিত রূঢ়তার উপরে একটা রূপোলী জালের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

গৌতম রায়ের চোখের সামনে হঠাৎ যেন ভেসে উঠল সেই কোন্ দূর দেশের ক্ষুদ্র গ্রামের ছবি। সেখানে পচা ডোবার ঘোলাটে জলে চিক্ চিক্ করছে তৃতীয় প্রহরের চাঁদ আর তারই আভা যেন লণ্ডনের প্রথম প্রহর রাত্রির কালো বাড়ীর শ্রীহীন চিমনীগুলিকে আবৃত করে একটা অপার্থিব সুষমায় মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে আছে। শুধু চেয়ে থাকার নেশায় তার চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। অনেক কিছুই করবেন বলে ঠিক করেছিলেন আজ রাতে। একটা লেকচার তৈরি করার কথা আছে, তার জন্যে কয়েকটা বই দেখতে হবে ঠিক করেছিলেন। নয়ত যে প্রবন্ধটা

আধখানা হয়ে আছে, সেটা শেষ করে ফেলবেন ভেবেছিলেন,—কিন্তু কিছুই করা গেল না। শুধু বাইরে চেয়ে বসে রইলেন। আর গলার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গুনগুন করে ফিরতে লাগল—"পূর্ণ চাঁদের মায়া।"

ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে এল। এমন রাতে যে কোন শব্দই বেমানান, এমন কি গুনগুন গানের আওয়াজও। এ সময়ে নিঃশব্দ সুরেরা অদৃশ্য পরীর মত চাঁদের কিরণে খেলা করে বেড়ায়। সর্বাঙ্গের রোমকূপের রন্ধ্র দিয়ে তাদের গ্রহণ করতে হয়,—আর অনুভব করতে হয় দেহমনের অতল গভীরে ডুব দিয়ে। আপনা থেকেই সেই অতলে ধীরে ধীরে কে যেন ডুবিয়ে নিয়ে চলল তাঁকে। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন সেটির উপরে। আর তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে বন্ধ কাঁচের জানালা ভেদ করে মধ্যরাত্রির পূর্ণ জ্যোৎস্না ঝিমঝিম করতে লাগল।

রাত প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ স্তিমিত চোখ মেলে মামাবাবু দেখলেন, কুমারের দীর্ঘদেহ ঘাসে-ঢাকা ছোট উঠানের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে এল।

একটু পরেই কুমারের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, আর মামাবাবুর অবাক চোখের সামনে কৃষ্ণার ঘরের সেই নীল আলোটা খুট করে নিভে গেল।

পরদিন ব্রেকফাস্টে টেবিলে কুমারের দেখা মিলল বেশ কিছুক্ষণ পরে। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সবাই। চেহারা দেখে মনে হ'ল একরাতে ওর শরীরের উপর দিয়ে যেন মস্ত ঝড় বয়ে গেছে—একটা হৃতপত্র গাছকে যেন ডালপালা ভেঙে মুচড়ে ফেলে রেখে গিয়েছে। হঠাৎ দেখে যেন চেনা যাচ্ছে না। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে রমলার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল।—আহা, ওদের জেঠতুত-খুড়তুত সব মিলিয়ে শুধু মেজকাকার এই ছেলে। ওর নিজেরও আর ভাই নেই, ছোটকাকারও কোন ছেলে হয় নি, তাই ঠাকুমার কাছে বরাবর মেজকাকীর আদর ছিল বেশী। তাই নিয়ে মায়ের মনের ঈর্ষার রেশ যে ওদের মনেও কখন কখনও টান ধরায় নি বলতে পারে না। তবু ওদের ভাই বলতে ওই একজনই আছে। তার উপর ছোট থেকেই সমবয়সী, কুমারের সঙ্গেই ওর সবচেয়ে ভাব আর সবচেয়ে আড়ি। আহা, এসে পর্যন্ত সেই ভাইয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে নি, নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল শুধু। যেন তার

দুঃখেই জগৎভরা। পৃথিবীতে আর কারও যেন মন বলে জিনিস নেই, তাতে আঘাত পড়ে কিনা একবার তাকিয়ে দেখবার ফুরসত নেই রমলার। আহা, এত বড অসুখ থেকে উঠেছে! অবশ্য রমলা এসে অবধি তার খাওয়া-দাওয়ার যত্ন করেছে, জোর করে টনিক আনিয়ে খাইয়ে তার চেহারা প্রায় ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু সে কেবল শারীরিক যত্ন। তাও বড বেশী রাগ দেখিয়ে করা। স্নেহের প্রয়োজনেও রমলা তার দৃপ্তভঙ্গিমাই প্রকাশ করে থাকে। মিষ্টি কথার বাজে খরচ করে না। স্বামীর উপরেও করতে পারে নি কোনদিন। অনুমতি চায়নি কোন বিষয়ে—এমনকি তার নিজের বিষয়েও না। কে কি খাবে, কি পরবে, কাকে কি দিতে হবে, কাকে কি করতে হবে, সব রমলার কথামত হবে। অবশ্য রমলার ব্যবস্থায় সবাই খুশীই থাকত, বিদ্রোহের কারণ বেশি ঘটত না। কারণ ওর ব্যবস্থায় সকলের দিকটাই দেখা হয়ে থাকত, তবু হয়ত মনের দিকটায় ঘাটতি পডত খানিকটা। এ নিয়ে অনেক ভেবেছে রমলা। স্বামীকে ও যা দিয়েছে, তার মধ্যে কতটা ছিল ভালবাসা আর কতটাই বা গর্ব। মেয়েরা মনে করে তাদের অভিমানটা ভালবাসারই নামান্তর। কথাটা অবশ্য এক হিসাবে সত্য। অভিমানের মধ্যে খানিকটা ভালবাসা আছে—কিন্তু তার সবটাই প্রায় নিজের প্রতি। তাহলে, অভিমান অহঙ্কারেরই নামান্তর, ভালবাসার নয়। তাই রমলার রাগ হোল নিজের উপরে, মনে হয় সবটাই ওর দোষ—কেন একটু তাকিয়ে দেখে নি এতদিন কুমারের দিকে, কেন বুঝতে পারে নি কোথায় ওর মনের কোণায় রসের ঘাটতি ঘটেছে। ওর এটা শরীর খারাপের চেহারা আদবেই নয়—মন খারাপের চাবুকের দাগ ওর রোদের মত উজ্জ্বল মুখে খেজুরগাছের ছায়ার মত কেটে কেটে বসে গেছে। আহা, কেন এমন চেহারা হ'ল একদিনে? কি কোথায় ঘটল, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় রমলার। কিন্তু বলার সময় শুধু বলে,—"তুমি চা খাবে না কফি, কুমার?"

কোনদিকে না চেয়ে কুমার বললে—"চা।"

তারপরে হঠাৎ রমলার হুকুমকে সরাসরি অগ্রাহ্য করল কুমার, কিছু সে খেল না—ডিম, বেকন্ অথবা মাছ। শুধু একটা টোস্টে মাখন লাগিয়ে বললে,—"এই যথেষ্ট আজ।"

রমলা—ছোট করে বলল, "কেন?"

তার উত্তরে কুমার অন্য দিকে তাকাল—অন্য কোন দিকে—কোন বিশেষ দিকেই নয়—কোন্ একটা অদ্ভুত শূন্যের দিকে তাকিয়ে ও রমলার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। তার পরে হঠাৎ কৃষ্ণার দিকে ফিরে যেন শূন্যকে সম্বোধন করে বললে,—"আজ চারটার ট্রেনে ব্রিস্টলে যাচ্ছি।"

—"আজকেই?" বিস্মিত প্রশ্ন করল রমলা।

কৃষ্ণা অবাক হয়ে ভাবল—কুমার কাকে বলল ও কথা। —তাকে কি? বোধ হয় না—বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করেই হয় ত নয়। কিন্তু তার দিকে তবে বিশেষ করে চাইল কেন? এইত একটু আগে কুমারের চেহারা দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল। কুমারের ব্যবহার ওর মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিল। কুমার ওর দিকে নজরই করে নি—একটা কথাও বলে নি। মনে হচ্ছিল যেন কৃষ্ণার অস্তিত্ব শুধু ওর মনের সামনে নয়, চোখের সামনেও নেই। তবে কি গতকালের সেই ক্ষণিক বন্ধুত্বের জন্যে ও অনুতপ্ত, এখন খারাপ ব্যবহার দিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইছে তার দাম? কে জানে?

কিন্তু কি রকম যেন নাভাস লাগছিল এতক্ষণ কৃষ্ণার—হাতের তলাটা ঘেমে উঠছিল এই ঠাণ্ডায়। তবে হঠাৎ আবার কেন ওর দিকে তাকাল, ওর দিকেই বিশেষ করে। উত্তরে ওরও ত কিছু বলা উচিত—অন্তত একটু কিছু ভদ্রতার কথা। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না কৃষ্ণা, শুধু থতমত খেয়ে চুপ করে চেয়ে রইল—চোখে কথা ভরে এলেও মুখে ফুটল না। আজই কুমার চলে যাবে এই খবর আর কুমারের সেই অন্যমনস্ক চাউনি এই দুটোর ভারে ও যেন হকচকিয়ে গেল। কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না।

মামাবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন,—"বাস ড্রাইভাররা সব স্ট্রাইক করেছে লিভারপুলে।"

এতক্ষণে বলার মত কথা খুঁজে পেল কৃষ্ণা—"কেন?"

মামা বললেন,—"কারণ গুরুতর, কৃষ্ণারাণী। একজন ভারতীয় ড্রাইভার নিযুক্ত করেছিল কর্তৃপক্ষ। সাদা ড্রাইভারদের তাই মনে লেগেছে, মানে বেধেছে। কালো ড্রাইভারদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলে তাদের জাত যাবে।"

—"সত্যি?"—এতক্ষণে কুমার মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

—"দেখই না।" কুমারের দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন মামা। কাগজের দিকে মন দিল কুমার।

রমলা বললে,—"কে ভারতীয় ড্রাইভার হতে এদেশে এসেছিল? এরা যায় আমাদের দেশে হাতে চাবুক নিয়ে বড়সাহেব হতে। আমরা আসি এখানে ড্রাইভার আর মিস্ত্রী হয়ে চাবুক খেতে। কেন আসি এখানে আমরা।" রমলার গলা ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

শান্তস্বরে মামা বলেন,—"আসি যখন কারণও নিশ্চয়ই আছে। আর সে কারণই কি একটা?" মামা বলেন,—"না এসে লোকে করবেই বা কি? ভেবে দেখ না—ঐ ছেলেটা বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে। ছেলেবেলায় নিজেদের গাড়ী ছিল, তাইতেই ড্রাইভারীতে হাত পাকিয়েছে। ম্যাট্রিক দিতে না দিতেই বাপ গেল মরে। হাতে যেটুকু যা ছিল তাই দিয়ে আই-এ পাস করে বোনের বিয়ে দিল। তারপরে টিউশনি করতে করতে বি-এ পাস করে ভেবেছিল কোথাও ঢুকতে পারবে। কিন্তু হায় রে বি-এ পাস—হায় রে ভারতবর্ষ! দু'বছর ধরে যখন কিছুই হ'ল না তখন বেচারী শেষে এই দুঃসাহসিকতা করলে। অনেক কষ্টে জাহাজে মিনিয়েলের কাজ যোগাড় করে চলে এল এখানে। ভেবেছিল এখানে 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট'। কাজ সব পাকা ফলের মত একেবারে নাগালের মধ্যে ঝুলছে, পেড়ে নিতে পারলেই হ'ল। অবশ্য এখানে যে বিদেশীদের জন্যেও কাজ পাওয়া যায়, সেকথা সত্যি।"

—"হোক সত্যি। কিন্তু ড্রাইভারী ছাড়া কি আর কাজ নেই?"

কাগজ থেকে মুখ তুলে কুমার বললে,—"তা হোক না ড্রাইভার, ক্ষতি কি? ড্রাইভারী করে, পোস্ট আপিসের পিয়ন হয়ে এমন কি ডকের কুলী-গিরি করে যদি মাসে শ'তিনেক টাকা রোজগার হয় ত মন্দ কি? দেশে থাকলে ত সাধারণ বি-এ পাসকে পঁত্তচার টাকার জন্যে বসে থাকতে হ'ত। কাজের মধ্যে আমাদের মত এদের এত মান-অপমান নেই।"

—"না, নেই আবার।" গর্জে উঠল রমলা।

—"শুধু কাজের জাত নয়, জন্মের জাত। ভাখো গে যাও ফিঞ্চলে আর ক্যাম্বডেন টাউন? আমরাই শুধু জাত বিচার করি, বাগ্দীপাড়ায় ঢুকিনে। এরাও ঠিক সেই কাজেই করে, শুধু আর একটু পালিশ করে রং মাখিয়ে করে। ফিঞ্চলেতে যদি তুমি প্রাসাদও কর তবু লোকে তোমার দিকে নাক সিঁটকে তাকাবে। সোসাইটিতে উঠতে শুধু অর্থদণ্ডই হবে। তবু বাড়ীতে পার্টি জমবে না।"

—"সেটা সত্যি", মামা বললেন,—"শুনেছি পার্কলেনের ছোট ফ্ল্যাটের চেয়েও ওসব পাড়ার প্রাসাদেরও দাম কম।

—"তবে? এর নাম জাতবিচার নয়?"

কুমার চোখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকাল, রমলার দিকে ফিরে বললে,—"ঠিক বলেছিস। প্রথমটা ধরা যায় না বটে, কিন্তু জাতবিচার দেখছি সব দেশে সব জাতেই আছে। শুধু ধরা পড়েছি আমরাই।"

মামা বললে,—শুধু জাত নয়, কাজেরও বিচার এরা কিছু কম করে না। আপিসে যতই সমান সমান ব্যবহার করুক না, উপরআলাদের নেমন্তন্নে-আমন্ত্রণে কখনই এদের ডাক পড়ে না।"

—"কিন্তু মামা", কুমার বললে,—"আপিস ও কলেজের ঐ সমান সমান ব্যবহার, ঐ নাম ধরে পরস্পরকে ডাকার সাম্য ঐটুকুতেই যথেষ্ট ভাল লাগে। দেশে ত এটুকু পাবারও যো নেই। এক গ্রেড উপরে উঠলেই তার ব্যবহারে অধস্তনের সঙ্গে দশ গ্রেড তফাত হয়ে যায়। সেই জন্যেই এখানে এসে এদের উপরআলাদের সঙ্গে বন্ধুর মত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখেই প্রথমে মন গলে যায়। দেখে মনে হয় dignity of labour কথাটার মানে এরা সত্যিই জানে।"

—"তা খানিকটা জানে নিশ্চয়। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে বেশী, তবে সবটা জানে না।" মামার কথা কেড়ে নিয়ে রমলা বলে,—"কিন্তু আমাদের দেশে গিয়ে কাজের এত ভাগ ওরাই বাড়িয়েছে। ওদের বেয়ারা, বাবুর্চি কেউ কারও কাজ ছোঁবে না। মেঝেয় দু'ফোঁটা জল পড়লে মুছে নিতে জমাদারকে ডাকবে। আমাদের ছত্রিশ জাতের পরে আরও ছত্রিশ এরা যোগ দিয়েছে।

—"অথচ", কুমার বলে,—"নিজের দেশে এরা সবাই ত সব কাজ করে। জুতো সাফ থেকে চণ্ডীপাঠ। এই ত এই বাড়ীতেই দেখ না। এত বড় বাড়ী, অথচ সব ঐ বুড়ী একলা ম্যানেজ করে। তার উপরে রান্না। ছেলেরাও তাই, ঐ মার্কাসকেই দেখ না। শুনেছি বড়লোকের ছেলে, বাড়ীতে ঝি-চাকর আছে, কিন্তু দেখ সব কাজই ওর জানা। কারও জন্যেই ওকে অপেক্ষা করতে হয় না।"

মামা বললেন,—খুব ঠিক বলেছিস, নিজেদের জন্যে জীবনের একটা

নির্দিষ্ট পথ ওরা বেছে নিতে জানে, দ্বিধা করে না অকারণ। নিজেদের জন্যে কোন কাজকেই এরা তুচ্ছ করে না।"

—"কিন্তু আমাদের দেশে যখন ওরা গেছে, তখন এই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। ওদের অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাজসজ্জা, ওদের ক্লাব, পার্টি, খেলাধূলা সবই নিয়ে গেছে, কিন্তু চরিত্রের যে শিক্ষার গুণে, ইংরেজ ইংরেজ—সেই শিক্ষাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।"

—"ভুলে যায় নি, ইচ্ছে করে ফেলে গেছে", রমলার গলায় অসহিষ্ণু অধীরতা, "সেখানে ওরা গেছে শুধু বড়লোকী করতে আর চাল দেখাতে, ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে তাক লাগিয়ে দিতে, আর সেই দীপ্তির রসদ সংগ্রহ করতে। আমাদের দারিদ্র্যের মূল্য দিয়েই কেনা হয়েছে লণ্ডন শহরের এই যত ঝক্‌মকানি, বিলাসবৈভব। এই যে রাস্তায় মাটি পাথরের বদলে কাঠের পাটাতন; এই যে সুড়ঙ্গপথের রাজপুরী, এ সবের গোড়ায় সেই অযোধ্যার বেগমদের অলঙ্কার আর দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের মুখের গ্রাস এখনও লেগে আছে।"

—"হয়ত ভালই হয়েছে", এতক্ষণে মামা হাসলেন। রমলার অধীর উত্তেজনাকে হাসি দিয়ে একটু নরম করে আনতে চাইলেন,—"হয়ত ভালই হয়েছে অযোধ্যার বেগমের লোহার সিন্দুকে বন্ধ না থেকে আর অযোধ্যার নবাবদের কামনার ইন্ধন না জুটিয়ে সে টাকা যদি মানুষের জ্ঞানের পরীক্ষায় খাটান হয়ে থাকে, তা সে যে কোন দেশের মানুষই হোক না, একটা জাতকে, তা সে যে জাতই হোক, সুখের পথে, সমৃদ্ধির পথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে থাকে তবে এমন কি ক্ষতি হয়েছে। বাকী রইল ভারতবর্ষের দুঃখী প্রজারা? তারা আর ক'টা দিন বেশী বেঁচেই বা করত কি—তারা ত মরতেই এসেছে। চিরকাল মরেই এসেছে, হয় মহামারীতে, নয় বন্যায়, নয় দুর্ভিক্ষে। সেবারে না হয় দুর্ভিক্ষের মাত্রা একটু বেশী হয়েছিল। পরিধি একটু ব্যাপক হয়েছিল এই মাত্র।"

—"ঠিক বলেছ মামা, এরা সত্যিই একথা মনে মনে বিশ্বাস করে। যেহেতু ভারতবর্ষ শান্ত নির্বিরোধী, আর সেকেলে। যেহেতু সে আধুনিক বিজ্ঞানের লোহার সিন্দুকের চাবিটা হাতে পায় নি, তাই তাদের নিজের দেশে তাদের অধিকার নেই,—আর তাদের ধন পরের ভোগের জন্যেই

সঙ্কিত। রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যঙ্গ-কৌতুকের ডেঁয়ে পিঁপড়ের যুক্তি আর কি? যেহেতু পিঁপড়েরা নেহাতই পিঁপড়ে, তাই তাদের ধনে রাজবংশী ডেঁয়েদের নিত্য অধিকার।"

—"অত উত্তেজিত হোস নে রে", মামাবাবু শান্ত গলায় বলেন,—

"কার ধন কে নেয়?

একে একে পাখী যায়, গানের পসরা

তবুও না হয় শূন্য।

সমস্ত জিনিসটাকে যদি আর একটু বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারতিস তা হলে—"

—"রাখ রাখ মামা, তোমাদের বড় বড় কথা আর বড় বড় দর্শন। ঐ করেই দেশটা বারবার মার খেয়ে এসেছে। বড় কথা আর বড় প্রেক্ষণ, তা হলে ছোট কথাগুলো যাবে কোথায়? জীবনের প্রতি মুহূর্তের এই সব ছোট ছোট কথা। এই অতি তুচ্ছ খাওয়া, পরা আর তার যোগাড় করা, এরই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে মানব-বংশধারা। এই গুলোই জীবনের ভিত্তি—তাই মনুষ্যত্বেরও প্রতিষ্ঠা—এদের তুচ্ছ করে—"

—"আরে তুচ্ছ করতে কে বলেছে। আমি শুধু বলছি, ছোট কথাকে বড় কথা দিয়ে মুড়ে নিতে হবে।"

—"এ তুমি কি বলছ? বড় কথার ঢাকা দিয়ে ছোট কথার মূল সত্যকে আচ্ছন্ন করতে হবে কেন? যত বড়ই কথা হোক, যত ব্যাপকই তার প্রভাব হোক, তা যদি সত্যকে আচ্ছন্ন করে তবে তা বর্জনীয়।"

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ হ'ল আস্তে আস্তে উঠে নিঃশব্দে টেবিল পরিষ্কার করছিল। একথা শুনে হাতের কাজ ফেলে একটা চেয়ারের পিছনে এসে ভর দিয়ে দাঁড়াল। কুমার এতক্ষণ খবরের কাজ আড়াল করে ওদের বিতর্ক শুনছিল। এইবারে সোজাসুজি রমলার প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকাল।

মামাবাবু কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। রমলা যদি আরও কথা বলতে চায় বলুক না, বাধা দিলে তার সৌন্দর্য ব্যাহত হবে। রমলার সত্তায় প্রকাশসত্তার প্রশ্রয় আছে। এতদিন শোকের বাষ্প ঘন কুয়াসার মত তাকে চেপে রেখেছিল। আজ যদি কিছু তার ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় ত পড়ুক না।

রমলা বললে,—"ছোট কথাকে, বড় কথার মালা পরিয়ে কেন সাজাতে চাইছ? ছোট যে সে ছোট বলেই সুন্দর, তার অস্তিত্বের সত্যে সে স্বতঃই উদ্ভাসিত। বড় কথা দিয়ে তার মহিমা বাড়াতে গিয়ে তোমরা চিরকাল তাকে খর্বই করে এসেছ। সোনার পাত দিয়ে মুড়লেও, পাথর সোনার পাতে মোড়া পাথরই থাকবে। পেটের মধ্যে ক্ষিধেটাও তেমনি সত্যি। তাকে যে নামেই ডাক না কেন। সেই অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক প্রয়োজনটার উপরেই এই বিশ্বসংসার ঝুলছে। তাকে কিছু নয় বলে অস্বীকার করলেই ত আর সে সত্যি উড়ে যাবে না।"

—"সে কথা এত চট করে বলা যায় না।" এতক্ষণে কথা বলেন মামা,—কিন্তু কে বলেছে যে, আমাদের শাস্ত্র তাকে অস্বীকার করতে চাইছে? জানিস, উপনিষদ বলেছেন, 'অন্নং না নিন্দ্যাৎ তদ্‌ব্রতম'।"

—"উপনিষদের কথা ছাড় মামা, ওগুলো যত প্রাচীন কালেরই রচনা হোক না কেন, মতামতের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতম বইকেও হার মানায়। জীবনে মানুষের পূর্ণভাবে বাঁচবার অধিকারকে বারবার সগৌরবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা ত পুঁথির পাতায়, ঠাকুর ঘরের তাকের উপরে তুলে রেখে দিয়েছ। আর যা নিয়ে ব্যবহার চলছে, সে ত জীবনকে এড়িয়ে যাবার শিক্ষা; চোখ বুজে সত্যকে ফাকি দেবার চেষ্টা। তাই আজ আমাদের জীবন এত মিথ্যা, এত ব্যর্থ। আশ্চর্য মামা, আমি কেবল ভাবি আমাদের দেশে এত সব মহাত্মা জন্মেছেন, এত মহৎ, এত প্রকাণ্ড কথা তাঁরা বলে গেছেন তবু আজও কেন আমরা ছোট কথার মহত্ত্বকে স্বীকার করতে পারলাম না। প্রাণের সহজ-স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তুচ্ছ বলে নিন্দা করে বড় বড় দর্শনের ফাঁকা কথা দিয়ে জীবনের মস্ত ফাঁকটাকে ভরাট করতে চাইছি। তাতে শূন্য ভরছে না, শুধু বাড়ছে অহঙ্কার। আমরা ভারী দার্শনিক, ভারী আধ্যাত্মিক জাত—এই অহঙ্কার। এদিকে দর্শনের ঠেলায় যে ভিকিরী হতে হ'ল, আমাদের বাড়াভাত যে বারবার পাঁচজনে এসে লুটেপুটে খেয়ে নিল, তখন চেয়ে দেখলাম না। শুধু শূন্য চোখ শূন্যে তুলে বললাম, যেতে দাও, ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি; কিন্তু সেই অল্প ত আমাদের ছাড়ে না। পেটের মধ্যে নাড়ীর পাকে পাকে জ্বালা ধরিয়ে সে যখন তার

প্রাপ্য আদায় করতে ছোটে—তখন ত আর দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না, পাপপুণ্যের বিচার থাকে না, তখন ত যে কোন হীনতাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা থাকে না। বড় হতে গিয়ে ছোট হয়ে যাই।"

—"দাদু, দাদু, দাদু।" উজ্জ্বল মুখে ছুটে এল পার্থ,—"নেহরু আসছেন আজ বিকেলে, জান দাদু? পরশু তাঁর জন্যে ইণ্ডিয়া হাউসে মস্ত পার্টি হবে। হিঃ হিঃ হিঃ, দাদু কি মজা!"

ওর হাসির ছোঁয়া মামার মুখেও ছড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন,—"নেহরু আসছেন ত তোমার কি?"

—"বাঃ, আমি যে এখানে তাঁকে দেখতে পাব, একেবারে কাছে থেকে। দেশে থাকতে তো আর তা হ'ত না! সেখানে ত শুধু পিণ্টুদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম,—'দু'ধারে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে খোলা গাড়ীতে করে চলেছেন, মুখে হাসি, হাতে নমস্কার, কিন্তু তবু সে কত দূরে। আমরা না হয় তাঁকে দেখতাম, তিনি ত আর আমাদের দেখতে পেতেন না। এখানে কি মজা, একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে দেখব। চাই কি কথাও হবে দু' একটা। আমাদের সকলের 'ইনভিটেশন' আসবে।"

—"তোমাকে সে খবর এই সকালে কে দিল

রমলার স্বরে উচ্ছ্বাসের আভাস নেই দেখে তিতির বনাম পার্থর উৎসাহ দমে গেল। তবু প্রশ্নের উত্তরে অপ্রস্তুত মুখে কিছু দ্বিধা আর কিছু খুশীভরা বড় চোখ মেলে পার্থ বললে,—"আমি কাগজে খবর দেখেই অমিকাকাকে ফোন করেছিলাম, অটোগ্রাফ আনিয়ে দেবার জন্যে। তাতে কাকা বললে, কাল সকালের মধ্যেই কার্ড পাঠাবে। তা হলে নিজে গিয়ে অটোগ্রাফ চেয়ে নেওয়া যাবে। কি মজা—"

—"কি এমন হাতী-ঘোড়া লাভ হবে তোমার তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে?"

—"বাঃ!" পার্থর গলায় চড় খাওয়া উৎসাহের ক্ষুব্ধ গুঞ্জন,—"বাঃ!"

—"তাহলে নেহরুর অটোগ্রাফ নিতে তোমায় দিল্লী না গিয়ে একেবারে লণ্ডনে আসতে হ'ল?" কুমার হাসল।

—"হ্যাঁ মামা, আমিও কেবল সেই কথাই ভাবছি," তিতি বললে,—"দেশের লোকের দেখা পাব বিদেশে এসে,—" তিতির হাসল, স্বচ্ছ সরল

[illegible]। কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে হাসল,—"দিদি, আমি কিন্তু তোমার জন্যেই অটোগ্রাফের খোঁজ করছিলাম। আমার ত খাতাই নেই। দেখ কেমন যোগাড় করে দিলাম। কিন্তু দিদি, অটোগ্রাফটা তোমার নিজেকে নিতে হবে। তখন যে চুপি চুপি আমার হাতে খাতা দিয়ে বলবে, ভাই তিতি, লক্ষ্মীটি, তুই গিয়ে নিয়ে আয়।"

কৃষ্ণার চোখ খুশির ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল,—"না রে না, আমরা দু'জনে যাব—"

—"মোটেই না, আমি দূরে থাকব। চট্ করে আমার বক্স ক্যামেরাটা দিয়ে একটা ছবি তুলে ফেলব, পরে সেটা পাঠিয়ে দেব মণিমেলায়—পণ্ডিত নেহরু লণ্ডনে একটি ভারতীয় বালিকাকে স্বাক্ষর দিতেছেন। বালিকা লিখব না তরুণী লিখব, বল্ না রে দিদি?"

তিতির কথায় ঘরভরা গুমটে যেন এক ঝলক রোদ্দুর হেসে উঠল। কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কুমার চোখেমুখে হাসল, এবার আর সেই অন্যমনস্ক হাসি নয়—কৌতুকোচ্ছল চোখে চোখে মেলানো, চেনাশোনার আদর মাখানো হাসি। এতক্ষণে কুমারের তবে কৃষ্ণাকে মনে পড়ল। আর সেই অকাশিত খবরের ঢেউ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে দ্রুত-নিশ্বাসে দুলতে লাগল, গত সন্ধ্যার সব অভিমান, আজ সকালের উদ্বেগ, আশঙ্কা, সমস্ত ছাপিয়ে সেই খবরের রং ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ হাসি-খুশির হাওয়ায় কুমারের মুখের কালো ছায়াও একটু যেন সরে গেল। সেদিকে তাকিয়ে রমলা ভাবলে—কৃষ্ণার সঙ্গেই কুমারের বিয়ে দিতে হবে। নইলে, এদেশে কুমারের মত সুপুরুষ ছেলের কুমার থাকার সম্ভাবনা কম। কে জানে, এখনই দেরি হয়ে গেছে কিনা? কাল রাতে ওর কি হয়েছে কে জানে—এখনও ত ওকে দেখতে কেমন অসুস্থ লাগছে, এ হাসি শুধু বাইরের হাসি। কি জানি ওর কি সত্যি কোন অসুখই করল নাকি!

রমলার মনে মনে যতক্ষণ নারীস্নেহ আর কৌতূহল কথা বলাবলি করছিল, ততক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামাবাবু বললেন,—"নেহরু কি জানেন যে তাঁর দেশের একজন বি-এ পাস নবযুবকের জন্যে ইংলণ্ডের বাস-ড্রাইভাররা স্ট্রাইক করেছে?"

—"নিশ্চয় জানেন দাদু।" তিতি লাফিয়ে উঠল—"খবরের কাগজ ত

তাকে পড়তেই হয়। আমি জানলাম আর পণ্ডিতজী জানবেন না। এ কি হতে পারে?"

—"কিন্তু মামা তিনি জেনেই বা কি করতে পারেন?" কুমার বললে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে।

"কেন সাউথ আফ্রিকার বিষয় নিয়ে যদি এত বলা যায়, তবে এটা নিয়ে কেন আমরা কিছু বলতে পারব না?" এতক্ষণে কৃষ্ণা একটা বলার মত কথা খুঁজে পেল। কিন্তু বলেই বুঝল, ভুল হয়ে গেছে—না বললেই ভাল ছিল।

কিন্তু মামাবাবু হেসে ওঠার আগেই কুমার কথা কইল। আগে হলে ও নিজেও হেসে উঠত। কিন্তু আজকাল কাউকে কোন রকমেই আঘাত দিতে ওর কোথায় যেন বাজে। অন্যের দিকটা স্বভাবতঃই মনে পড়ে যায়। বেচারা কৃষ্ণা এখনও বড়দের তর্কসভায় তেমন করে যোগ দিতে পারে না, কিন্তু তা বলে ওর যোগ্যতা কম নয়।

শুধু নিজের বিষয়েও এখনও অনেকখানি অচেতন। প্রতি কথায় বড়দের মুখ চেয়ে থাকে বলেই ও এখনও ছোট হয়েই আছে। হঠাৎ কুমারের মনে হ'ল, মামাবাবু যতই ঠাট্টা করুন, এই অন্ধতা থেকে ও কৃষ্ণাকে মুক্তি দিয়ে যাবে। না হলে, সেই ভীতু পাখীর বাচ্চার মত ওর পাখার জোর যাবে কমে। আকাশকে ভয় করে বাসার কোণে লুকিয়ে থাকবে, আর মুখ দেখালেই কাক-চিলের ঠোকর খাবে।

হঠাৎ কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কুমারের মনে হ'ল যে, ও সেই বাংলা দেশের মেয়ে, যে নিজের অসীম শক্তিকে মিথ্যে একটা অহেতুক লজ্জা দিয়ে ঢেকে রেখে দেয়। ওকে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ওর ছেলেমানুষী যে সকলের কৌতুকের খোরাক যোগায়, এমন কি কুমারেরও,—এই কথাটি হঠাৎ মনে মনে পীড়িত করল কুমারকে। হয় ত তখনই এত কথা স্পষ্ট করে কুমারের মনে হয় নি, এসব কথাই তার মনে ছিল। তাই কৃষ্ণার মুখে অপ্রস্তুত ভাব ফুটিয়ে অন্য কারুর হেসে ওঠবার আগেই কুমার কথা কইলে, এমন ভাবে কইলে যেন কৃষ্ণার কথায় কোন ছেলেমানুষী—কোন অপরিণতি নেই, যেন সে ওদেরই মত একজন সাধারণ—বড়।

কুমার বললে,—"সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে এর ঠিক তুলনা করা চলে কি? আমার মনে হয়, চলে না। কারণ সাউথ আফ্রিকায় কাল-নির্যাতন সরকার

নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখানে সরকারের দিক থেকে কোথাও কোন আপত্তিকর ব্যবস্থা নেই। কতকগুলি লোক যদি কোন কারণে স্ট্রাইক করে, তবে আমাদের পক্ষেও সরকারের দিক থেকে কিছু করা যায় না।"

—"কিন্তু শুধু এই ত নয়।" রমলা বলে,—"বাড়ীভাড়া নিয়ে কি কাণ্ড হল বল ত। কালো চামড়ার জন্যে কি দুর্ভোগ।"

কুমার জিতেছে—এরই নাম সূক্ষ্ম প্রপাগাণ্ডা। কুমার কৃষ্ণার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা বলায় রমলাও বলেছে। ওরা হঠাৎ ভুলে গেছে যে, ওরা কৃষ্ণাকে ছেলেমানুষ মনে করে। কুমার যে ইচ্ছে করেই ওকে এই মর্যাদা দিয়েছে, সেটা না বুঝেও চকিতের জন্যে কুমারকে একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টির অর্ঘ্য দিয়ে টেবিলক্লথটা তুলে রাখল কৃষ্ণা।

কুমার বললে,—"বাড়ীভাড়ার ব্যাপারেই বা কে কি করতে পারে বল। আমার বাড়ী আমি যাকে ইচ্ছে ভাড়া দেব।"

—"তাইত বলছি।" রমলা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, "এই ধরনের ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করা চলে না বলেই তা আরো অসহ্য। মনের মধ্যে হুল ফুটিয়ে দেয়, পালটা হুল ফোটাবার কোন উপায় না রেখেই।"

—"এই রে! রমলা আবার ক্ষেপেছে।" মামাবাবু হেসে ওঠেন, এই বুদ্ধধর্মের দেশে বসে তুই হুলের বদলে হুল ফোটাতে চাইছিস। একেবারে a tooth for a tooth and an eye for an eye-এর ব্যাপার।"

—"আঃ হাঃ।" রমলার মুখে হেসে ওঠে শাণিত বিদ্রূপ—"আঃ হাঃ! যিশুর কথা এদেশে, ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও বোধহয় বেশী বেমানান। বেচারা য়িহুদীরা তবু দাঁতের বদলে দাঁত নিত। এ যুগের খৃস্টানরা বদলি না দিয়েই দাঁতটি তুলে নেয়।"

রমলা রেগে গেলে সাধারণতঃ এরা চুপ করে যায়, কিন্তু আজ কুমার তর্ক তুললে। বললে,—"শুধু কি খৃস্টানরাই করে? বৌদ্ধ জাপান চীনের ওপরে কি কম অত্যাচারটা করেছে?"

—"এ নিয়ে তর্ক তুলে লাভ কি?" মামাবাবু হাসলেন, "এ ত পৃথিবীর সবত্রই চলেছে, শুধু আজ নয়—চিরকালই। তারই মধ্যে থেকে থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মহামানব জন্মে গেছেন। তবু আজও মানুষ সভ্য হতে শেখেনি। আজও সুযোগ পেলেই তাদের বন্যস্বভাব জেগে

ওঠে। তখন বাঘের মত পরস্পরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন বাধা থাকে না।"

—"আপাততঃ আমাকে একটু কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হবে। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে ফিরে এসে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।"

—"আর তোর জিনিস যদি আমি গুছিয়ে দিই? খুব ক্ষতি হবে কি তাতে?" রমলা বললে,—"ছোট বেলায় ত সবই আমাকে গুছিয়ে দিতে হ'ত। এই ক'বছর বিলেতে থেকে হঠাৎ স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিস?"

—"তা যাই বলিস্।" কুমার উঠে দাঁড়াল,—"এদেশে আর কিছু না শিখি ত স্বাবলম্বী হতে যে শিখেছি, সেটা তোকেও স্বীকার করতে হবে রমু।"

—"তা করছি, কিন্তু এও ভাবছি এত স্বাবলম্বী হতেই বা শিখলি কি করে? শিক্ষিকা কেউ ছিল নাকি?"

—"কে জানে!"

কুমার হাসল, কৃষ্ণাও হাসল। আর দুজনেরই হাসির মধ্যে একটু অলক্ষ্যপ্রায় কালোছায়া দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। কুমারের মুখে বেদনার আর কৃষ্ণার মুখে ভয়ের। ছিল কি সত্যি? কে জানে?

কুমার বললে,—"এদেশের মেয়েরা ছেলেদের স্বাবলম্বী হওয়াই পছন্দ করে, মানে তোদের মত গোটা পুরুষ জাতটাকে পকেটে পুরে, থুড়ি, আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিয়ে চাবির গোছার মত ঝনাৎ করে পিঠের উপরে ফেলে বেড়াতে চায় না। এরা যেমন নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা ভালবাসে, তেমনি ছেলেদেরও পরাধীন করে রাখতে চায় না।"

—"বাবাঃ এত।" রমলার মুখে হাসির মধ্যেও বিস্ময় কম ফোটে না,—"এত গুণগানে মুখরিত করে তুলল কে শুনি? সত্যি বল না, আছে নাকি কিছু এর মধ্যে?"

—"হুঁ হুঁ।" কুমার হাসল, আর কৃষ্ণার বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল। কুমার হাসতে হাসতে বললে,—"সময় হলেই জানতে পারবে।"

মামাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।"

—"তিতিকে তাহলে তুমিই নিয়ে যাও মামা, আমি তাহলে মিস্ ম্যানিংয়ের কাজটা সেরে আসি। আজ না হলে আর সময় হবে না।"

—"বেশ ত", মামা বললেন,—"তুমি যাও না তোমার সেই বৃদ্ধাকুমারী সঙ্গিনীর কাছে। আমি পার্থকে তার টীচারের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ফেরার সময় তুলে নিয়ে, একেবারে ওর স্কুলের পোশাকের মাপ দিয়ে ফিরব।"

রমলা বললে,—"বাঁচালে মামা, আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি আর পার্থ তা হলে পথে কিছু খেয়ে নিও, কুমারের ট্রেন ত চারটে বাইশে, আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসব।"

কুমার বললে,—"দুঃখিত, আমি এখন বেশ কিছুদিন তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারব না।"

—"যেন এতদিন সারাক্ষণ আমাদের কাজে লেগেছিলে?" রমলা হাসল।

—"আরে, আমার উপস্থিতিতেই তোমাদের অনেক কার্যসিদ্ধি। কি বল মিঃ পার্থসারথি?"

কুমারের এতক্ষণের ম্লান হাসি হঠাৎ যেন জোর ফিরে পেল। শুনে কৃষ্ণার ইচ্ছে করতে লাগল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কিছুতেই নতনয়ন তুলতে না পেরে একদৃষ্টে রমলার সুগঠিত আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

মামা বললেন,—"আরে, কৃষ্ণারাণীও ত আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন, ঐ পথে ত পড়বে।"

চমকে কৃষ্ণা মুখ তুললে,—স্কুল?—না, আজ নয়। আজ কোন কর্তব্যে মন নেই, আজ কোথাও বেরুতে একটুও ইচ্ছা করছে না ওর। আজ ও একটু একলা থাকতে চায়, এই মুহূর্তে ওর সমস্ত প্রাণ চাইছে, তার নিজের ঘরে জানালার ধারে গিয়ে নিঃশব্দে একটু বসতে। এখন সে ঘরের বাইরে পাদমেকংও যাবে না। হঠাৎ একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ফেলল কৃষ্ণা,—"আজ ত স্কুল নেই, ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে। মিস রথচাইল্ডের কি একটা যেন কাজ আছে।"

—"তবে?"

—"আমি বাড়ীতেই থাকব। কিছু কাজ দিয়েছেন বাড়ীতে করতে, সেগুলি সেরে রাখব।"

সবাই চলে গেলে কৃষ্ণা নিজের ঘরে এসে জানালার ধারে কুশন চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে ধোঁয়াটে আকাশটার দিকে চেয়ে দেখল।

আজ সকাল থেকে ঘন কুয়াসার স্তূপ যেন চারিদিকে ঝুলে রয়েছে। বসন্তের শুরু —তবু আকাশ পৃথিবী সব যেন একেবারে লেপেপুঁছে এক করে দিয়েছে। তার মধ্যে ওরা সবাই যে-যার পথে চলে গেল। এক দিকে কুমার অন্য দিকে রমলা,—আর একটা অন্য দিকে মামাবাবু আর তিতি। কুয়াসার মাঝে মাঝে গাছের ছায়াগুলি গাঢ়তর আর একটা আবরণ পরেছে যেন।

হঠাৎ-পাওয়া এই একলা বসে থাকাটুকু কৃষ্ণার ভাল লাগছে। এই অকারণ মিছিমিছি জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকা আর শুধু চেয়ে থাকা।

ধীরে ধীরে কখন যে কুয়াসা গলে ঝিরঝিরে বাদলা শুরু হয়ে গেছে, কৃষ্ণার অন্যমনা চোখ তা টের পায় নি। শুধু কি যেন একটা অলক্ষিত কষ্টে মনের ভিতরটা টনটন করে উঠেছে। বিশেষ কোন কারণে নয়, বিশেষ কোন ভাবনায় নয়। তবু শুধু শুধুই মন যেন কেমন করছে, কেন কে জানে? হঠাৎ এদের সঙ্গে এই দূর দেশে পাড়ি দিয়ে কেন এল কৃষ্ণা? এরা কেউই ত ওর তেমন আপনার নয়। বিধবা মামী আর তার বাপের বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে, তাকে মা-বাপ পাঠালেন কেন?

হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম অভিমান ওর মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল আর বাড়ীর জন্যে মনটা দুলে উঠল। অবশ্য রমলাকে কেউ বিধবা বউ বলে মনে করে না ওদের বাড়ীতে। না, সকলেই তাকে ভালবেসে এখনও সকলে কর্ত্রীপদই দিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণার মা ত রমলার আপন ননদ, তবু তাকে ভালবাসে। এটা বেশ একটু আশ্চর্য ব্যাপার—বাঙালীর সংসারে এ রকম ঠিক হয় না, তবু যে তা সম্ভব হয়েছিল ওদের বাড়ীতে সে কি রমলার গুণ, নাকি ওদের বাড়ীর? কি জানি কার, সেকথা ভেবে লাভ কি? কিন্তু মামীর কথা ভাবতে গেলেই থেকে থেকেই ওর নিজের মামাকে মনে পড়ে যায়। কি হাসিখুশি মানুষ ছিলেন, আর কি রসিক। মামার জন্যেই সকলে রমলাকে এত বাড়িয়েছে—

মামা যে ওকে মাথার মুকুট করেছিলেন—এই খবর অন্য সকলের চোখেও ওকে সেই মর্যাদাই দিয়েছিল। ওর গৌরব বাড়িয়ে দিয়ে মামা নিজে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চাইতেন, মামার ভালবাসা যে কত গভীর আর কত তীব্র ছিল, আজ হঠাৎ যেন তা কৃষ্ণার বোধের সীমানায় এসে পৌছল। মামীর বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ, বিদ্যে যতই বিস্তৃত হোক না মামার মত আনন্দ নেই তাঁর—ভালবাসাও নেই বোধহয়। এমন কি মামার কাছে এসে মামার স্নেহের এই অতলস্পর্শের মধ্যে ডুবে থেকেও রমলা কেন পূর্ণতা পেল না জীবনে—কেন এখনও ওর মধ্যে অসহিষ্ণু ক্ষোভ ক্রুদ্ধ বিদ্রোহে ঝটাপটি বাধিয়ে দেয়? অবাক হয়ে কৃষ্ণা ভাবে, চারিদিক থেকে এত আদর, এত প্রেম, এত শ্রদ্ধা পেয়েও কেন রমলার জীবন ভরে ওঠে নি। এত শ্রদ্ধা, এত মনোযোগই বা কি করে ও টেনে নেয় লোকের কাছ থেকে, তাও জানে না কৃষ্ণা। এই ত এখানে আসামাত্র তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে মার্কাসের মধ্যে। ওই লোকটি যে এরই মধ্যে রমলার জন্যে নিজের মনে একটি বিচিত্র আসন পেতে বসেছে—সেকথা বুঝতে কারুর দেরি হবার কথা নয়। কৃষ্ণা লক্ষ্য করেছে অনেকবার—রমলা যখন কথা বলে মার্কাসের চোখ যেন তাকে আরতি করে। কেন রমলার এত বেশী প্রাপ্য—শুধু কি রূপ আর তীক্ষ্ণতা? তাই হয়ত। নইলে কৃষ্ণার বয়স ত আরও অনেক কম, তবু কেউ যেন তাকে লক্ষ্যই করে না। পিয়েত্রো যদিও মাঝে মাঝে একটু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃষ্ণা বেশ বোঝে সে কেবল বাইরের। সব কমবয়সী মেয়েদেরই ওটুকু প্রাপ্য—অন্ততঃ এদেশে। কৃষ্ণার সঙ্গে হয়ত ওর একটু ভাব করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তা ছাড়া যে কৃষ্ণার জন্যে এতটুকু ত্যাগ করতে পিয়েত্রো কখনও এগিয়ে আসবে এমন মনে হয় না কৃষ্ণার। অথচ রমলাকে এতটুকু খুশী করতে মার্কাসের আগ্রহ লক্ষ্য না করে উপায় নেই। সত্যি কৃষ্ণাকে কেউ ভালবাসে কি? মা-বাবা ছাড়া আর কেউ? কে জানে—রমলা হয়ত বাসে—অন্তত এককালে বাসত যখন ওর মামা বেঁচেছিল—টুক্‌রো-টাক্‌রা কত সোহাগে ওরা দুজনে ওকে ভরিয়ে রাখত। যখন-তখন খেলনা, পুতুল, টফি, লজেন্স আর নানা উপলক্ষে নতুন জামা-কাপড়। রমলার যখন বিয়ে হয় কৃষ্ণার বয়স তখন সাত। টুকটুকে রাঙা বউ নতুন বৌকে কৃষ্ণা সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকত। মনে আছে, মামা

যখন কেমন একরকম ভাবে তাকিয়ে রমলার দিকে এগিয়ে আসতেন, কৃষ্ণা তখন তার ছোট দু'হাতে মামীকে আড়াল করে চেঁচিয়ে বলত,—"না না, খবরদার মামীর গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

শুনে রমলা দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠত,—"ঠিক করেছ কৃষ্ণা, মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছ ত ?"

ওদের সেই নতুন বিয়ের দিনগুলি কৃষ্ণার চারিদিক ঘিরে চন্দনের ধূপের মত ঘুরে ঘুরে উঠত, ধোঁয়ার মতই আজ তারা কোথায় উড়ে গেছে। সেই সঙ্গেই কৃষ্ণার দিনগুলিতে পড়েছে ম্লান ছায়া। ওর এই উনিশ বছরের জীবনটাও তেমন রঙীন হয়ে উঠতে পারছে না। মামা নেই, মামার সেই আনন্দ নেই, কে আর ওকে ভালবাসবে ? এই দাদুও যেন ওকে আর তেমন করে ডাকেন না। উনি যে রমলার মামা, তাই উনিও রমলাকেই বেশী ভালবাসেন। কৃষ্ণার কথা বোধ হয় একবার মনেও হয় না। মাও ওকে কতখানি ভালবাসেন কে জানে। কেবলই ত সংশোধন করে চলেন—ওকে দেখতেই ওর দোষগুলি মায়ের চোখে পড়ে যায়, যে যেখানে আছে সকলের গুণাবলী শুনিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই ওকে কেবল মানুষ করে চলেন। আর বাবা ? বাবার কথা যেন তেমন করে মনেই পড়ে না। মনে পড়লে বাবাকে ভালই লাগে কৃষ্ণার, কিন্তু বাবার তাকে কেমন লাগে কে জানে ? হয়ত কিছুই লাগে না, মনেই পড়ে না হয়ত কখনও। আসলে তিনি কাজের লোক। কাজের ফাঁকে কখন যে বাড়ীতে আসেন আর কখন যে বেরিয়ে যান তা অনেক সময় টেরও পায় না ওরা। খানিকটা ভয়ও যে না করে বাবাকে তাও নয়, কিন্তু ওটা ভয় না অপরিচিতির শঙ্কা ? বাবা যেন প্রায় অপরিচিত ওদের কাছে। বাবার কাছে যা কিছু পাওনা সবই আসে মায়ের হাত দিয়ে। কাজেই বাবাকে ওরা তেমন চেনেই না। বাবাই কি ওদের চেনেন ? হয়ত চেনেন তার নিজের মতন করে। কিন্তু—কিন্তু ভালবাসার সময় নেই তাঁর। ভালবাসা হচ্ছে বিলাসী-মনের ভোগ, তাঁদের মত শ্রমিকধর্মী মনের জিনিস নয়। ঠিক এই কথা না হোক—এই ধরনের কথা বাবার মুখে সে শুনেছে মায়ের অভিযোগের উত্তরে। ভাল না বেসেও বাবার বেশ চলে যায়—এমনকি বোধহয় ভালবাসা না পেয়েও, কিন্তু কৃষ্ণার চলে কি ? না না না, ওর চলে না—একেবারেই না। ভালবাসার

ভরে আছে ওর মন। ও ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু কাকে দেবে, কেউ ত এগিয়ে আসছে না অঞ্জলি পেতে। কুমার? না না, কুমার নয়, কুমার ওর কথা ভাবেও না, বেশ বুঝেছে কৃষ্ণা। সে বোকা, নেহাৎ বোকা। তাই একবার ও ভেবেছিল বুঝি কুমারের ওকে ভাল লেগেছে, তাই ওকে ও মনের মত করে তুলতে চায়। না না, মিথ্যে কথা। ও সবকিছুই ওর ক্ষণিকের খেয়াল। কৃষ্ণা বেশ বুঝেছে, কাল রাতে কুমারের জীবনে অথবা মনে কোথাও একটা বিষম ওলট পালট হয়ে গেছে। কি ব্যাপার, জানতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণার—ইচ্ছে হয়, একটু সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে অসম্ভব। সুযোগ পেলেও কৃষ্ণা ওসব কোন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু—

আর বেশীক্ষণ কৃষ্ণার এই একা বসে ভাবনাবিলাস চালানো উচিত কি? উঠে কিছু করা উচিত নিশ্চয় ওর। লাঞ্চটা তৈরি করে রাখলে হ'ত, কিন্তু সবাই ত বললে খেয়ে আসবে। কুমার অবশ্য কিছু বলে নি, কিন্তু সেও খেয়ে আসবে। নিশ্চয়ই আশা করবে না যে, কৃষ্ণা তার জন্যে খাবার তৈরি করে রাখবে। তবু ও যখন বাড়ীতেই রইল, ওর উচিত ছিল সবাইকে একবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা। আঃ ও যদি রমলার মত যোগ্য হতে পারত, সকলের সব প্রয়োজন না বলতেই বুঝে নিতে পারত। দক্ষতার সঙ্গে সকলের জন্যেই কিছু না কিছু করতে পারত—দিতে পারত সবাইকে ওর নিজের বুদ্ধির আশ্রয়, তবে কেউ ওকে অবজ্ঞা করতে পারত না। কিন্তু এসব কথা কিছুতেই ঠিক সময়ে ওর মাথায় আসে না। বেশীর ভাগ সময়েই মনটা অন্যমনস্ক হয়ে কোন খেলায় মেতে থাকে, কেউ কিছু স্পষ্ট করে না বললে নিজে থেকে কোন কথাই যেন খেয়াল হতে চায় না। নইলে বাড়ীতেই যখন রইল, অন্ততঃ কুমারের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবার প্রস্তাবটাও ত ও করতে পারত!

কিন্তু যদি তাতে কেউ কিছু ভাবত? মামা যদি হঠাৎ বাঁকা চোখে হেসে উঠতেন, রমলা যদি অবাক হয়ে চাইত? কুমার যদি বলত, দরকার নেই—তা হলে? তা হলে মরমে মরে যেত কৃষ্ণা। কিন্তু না বলেও ত ও কুমারের জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারে! যদি সত্যি সুন্দর করে সব গুছিয়ে রাখে—কুমার ফিরে আসার আগেই। তবে বেশ হয়! ক্লান্ত হয়ে বাড়ী

ফিরে যদি দেখে কেউ সুন্দর করে তার বাক্স গুছিয়ে রেখে দিয়েছে, তবে খুশী হয় না এমন পুরুষ বিরল।

ধীরে ধীরে কুমারের ঘরের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল কৃষ্ণা। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। একবার মনে হ'ল ঢোকা উচিত কি? আবার মনে হ'ল, কি হবে, কেউ ত নেই। ভারী পর্দাটা নিষেধের মত স্তব্ধ অনড়। আজ হঠাৎ নিষেধ অমান্য করার দুরন্ত স্পৃহা, ওর মনের সূক্ষ্ম নীতিবোধের মাপকাঠিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। যাই না একবার, কি আর হয়েছে কেউ ত আসছে না।

টুপ করে পর্দা সরিয়ে একমুহূর্তে ঘরে ঢুকে পড়ল কৃষ্ণা, আর সেই চমৎকারিত্বের গৌরবে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখল। সামনেই কুমারের একাকী শয্যা দলিত মথিত চাদরে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন এঁকে পায়ের কাছে লেপ-কম্বলের স্তূপ নিয়ে পড়ে আছে। আর টেবিলের উপরে দুটো সুটকেস। ওয়ার্ডরোবের দরজা খোলা। কুমার হয়ত সকালেই জিনিস প্যাক করে নেবে ভেবেছিল। তার পরে ঠিক করেছে, কাজ সেরে এসে করবে। একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণা কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল। প্রথমেই একটা সুটকেস মাটিতে কার্পেটের উপরে নামিয়ে রেখে অন্য সুটকেসটা ভাল করে টেবিলের উপরেই রাখল। ওয়ার্ডরোব থেকে প্রথম স্যুটটি বার করে বিছানার উপরে রেখে সমস্যায় পড়ল কৃষ্ণা। হ্যাঙার থেকে কোটটা বার করে হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল কৃষ্ণা। কোট ভাঁজ করতে জানে না সে, ট্রাউজার ত আরও না। যদি ক্রীজ পড়ে যায়। বাবার জামা কাপড় রাখে তাঁর বেয়ারা, আর তার উপরে তদ্বির করেন মা। কাজেই স্যুট ভাঁজ করার কায়দা কৃষ্ণা শেখে নি, কিন্তু ভাঁজ ঠিকমত না হলে যে উল্টো বিপত্তি হয়, তা সে বাবার কাছে শুনেছে। ছি ছি, কেন এল মিছিমিছি! স্যুটটা ওয়ার্ডরোবে তুলে দিয়ে যেমন এসেছে তেমনি পালিয়ে যাবে ভাবল কৃষ্ণা। চুপি চুপি, কেউ জানবে না। হঠাৎ দেখে বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে আছে একটা চক্‌চকে ফটোস্ট্যাণ্ড—কার ফটো? সকালের সেই হাসিঠাট্টার টুকরো কথাগুলি কৃষ্ণার মনে পড়েছিল কি না কে জানে। কিন্তু ওর হাত গিয়ে সেই স্ট্যাণ্ডটা বালিশের তলা থেকে অনায়াসে টেনে বার করে আনল। কে এই মেয়েটি? কোনদিন দেখে নি ত, কুমারের

করেছে শোনেও নি নাম। ঘাড়ের কাছে চুলের কুণ্ডুলী সাপের মত গোল হয়ে রয়েছে। তারার মত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সারা রাত ওর বালিশের নীচে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে কানে কানে কি কথা বলেছে কে জানে? কেন কুমার এই ছবি নিয়ে শুয়েছিল রাতে? বোধ হয় হাতে নিয়ে দেখছিল, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই, কিন্তু মেয়েটি কে? কৃষ্ণা ভুলে গেল যে, ও ঠিক করেছিল, এই মুহূর্তে এ ঘর থেকে চলে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে বিছানার একপাশে বসে পড়ে কৃষ্ণা ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। অনেক উৎসাহ নিয়ে জিনিস গোছাতে এসেছিল। হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম বিষাদের তীব্র রেখা মনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে ওকে যেন আচ্ছন্নপ্রায় করে দিল। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল সেই লাইনটা—সখ্যাৎ তে মা যোষং সখ্যান্ মে মা যোষ্ঠাঃ—তুমি আমার চিরজীবনের বন্ধু হও, আমিও যেন তোমার চিরসাথী হই। তার পরের সংস্কৃত পদটা কৃষ্ণা মনে করতে পারল না, কিন্তু মানেটা মনে পড়ল—আমাদের এ বন্ধুত্ব যেন অন্য নারীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়।

টুকিটাকি কাজ সেরে ঘরে ফিরতে কুমারের প্রায় বারোটা বাজল। তাড়াতাড়ি দশ মিনিটে প্যাক করে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নেবে ভেবেছিল কুমার। রবারসোলের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এদেশের অভ্যাস মত আস্তে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দেখে, মেরীর ছবি হাতে করে স্বপ্নচ্ছন্নের মত বসে আছে কৃষ্ণা। আর চারিদিকে কুমারের অসংস্কৃত ঘর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে।

এক মুহূর্ত অবাক হয়ে গেল কুমার। পরেই বুঝতে পারল, বোধ হয় ওর জিনিস গুছিয়ে দেবার সদিচ্ছায় বশবর্তী হয়েই কৃষ্ণা এ ঘরে এসেছে। আর এসেই মেরীর ছবিটি আবিষ্কার করেছে। তা করুক, কিন্তু ছবিটা হাতে করে ভাবছে কি?

কুমার ঘরে ঢুকল একটু শব্দ করে। চমকে মুখ তুলল কৃষ্ণা, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখ। ছবিটা হাত থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচত কৃষ্ণা, তা পারল না, বরং শিথিলমুঠি-হাত থেকে সেটা আপনি খসে পড়ল কার্পেটের উপর। কুমার দেখল, কৃষ্ণার পায়ের কাছে মেরীর ছবিটা নিতান্ত নির্বিকার ভাবে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ছবিটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা। অল্প সেই সময়টুকুর মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল ওর একটু আগের মুছে-যাওয়া হাসি। বললে,—"নিতান্ত পরোপকারের বাসনায় আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সব প্যাক্-ট্যাক্ করে রেখে আপনাকে অবাক করে দেব, তা আপনি সে সুযোগ দিলেন না, আগেই এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ এই চমৎকার ছবিটি দেখতে পেলাম। ভারি সুন্দর দেখতে মেয়েটি—কে?" কুমারের মুখের উপরের কৃষ্ণার বড় বড় চোখ দুটো মস্ত জিজ্ঞাসা ভরে চেয়ে রইল। সেদিকে চোখ ফেলল না কুমার, কৃষ্ণার হাত থেকে ছবিটি নিয়ে সযত্নে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল। কুমার বলল,—"ওর নাম মেরী ডিকসন, না, ডিকসন নয়, এখন হয়ত অন্য কিছু।"

"তার মানে? ও! এখন বুঝি বিয়ে করে অন্য নাম নিয়েছেন?

—"হ্যাঁ, তাই ত মনে হ'ল।"

—"মনে হ'ল মানে?

—"মানে, সেই রকমই বোধ হ'ল।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ—কিছু নেই।"

কুমার ঘাড় নাড়িয়ে বিলিতী কায়দায় হাসল। এই কায়দাটা কৃষ্ণার মোটেই ভাল লাগে না। ইচ্ছে হ'ল, সেদিনের হাঁটতে শেখানোর প্রতিশোধ নেয়, বলে,—ঐ ঘাড় নাড়াটা বিলিতী ফ্যাশান বটে, কিন্তু আপনাকে মোটেই মানায় না। কিন্তু বলতে পারল না।

কুমার বললে,—"তা হলে এস, আমিও তোমার কাজে হাত লাগাই। নইলে এগুলি বোধহয় কালও গোছান হয়ে উঠবে না।"

কুমারের সহজ কথা কৃষ্ণার মনের মধ্যে আবার এসে বেঁকে বেঁকে গেল। ভাবলে—আবার তাকে হারতে হ'ল, সে যে ভেবেছিল, একাই সব গুছিয়ে শেষ করবে—তা আর হ'ল না। তা না হোক, দু'জনে মিলে কাজ করায় খুব তাড়াতাড়ি প্যাকিং শেষ হয়ে গেল।

ছুটোছুটি করে কাজ করায় অগোছালো বেশবাসে আর ঈষৎ এলোমেলো চুলে, কৃষ্ণার চেহারায় এমন একটা দীপ্তি এসেছিল, যা দেখামাত্র

মনকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে দেয়। সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল কুমার। বললে,—"ধন্যবাদ, তুমি না থাকলে আরও ঘণ্টাখানেক আমায় এখানে হাবুডুবু খেতে হ'ত।"

—"তা না হয় হ'ল, কিন্তু আপনার খাবার একটা ব্যবস্থা এখন করা উচিত নয় কি? ঘরে রুটি আছে, ডিম আছে, টম্যাটো আছে। আর একটা ছোট মাংসের টিন খুলব?"

—"তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়?" কুমার বললে,—"বাইরে ত চলেই যাচ্ছি, চল না একটু পিক্‌নিক্ করি।"

—"পিক্‌নিক্?" কৃষ্ণার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—"পিক্‌নিক্—শুধু দুজনে? সে কি রকম?"

—"হাঁ, শুধু দুজনেই। ক্ষতি কি? আপাততঃ আর কেউ যখন ধারে-কাছে নেই। মোট কথা, বাইরে এমন ঝিকিমিকি রোদ উঠলে ঘরে বসে খাবার আয়োজন করা রীতিমত পাপ। তা ছাড়া এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে বসে এই দারুণ ক্লান্তিকর কাজ করে, একেবারে হাঁপিয়ে গেছি। তুমি না থাকলেও আজ আমি বাইরে কোথাও গাছের ছায়ায় বাগানের কোণে বসে স্যাণ্ডউইচ খেতাম, আর পরের কুকুরের দিকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতাম। এখন তোমাকে দেখে লোভ হচ্ছে, দু'জনে মিলে পিক্‌নিক্‌টা জমবে ভাল। একলা হলে শুধু খাওয়াই চলত। দু'জনে মিলে সেই জিনিসটাই হবে আনন্দ অর্থাৎ পিক্‌নিক্। তা ছাড়া তুমি আমার এত কাজ করে দিলে, তার বদলে যদি তোমাকে একটু স্যাণ্ডউইচ খাবারও নেমন্তন্ন না করি তা হলে সেটা কি দারুণ অভদ্রতা হয় না?"

ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা জানে না কৃষ্ণা, কিন্তু প্রস্তাবটা মনোরম সন্দেহ নেই। কৃষ্ণা বললে,—"ধন্যবাদ।"

ও কোট পরতে চলে গেল নিজের ঘরে। কোট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করতে করতে ওর মনে হ'ল—কাজটা হয়ত ভাল হচ্ছে না—না যাওয়াই উচিত। কিন্তু অন্য মনটা তখুনি বললে—এখানে ত এমনই ঘোরাটাই রেওয়াজ! সবাই ত যায়, গেলে ক্ষতি কি? দুটো মানুষ, একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যদি বাগানে বসে দুটো স্যাণ্ডউইচ খায়, তাতে অন্যায় কোথায়? ভাগ্যক্রমে পুরুষ এবং স্ত্রী হয়ে জন্মেছে বলে কি মানুষের

সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? কৃষ্ণার লোভী মনটা আধুনিক নীতিকথার বেত উঁচিয়ে কৃষ্ণার সেকেলে মনটাকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিল।

ঘর থেকে বেরিয়েই সামনের বড় রাস্তা দিয়ে ডান দিকে একটু দূর গেলেই, একটা ছোট্ট সাদা স্যাণ্ডউইচের দোকান। যত ছোট তত পরিচ্ছন্ন, তত পরিপাটি। এ দোকানটা ওদের বাড়ীর সকলেরই খুব প্রিয়। কতদিন ওরা এখান থেকে স্যাণ্ডুইচ কিনে নিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সেরেছে। এর পাশেই একটা ছোট মিষ্টির দোকান, আর তার বাঁ দিক ঘেঁষে এক পা গেলেই সব্জির আর বড় রাস্তাটা পার হয়ে উলটো দিকে একটা বাঁধান গলি দিয়ে এক; এগুলেই বাগানের গেট। ওরা সেই ছায়াভরা পথ দিয়ে বাগানে এসে পৌঁছল

হঠাৎ-পাওয়া রোদে বাগানটা তখন ঝলমল করছে। কুয়াসা-গলা আকাশ ধোয়া নীলে মুহূর্ত আগের ঝাপ্‌সা আকাশটাকে যেন আর চেনা যাচ্ছে না। অদূরে কারুকার্য করা কাঠের ঢাকা মন্দিরে "এলবার্টের" মূর্তির কালো পাথর আলো পেয়ে জ্বলছে।

পরিবেশটা অতীব রোম্যান্টিক সন্দেহ নেই, কৃষ্ণা ভাবল। কি যেন একটা নরম নরম উত্তেজনা ওকে ভিতরে ভিতরে তপ্ত করে তুলছিল। সেই মৃদু উত্তাপকে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত করে তাকিয়ে দেখল, কুমারের কপালের উপরে উল্‌টানো ব্রাশকরা চুলের সীমানায় সূর্যের সাত র একটা সরু রেখায় চিক্‌চিক্‌ করছে। সমস্ত মিলিয়ে উজ্জ্বল দিনটা আলস্যমন্থর হয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায়, ঝোপের ধারে ধারে পড়ে আছে। তারই মাঝখানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে বসে কুমারের সামনে স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে লজ্জা করছিল কৃষ্ণার। কিন্তু লজ্জা করছে দেখানটাই লজ্জা।

কুমার বললে,—"তোমার কাছে একটা অপরাধ অনেক দিন ধরে করে আসছি কৃষ্ণা। অনেকবারই ভেবেছি সেটা সংশোধন করা উচিত, সুযোগ মেলে নি। তা ছাড়া একটু সঙ্কোচও যে, হয় নি, তা বলতে পারি না কিন্তু আজ চলে যাবার আগে মাপ চাওয়া উচিত—"

—"ব্যাপার কি?"

কৃষ্ণার বিস্মিত জিজ্ঞাসার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কুমার বললে,—"ব্যাপার এমন কিছু ভয়ানক নয় অবশ্য, কিন্তু অন্যায়। আমি অন্যদের কথাবার্তায়

আর প্রথম দেখায় ভ্রান্ত হয়ে তোমাকে খুব ছেলেমানুষ ভেবেছিলাম, আর তাই অসঙ্কোচে অন্যদের মতই 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম যত ছেলেমানুষই হও না, আপনি হবার মর্যাদা তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একবার বলে ফেলে আবার—"

উদ্গত হাসির উচ্ছ্বাস মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাতে চেষ্টা করল কৃষ্ণা, কিন্তু পারল না। সঙ্গে সঙ্গে কুমারও হাসল। বলল,—"হাসি নয়, সত্যি।"

—"কি সত্যি ?"

—"মানে আবার তোমাকে আপনি শুরু করা চলে কিনা ভাবছি।"

—"না, চলে না। এ ব্যাপারে, অর্থাৎ এই আপনি-তুমির চলাচলে ক্রমোন্নতি অসিদ্ধ। এক্ষেত্রে অবনতির পথটাই প্রসিদ্ধ। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামাই চল,—তুমি থেকে আপনিতে ওঠা নয়। কাজেই আপনি নির্ভয়ে 'তুমি' চালিয়ে যান। আমি জানব, আমি বড় বলে আপনি ভয় পান নি।"

—"তা হলে তুমিও ভয় করো না, 'তুমি' চালাও, না হলে সমমর্যাদা হবে না।"

লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণা বললে,—"কি দরকার সমমর্যাদার ? আপনি বয়েসে ত অন্ততঃ আমার চেয়ে অনেকটাই বড়।"

—"ঈস, আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিলে।" কুমার হাসল। নিশ্বাস ফেলে বললে,—"আর ও তর্কে কাজই বা কি ? আর যে তোমার সঙ্গে বেশী দেখা হবে এমন ত মনে হয় না। আর বছরখানেকও আমার মেয়াদ নেই। ইতিমধ্যে রমলার সঙ্গেও যে ঘন ঘন দেখা করতে পারব তাও নয়।"

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। কুমার যে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যাবে, আর হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হবারই উপলক্ষ্য ঘটবে না—এ খবরটা কৃষ্ণার মনে তেমন করে থিতিয়ে বসতে পারল না। শুধু অদ্ভুত একটা অস্ফুট সুখ, না-চেনা একটা অন্যমনস্ক ভাললাগা কুমারের সান্নিধ্যের মত কৃষ্ণাকে আচ্ছন্ন করে রইল। কুমারের মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করল কৃষ্ণার, নির্জন দুপুরের মোহমাখা লজ্জা। তাই চোখ মেলে চারিদিকে তাকাল কৃষ্ণা।

দেখল—এধারে-ওধারে নানা দিকে নানা সাজের, নানা বয়সের জোড়ায় জোড়ায় নরনারী শুয়ে-বসে আড্ডা দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার মুখ লাল

হয়ে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল, ও নিজেও যেন ঐ রকম আর একটা জোড়ার অন্তর্গত। আজন্মসঞ্চিত সূক্ষ্ম একটা অপরাধবোধের সংস্কার ওকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল এ অন্যায়। এই নির্জনে কুমারের সঙ্গে পিক্‌নিক্ করতে আসা ওর উচিত হয় নি। চারিদিকে সঘন প্রেমের প্রকাশ।

ইচ্ছে হ'ল এখুনি উঠে ছুটে পালিয়ে যায় কিন্তু সেটা আরও লজ্জার হবে বলে চুপ করে বসে রইল। ভাবল বসে, ঢের পিক্‌নিক্ হয়েছে, এবারে বাড়ি চলুন। বলতে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণা। কুমারের দিকে চেয়ে কথা আটকে গেল। এতক্ষণের জোর করে টেনে আনা হাসির রেখা মুছে গেছে ওর মুখে। সমস্ত চেহারায় সকালের দেখা সেই তীব্র বেদনার ছাপ। যেন কি একটা ভীষণ কিছু হয়ে গেছে ওর জীবনে। ও একটা ঘাসের শীষ নিয়ে দাঁতে কাটছিল, আর ওর চারিপাশ ঘিরে শীত-শেষের নতুন দিনের হাওয়া আর বৃষ্টিধোয়া নতুন আকাশের রং বৃথাই ঝরে ঝরে পড়ছিল, ওর মন ছিল কোথায়, কত দূরে কে জানে? চারিপাশের প্রেমদৃশ্য যে ওর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে এমন মনে হ'ল না, ওগুলি যেন ওর চোখেও পড়েনি। কিছুই যেন ও দেখছে না। কি একটা বোবাকষ্টে ওর সমস্ত মুখ যেন থমথম করছে।

অনেকক্ষণ ধরেই কৃষ্ণার ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা কাজ করছিল, ও আর থাকতে পারল না, বললে,—"আপনার কি হয়েছে বলুন।"

কুমারের প্রাণটাও হাঁফিয়ে উঠেছিল কারুর কাছে প্রাণ খুলতে না পেরে। মনের অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, অন্য কোন মনের ছোঁওয়া না পেলে বুঝি আর টেঁকে না—আজকাল এইটেই কুমারের সবচেয়ে কষ্ট। কোন বন্ধু নেই, কোন সঙ্গী নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়। যে যতই আত্মীয় হোক, সবাই যেন বাইরের লোক, বাইরের সব নিয়েই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা। অন্তরঙ্গ কেউ নেই যার কাছে বলা যায় অন্তরের কথা। এমন অন্তরঙ্গতা একমাত্র আত্মীয়ের সঙ্গেই সম্ভব, যার জন্যে নেই কোন আত্মীয়তার দায়। আগে মেরীর কাছেই সব কথা বলত। আজ কতদিন হয়ে গেল, কারু সঙ্গে নিজের বিষয়ে কোন কথা বলে নি। কৃষ্ণাকে নিজে থেকে এসে ওর জিনিস গোছাতে দেখে ওর মনটা তৃষিত হয়ে উঠেছিল একটু সঙ্গ পাবার জন্যে।

শুধু মানুষের সঙ্গ নয়—মেয়ের সঙ্গ। প্রেমিকা নয়, যে মেয়ে করুণাময়ী, যে মেয়ে সত্যকার বান্ধবী। তাই কৃষ্ণার দরদভরা সুরে, কুমারের মনটা এক মুহূর্তে দুলে উঠল। কৃষ্ণার মুখের পরে ভাবেভরা চোখ তুলে কুমার বললে, —"তুমি শুনবে কৃষ্ণা ?"

চোখে চোখ তুলে তাকাতে সাধারণতঃ কেমন যেন সঙ্কোচ লাগে কৃষ্ণার। কিন্তু আজ সব সঙ্কোচ ভুলে গেল। বন্ধুত্বের আহ্বানে ওর মনের মধ্যে জেগে উঠল মেয়ের বদলে বন্ধু। পূর্ণ চোখ বিস্তৃত করে কৃষ্ণা বললে,—"বলুন, আমি শুনব।"

তখন কৃষ্ণার চোখ থেকে দৃষ্টি তুলে দিগন্তে নিক্ষেপ করে কুমার বললে,—"জান, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম।"

এ কথার পরে কুমার বেশ একটুক্ষণ চুপ করে রইল, আর সেই একটুক্ষণ অনন্তকালের মত কৃষ্ণার কানের কাছে ড্রাম পিটিয়ে বাজতে লাগল—"জান আমি একজনকে ভালবাসতাম।"

স্বপ্নগুলি সাধারণতঃ মিথ্যেই হয়, কল্পনাগুলি ব্যর্থ। মালাবদল হয়ে গেছে অনেক আগে, তবে কৃষ্ণার সঙ্গে নয়। কৃষ্ণা এসেছে অন্য নারীর ভূমিকায়। না না, কৃষ্ণা সে ভূমিকা নেবে না। সে কুমারের জীবনে দ্বিতীয় নারী হয়ে আসতে চায় না কখনোই। তার চেয়ে সে তার বন্ধু হবে—সপ্ত পদক্ষেপের দ্বারা যে বন্ধুত্ব কুমার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

কে বলে স্ত্রীপুরুষে শুধু প্রেম হয়—বন্ধুত্ব হয় না ? এই ত এখুনি ছুটির বাঁশিতে বন্ধুত্বের সুর বাজছে। এই ত শেষ পর্যন্ত কুমারই এসে দাঁড়াল ওর কাছে অঞ্জলি পেতে—ভিক্ষা চাইল বন্ধুত্ব। দেবে দেবে, তাই দেবে সে, প্রেমের চেয়ে বন্ধুত্ব অনেক ভাল। এর মধ্যে লজ্জা নেই, ভয় নেই, ঠাটঠমকের ভান নেই—আছে শুধু নিরাবিল প্রীতি আর সমবেদনা।—'জান, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম'—এই একটা লাইন। হঠাৎ বেদনাকে সমবেদনায় পরিণত করল, কৃষ্ণার বুকের মধ্যে জেগে উঠল নারী—যে নারী মা, যে নারী সহধর্মিনী, সঙ্গিনী—প্রিয়া নয়। আর তারই বলে একটু আগের বিষম হৃদয়ভার কান্না হয়ে ঝরে না পড়ে, মুহূর্তে হালকা হয়ে উড়ে গেল আকাশে—হাসি হয়ে ফুটে উঠল তাম্রাভ ঠোঁটের কোণে।

কৃষ্ণা বললে,—"বাসতাম বলছেন কেন ? এখন কি আর বাসেন না ?"

—"কি জানি!" দূরের দিকে তেমনি করেই চেয়ে থেকে কুমার আবার বললে,—"কি জানি,—এখনও কি বাসি?"

বন্ধুত্বের দাবী স্বল্পভাষিণীকে বাঙ্ময়ী করে তুলল। কৃষ্ণা বলল,—"বর্তমান ত অতীতেরই পরিণতি। তার ধ্বংস ত নয়। আপনার ভালবাসাও নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয় নি, পরিণত হয়েছে মাত্র।"

—"হতে পারে।" তেমনি অন্যমনস্ক হয়ে বলতে গিয়ে হঠাৎ কৃষ্ণার মুখের দিকে চমকে তাকায় কুমার। ওর দু'চোখ জলজল করছে। একি কৌতুক না করুণা!

—"কৃষ্ণা, কৃষ্ণা!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুমার,—"তুমি এত কথা জানলে কি করে? তুমি ত কাউকে ভালবাসো নি?"

কুমারের প্রশ্ন থামল না, উদাস চোখে কৌতূহল ভরে বলল,—"না কি বেসেছ?"

হঠাৎ কেন কৃষ্ণা মাথা হেলাল কে জানে,—মৃদুস্বরে বললে,—"বেসেছিই ত, এখনও বাসি।"

—"বাসো? বল কি কৃষ্ণা?" কুমারের বিস্ময় যেন থামতে চায় না,—"ভালবাসো? সত্যি? তা হলে বল তার নাম, আমি যেখান থেকে পারি তাকে খুঁজে এনে দেব। তোমাকে আমার ভাল লাগছে কৃষ্ণা—নিজের ছোট বোনের মত। মনে হচ্ছে তোমার জন্যে অনেক কিছু করতে পারি। বল কৃষ্ণা, কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করব।"

—"ভালবাসা মানে বুঝি কষ্ট?" কৃষ্ণা হাসল—ঝরণার মত ভরা মন খুশীর হাসি,—"আমি ত জানতাম না।"

কৃষ্ণার ঝরঝরে হাসির ছোঁওয়া কুমারকেও হাসাল, ওর উদাস অন্যমনস্কতা অনেকখানি কেটে গেল। হাসতে হাসতে বললে,—"তবে তুমি বাজে কথা বলছ কৃষ্ণা,—ভালবাসা কাকে বলে তুমি জান না, ওর ত পনর আনাই কষ্ট, মাত্র এক আনা সুখ।"

—"ওমা, তাই নাকি?" কৃষ্ণা আবার হাসল,—"তবে কেন লোকে ভালবাসা চায়?"

—"ভালবাসা পেতে অনেকেই চায়, কিন্তু ভালবাসতে বিশেষ কেউ

চায় কি ? একবার যে ভালবেসেছে, কবিরা বলেন, তার নাকি আর কোন আশা নেই, সে মরেছে, অর্থাৎ কষ্ট তাকে পেতেই হবে।"

কৃষ্ণা গুনগুন করে মৃদু স্বর গলায় তুলল—

"রেখে দে, সখি রেখে দে, মিছে কথা ভালবাসা,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা।"

—"তবে দেখছ ত কবিরা কি বলেন ?"

কৃষ্ণা বললে,—"কবির বাণী কবিরই থাক, আমি মানি না। যদি ভদ্রলোক বেঁচে থাকতেন ত গিয়ে সোজা তর্ক তুলতাম—আমার মনে হয় বিনা কষ্টেও ভালবাসা যায়,—গর্ব ভরে কৃষ্ণা বললে,—যেমন আমি বাসি।"

—"তাই নাকি ?" কৌতুকে কৃষ্ণার চোখে চেয়ে কুমার বললে,—"বল না কৃষ্ণা, কে সে এমন, যার প্রেমে বেদনা নেই, শুধু আনন্দ আছে ?

—"হাঃ হাঃ" কৃষ্ণা হাসল। হঠাৎ যেন ওর মনের ভার নেমে গেছে, ওর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ফুলে ফুলে হাসির বান ডাকছে। ও বললে,—"তোমার অল্প একটু ভুল হয়েছে কুমারদা, ঠিক ধরতে পারনি। আমার প্রেমে বিশেষ কোন মানুষের নাম নেই। এটা 'সাবজেকটিভ অবজেকটিভ' নয়। এখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ী বড়। আমার ভালবাসা আমারই, তবু যদি তার বিষয়টা কি, এই প্রশ্ন তোল ত বলব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

—"অর্থাৎ ?" কুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকাল।

—"অর্থাৎ এই পৃথিবী, এই যা কিছু সব, এই গাছপালা, ওই দাদু, দিদি, মামী। এই তুমি যে তুমি, সবাইকেই আমি ভালবাসি, তাতেই মন ভরে থাকে। আমার ভালবাসা কোন বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করে তাকেই ঘিরে ঘিরে বদ্ধ জলাশয় রচনা করেনি। তাই সমস্তকে নিয়ে সে নিজে থেকেই পূর্ণ হয়ে আছে।"

—"ব্যাপার কি কৃষ্ণা ?" বিস্ময়ে উঠে বসল কুমার,—"তুমি ত সাংঘাতিক মেয়ে ! এত সব বড় বড় কথা বলতে জান। অথচ ভাব দেখাও যেন নেহাত—"

—"কচি খুকী ?" পাদপূরণ করে কৃষ্ণা,—"ওটা মেয়েলী ন্যাকামি।"

—"খুব সম্ভব।" কুমার মৃদু হাসল,—"কিন্তু এত কথা তুমি জানলে কি করে ? শুনেছি বি-এতে তোমার ফিলসফি অনার্স ছিল। তাতে কি এত শেখা যায় ? তুমি ত রীতিমত দার্শনিক।"

—"কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আলোচনার কথা আজ ত ছিল না। আপনার গল্প শোনাবেন, এই রকমই ত কথা ছিল। তা শুধু একলাইন মাত্র বলেছেন। আচ্ছা তার দ্বিতীয় লাইনটা না হয় আমি বলে দিচ্ছি, আপনি বলেছেন আপনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন। আমি বলছি তার নাম মেরী ডিকসন, তার পর ?"

—"তার পর সেই মেয়েটি একদিন রাগ করে ভুল বুঝে আমায় ছেড়ে চলে গেল, আর তার দেখা পেলাম না। আমি শক্ত অসুখে পড়লাম। সেরে উঠে কত খোঁজ করলাম, কোথাও তার সন্ধান পেলাম না, সে কারুর কাছে কোন ঠিকানাই দিয়ে যায় নি।"

করুণ মুখে কৃষ্ণা বললে,—"তার পর ?"

—"তার পর আর কি, আমার কোন সঙ্গী নেই, সাথী নেই, ভালবাসার জন কেউ নেই। সেই একটি মানুষের অভাবে, জীবনে আমার স্বাদ চলে গেছে। কোন সুখেই আর তেমন রস নেই। কৃষ্ণা, আমার প্রেম তোমার মত নির্বিশেষ নয়, সে একটি মানুষকেই ঘিরে ঘিরে লতার মত বেড়ে উঠতে চায়।"

ঈর্ষার কাঁটাগুলি মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে শুরু করলেও তাদের আমল দিল না কৃষ্ণা। তেমনি কৌতুকোজ্জ্বল চোখ কুমারের চোখে এই প্রথম অসঙ্কোচে তুলে ধরে বললে, "আবার সেই আপনারই প্রশ্ন আসছে কিন্তু কুমারদা—আপনি ভালবাসতে চান,—না, ভালবাসা পেতে ? আমার মনে হয়, আপনি প্রেমে পাগল নন, প্রেমের কাঙ্গাল। কিন্তু সেই মেয়েটি হয়ত আপনাকে পাগল হয়েই ভালবেসেছিল। তা না হলে নিজেকে এমন করে আপনার চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলতে পারত না। এই ধরণের গল্প যত পড়েছি, তাতে মনে হয় আপনি হয়ত খুব শীগ্‌গিরই অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যাবেন। কিন্তু সেই মেয়েটির জীবন হয়ত একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।"

—"হাঃ হাঃ" কুমার হেসে উঠল।—"এতক্ষণে বাঁচালে কৃষ্ণা, বোঝা গেল তোমার দার্শনিক কথাবার্তাগুলি শুধু রঙীন কাঁচের মায়া। ওদের মধ্যে কোন সত্যদর্শন নেই।"

—"অর্থাৎ ?" এবারে অবাক হবার পালা কৃষ্ণার।

—"অর্থাৎ, মেরী বিয়ে করেছে। কাল খবর পেলাম।"

—"ভুল খবরও হতে পারে," কৃষ্ণা বাধা দিল,—"কে বললে আপনাকে ?"

"খবরটা মোটেই ভুল নয় কৃষ্ণা দেবী, সেই কথাই বলার জন্যে এতক্ষণ আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু সকাল থেকে ঠিক বলার লোক অথবা ঠিক বলার 'মুড' কিছুই পাচ্ছিলাম না। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছি, ভুল করেছি কি ?"

—"মোটেই না",—ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে বললে কৃষ্ণা। এর বাচালতার বেগ যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

কুমার বললে,—"তুমি অলৌকিক অর্থাৎ super natural-এ বিশ্বাস কর ?"

তেমনি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লে কৃষ্ণা—"না।"

—"না ? তুমি কি বিশ্বাস কর যা চোখে দেখা যায় শুধু তাই সত্যি ?"

—"তা কেন, যা কানে শোনা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, তাও, যা মনে ভাবা যায়, বুদ্ধিতে ধরা যায় তাও।"

—"আর যা শুধু অনুভবে জানা যায় ?"

—"তাও, কিন্তু"—ফিস্‌ফিসে গলায় কৃষ্ণা একটু দ্বিধা করল, একটু কথার জন্যে হাতড়ালো, "কিন্তু সব অনুভবেরই একটা বিষয় আছে।"

—"সেই কথাই বলছি। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এমন অনুভব আছে, চোখের দেখায়, কাণের শোনায় অথবা হাতের ছোঁয়ায় যার কোন প্রত্যক্ষ বিষয় অথবা কারণ নেই ?"

স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় কৃষ্ণা বলল,—"না।"

"না ?" কুমার অবাক হয়ে বললে,—"ধর, কখনো কি তোমার অকারণ মন খারাপ হয় না ?"

—"হয় বৈ কি, কিন্তু তার সবটাই হয়ত অকারণ নয়, তারও কোন অজানা কারণ থাকে,—শারীরিক অথবা মানসিক। হয়ত ভিতরে ভিতরে কারও জন্যে অথবা কিছুর জন্যে মন কেমন করতে থাকে, কিংবা হয়ত এমনি কোন রকম শরীর খারাপ হয়ে থাকে, মনে তার ছায়া পড়ে।"

—"এমন কখনো হয়েছে কি—সারাদিন বেশ হাসিখুশী হৈ-হৈ করে কাটালে, হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়া যেই নামল, অমনি মনটা বিষণ্ণ উদাস হয়ে উঠল ? সে কেন হয় ?"

—"বোধহয় হঠাৎ আলো মিলিয়ে আঁধার হয়ে আসে বলে। দিন-রাত, আলো-অন্ধকার এবং বিভিন্ন ঋতুগুলির যে বিভিন্ন প্রভাব আছে মানুষের দেহে এবং মনে—একথা ত আজকের দিনে সবাই বলে থাকেন। কিন্তু আপনি বলুন আপনার গল্প, আমি বিশ্বাস করব!"

—"না থাক, তুমি হয়ত হাসবে।"

—"না আপনি বলুন।"

—"আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, তার নাম তপন মজুমদার। তার বান্ধবীর নাম ডোরা লিটলস্। এইখানে শতকরা কতজনের ভাগ্যে যে বান্ধবী জোটে তার ঠিক নেই। এই নিয়ে আমরা আগে অনেক হেসেছি। সেই আমারও যে বান্ধবী জুটবে কে জানত। কিন্তু যখন জুটল, মনে হ'ল এইটেই স্বাভাবিক। থাক সে কথা।"

"ডোরা লিটলস্ ভারী মিষ্টি, ছোটখাটো সুন্দর মেয়ে। দু'জনে জোর ভাব চলল বছরখানেক ধরে। তারপরে একদিন তপন মজুমদার ভারতের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একটা চাকরি বাগিয়ে ফিরে গেল দেশে। বলে গেল, ওখানে সব ব্যবস্থা করে খবর দেবে। আর খবর দিল না। অন্য মেয়ে হলে তপন এমন পার পেত না, ভারতবর্ষ পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। কিন্তু ডোরা সে-সব কিছু করল না। এইখানেই একটা সাধারণ চাকরি করতে লাগল, আর দিন দিন রোগা ম্লান হয়ে যেতে লাগল। ওকে নিয়ে মেরী আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছে।"

—"যথা?"

"যথা", কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে হেসে উঠল কুমার।

—যথা, "তোমরা ভারতীয়েরা এমনি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক। আজ মনে মনে তাকে সামনে রেখে অনেক গালাগালি করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তবে বোধহয় কোন কথাই বলতে পারব না।"

—শুনে আবার এক মুহূর্তের জন্যে বিপুল হৃদয়াবেগ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার মত ঠেলে উঠে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। লজ্জা, লজ্জা, এত ছোট কেন কৃষ্ণার মন, এত ঈর্ষ্যা কেন? নিজের দীনতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল কৃষ্ণা। আস্তে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলতে গেল জল, ধরা পড়ে গেল কুমারের চোখে।

—"এ কি কৃষ্ণা, চোখে জল? এত কোমল তোমার মন? একটু দুঃখের কথা শুনেই কেঁদে ফেল?"

ছি ছি, কি লজ্জা, শুধু ভুল নয়, মিথ্যে। কুমার ভেবেছে, ও বুঝি তার দুঃখ-করুণায় গলে গিয়ে কাঁদছে। জানে না একেবারে উল্টো ব্যাপার। করুণা নয় ঈর্ষা, সমবেদনা নয় অভিমান আর অহঙ্কার। চোখ মুছে মুখ তুলল কৃষ্ণা, যা ইচ্ছে ভাবুক কুমার, ও তার ভুল ভাঙাতে যাবে না। বললে,—"কত দিন কান্নাকাটি, তার পর?"

—"তার পর ডোরা একদিন হারিয়ে গেল, অর্থাৎ পুরনো বাসা বদলে কোথায় গেল তার ঠিকানা দিল না কাউকে। অনেকদিন পরে এই সেদিন পোস্টঅফিসে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার চেহারা বদলে গেছে। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে সে আগের মতই ফুল্ল হয়ে উঠেছে। সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল এক রেস্তোরাঁয়। চা খাওয়াল আর তার গল্প বলল। সে নাকি যোগসাধনা করছে কি এক ভারতীয় পদ্ধতিতে। তাদের নাকি একটা ছোট প্রতিষ্ঠান আছে। একটি হাঙ্গেরীয়ান মেয়ে ও ভারতীয় ছেলে এর প্রতিষ্ঠাতা। তাদের ধর্ম কি কেউ জানে না। অনেকে বলে ওরা সুফী মুসলমান। কেউ বলে, বাঙালী—বৈষ্ণব অথবা তান্ত্রিক, অথবা সহজিয়া সাধক। অর্থাৎ—কুমার হেসে উঠল,—ঐ নামগুলির প্রত্যেকটাই এত দুর্বোধ্য যে, যে কোন একটাই অন্য যে কোনটার সমান। তা যাই হোক, ওকে জিজ্ঞেস করলে, সে নাকি বলে, মানুষের ধর্মই তার ধর্ম। অন্তত, ডোরা সেই কথাই আমাকে বললে। আরও বললে, বছরখানেক আগে সে নাকি মেরীকে কয়েকবার তাদের যৌগিক স্কুলে আসতে দেখেছে। কিন্তু মেরীকে কে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। সে সব খবর ডোরা জানে না। মেরীর সঙ্গে তার তখন কথাবার্তাও হয় নি। কারণ সে তখন কিছুদিন নাকি মৌন থেকে কি একটা সাধনা করছিল, তাই ওর দিকে মন দিতে পারে নি। কিন্তু, ডোরা বললে, আমি যদি চাই সে মেরীর সন্ধান এনে দিতে পারবে কিংবা আমি নিজেই নাকি তার খোঁজ নিতে পারি, একটু চেষ্টা করলেই। আর সেটাই নাকি বেশী সোজা। আমি অবাক হয়ে বললাম,—কি করে করব? যোগ করে নাকি?" "হাঁ নিশ্চয়", ডোরা দৃঢ়বিশ্বাসের সুরে বললে,—"যোগ করেই ত।"

—"আমাকে পর পর দুদিন তাদের প্রতিষ্ঠানে ধরে নিয়ে গেল ডোরা। প্রতি শনিবার, সান্ধ্য আমোদের বদলে ওখানে হয় বক্তৃতা আর demonstrations. আধাবয়সী বেশ কয়েকজন মেয়েপুরুষ যে যার নিজের আসন পেতে কার্পেটের উপরে বসে আছে—রীতিমতো ধ্যানমগ্ন ভাব। প্রথম দিন আমার ভারি হাসি পাচ্ছিল। সত্যি। এমন মজার ব্যাপার, ক্লাস করে যোগ শেখানো, তাও আবার সব সায়েব যোগী। কিন্তু শুনে অবাক হবে, কাল আমি নিজেই সেখানে গিয়েছিলাম। কেন জানিনা, কাল সারাদিন মেরীর জন্যে মন-কেমন করেছে। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে যেতে কেবল মেরীকে মনে পড়ছিল, অথচ তোমাদের দুজনের কোন মিল নেই। না মনে, না বাইরে।"

মনে মনে চম্‌কে উঠে কৃষ্ণা অস্ফুটে প্রশ্ন করল,—"কেন ?"

সে প্রশ্ন শুনতে পেল না কুমার, নিজের ঘোরেই বলে চলল,—"হঠাৎ বিকেল বেলা, কাজ থেকে ফেরার পথে, ওই চত্বরের কাছে নিজেকে আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম ভালই হয়েছে হয়ত এখানে আজ তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে। হয়ত আমার এই আসার ভিতরে অন্য কারও বাসনার টান আছে। হয়ত কোন অদৃষ্ট ভবিষ্যতের নতুন খেলা শুরু হবে আজকে আমায় নিয়ে, নইলে নিজের অজান্তে কার ইচ্ছার নির্দেশে এখানে পৌঁছালাম ?"

—"ডোরা আমাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল, তিনতলার উপরে 'এটিকে'র মত ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে বসিয়ে দিল। ঘরে আলো নেই, শুধু এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে আর ধূপ। সেইখানে আসন করে বসে, ডোরার কথামত মেরীর কথা ভাবতে শুরু করে দিলাম। সে এক বিষম সমস্যা ! কি ভাবব, মেরীর কোন কথা ? সমস্যার সঙ্গেই এল বিদ্রোহ—কেন ভাবব ? মেরী এমন কি, আর এমন কে, আমার জীবনেই বা কি এমন তার অধিকার যে, এই নির্জন অন্ধকারে বসে ঈশ্বরের ধ্যানের মত তার ধ্যান করতে হবে ? ভীষণ রাগ হ'ল নিজের উপরে, এ কি কাণ্ড করতে যাচ্ছি। একবার মনে হ'ল চলে যাই এখনি, আবার শেষকালে লোভী কৌতূহল হল জয়ী, শেষ পর্যন্ত দেখতে হয়ে সত্যি এর মধ্যে কোন ব্যাপার আছে কিনা, নাকি সবই নেহাত ফাঁকি। আমি আসন ছাড়লাম না।

তখন কতশত বিভিন্ন ভাবনা, বিচিত্র কথা নানাদিক থেকে একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে মনের বন্ধ দরজার উপর পড়তে লাগল। মেরীর কথা ভাবতে গিয়ে পুষি বেড়ালটার কথা মনে পড়ে গেল, কত অজস্র কথা, অবান্তর ছবি। রাগে উঠে মনটাকে সব ভাবনা থেকে মুক্ত করতে চাইলাম। শুধু মেরীর সন্ধান পাবার বাসনাটিকে রেখে দিয়ে মন থেকে আর সব ভাবনা দূরে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করলাম। আর কিছুই ভাবব না, কিছুই না, মনটাকে শূন্য করে ফেলব। তোমাদের দর্শনের কি সব থিয়োরী আছে না, আপ্রায়োরী, না কি যেন? কোন দার্শনিক বলেছিলেন, বল ত যে শিশু যে মন নিয়ে জন্মায় তা হচ্ছে খালি খাতার মত। তার মধ্যে লাইনে লাইনে কাল তার নিজের হাতে কাব্যরচনা করে চলেছে।"

মন্ত্রমুগ্ধার মত শুনছিল কৃষ্ণা, বাধা পেয়ে খুশী হ'ল না, বললে,—"ঠিক মনে নেই, তার পর?"

—"তার পর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, আমার মনটাকে জন্মমুহূর্তের সেই অলিখিত খাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।" কথা বলতে বলতে কুমারের অন্যমনস্কতা ঘুচে গিয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছিল। কাল রাতের কথা মনে করে এখন যেন ওর চোখের ভিতরে সার্চলাইটের মত জ্বলে উঠল। সেই তীব্র বিদ্যুতের মত চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কৃষ্ণার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে এল। দুই হাতে মুখ ঢেকে ও অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।

—"কি হ'ল কৃষ্ণা, কি হ'ল?" একটু ঝুঁকে ওর হাঁটুতে নাড়া দিয়ে কুমার বললে,—"হঠাৎ ভয় পেলে কেন?"

নিজের হাঁটুতে রাখা কুমারের ডানহাতটা সবলে চেপে ধরে কৃষ্ণা বললে, —"না না, কিছুতেই না, আপনি আর কখনও এমন কাজ করতে পারবেন না, কখনও না।"

—"কেন বল ত, কি হয়েছে?" অন্য হাত দিয়ে কৃষ্ণার সেই ধরা হাতটায় একটু আদরের চাপ দিয়ে কুমার বললে,—"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ভাই?"

—"না না", উত্তেজিত কৃষ্ণা বাধা মানল না।—"মেরীর জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খোঁজ করে ফিরুন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিন নয়ত ডিটেকটিভ লাগান, যা করবেন স্বাভাবিক ভাবে করুন, natural way-তে। প্রকৃতিকে অতিক্রম

করতে গেলে ফল হবে উল্টো। Super natural-এর বিষম ভারে natural মানুষ গুঁড়িয়ে যায়।"

—"কেন কেন, গুঁড়োবার কি লক্ষণ দেখলে?" কৃষ্ণার আরও অনেক কাছে সরে এল কুমার, একেবারে ওর পাশে।

তাই দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের দুই উঁচু-করা হাঁটুর উপরে রেখে কৃষ্ণার তন্বীদেহ চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল, আর অনুভব করল কুমারের দেহ তার বড় কাছাকাছি। এত কাছে যে ওর গায়ের সুরভি সাবানের মিশ্রিত গন্ধ কৃষ্ণার ইন্দ্রিয়বুদ্ধির সীমানায় এসে পৌছাচ্ছে, আর ওর অস্তিত্ব কৃষ্ণার সর্বাঙ্গে যেন আলিঙ্গনের মত ঘিরে রয়েছে। ছি, ছি, কৃষ্ণা এমন করে নিজেকে হারাল কেন? এখনও পারে, এখনও কৃষ্ণা ফিরে আসতে পারে! এখনও কৃষ্ণা হাসির ছটায় খর সূর্যের মত জ্বলে উঠতে পারে। সেই তীব্রতায় ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এই মোহের আবেশ। কিন্তু তার আগেই কুমার বাহু দিয়ে ওর পিঠ বেষ্টন করে আস্তে আস্তে মাথা বুলিয়ে দিতে লাগল। যেমন করে লোকে ছোট একটা নরম পাখীকে আদর করে, তেমনি করে। আর কৃষ্ণার মাথার ভিতর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত সত্বা সেই আদরের স্পর্শে বার বার শিউরে উঠে ভাবতে লাগল, এই সময়টুকু যেন এখনি শেষ হয়ে না যায়। এই ক্ষণকাল আরো অনেক অনেকক্ষণ ধরে বয়ে চলুক। কিছুতে যেন শেষ না হয় এর রেশ।

ওর মাথায় মৃদু নাড়া দিয়ে কুমার বললে,—কাঁদে না, ছিঃ, লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠ, মুখ তোল।"

কৃষ্ণার ভয় হ'ল, এইবারে বোধহয় কুমার জোর করে ওর মুখ তুলে ধরবে, আর সেই সম্ভাবনায় শিউরে উঠল মনে মনে।—ছি ছি; অন্য মেয়ের পুরুষের স্পর্শ কেন তার এত ভাল লাগছে। না, কৃষ্ণা আর নিজেকে হারিয়ে যেতে দেবে না, লুটিয়ে ফেলবে না তার নারীত্বের গর্ব। তাই মুখ তুলল কৃষ্ণা।

কুমার একটু সরে বসে বলল,—"কি হয়েছিল বল ত কৃষ্ণারাণী?"

তখন দুচোখভরা জল নিয়ে টেনে টেনে হাসতে লাগল কৃষ্ণা। বেশ কষ্ট করা কান্না দিয়ে বানানো হাসি। বললে,—"আমি ভয় পেয়েছিলাম হঠাৎ, আপনার চোখে যেন আলো জ্বলছিল।"

—"আলো ?" এবারে কুমারের হাসির পালা। "আলোই বটে, একেবারে যার নাম দিব্যদ্যুতি, ঠিকই দেখেছিলে, আমার মধ্যে দেবভাবটা যথেষ্ট বেশী—"

—"মোটেই না।" এবারে কৃষ্ণার ছোট্ট হাসি একটু সত্যি হ'ল—"দেবতা-টেবতা সব বাজে।"

—"ইস্!" কুমার আবার বাধা দিল,—"দেবতা নয় ত কি অপদেবতা এসে চোখে আলো জ্বালিয়েছিল বলতে চাও।"

—"জানি না।" এবারে গম্ভীর হ'ল কৃষ্ণা, ভারী গলায় বললে—"আমি শুনেছি উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা না নিয়ে এই সব করতে গিয়ে কত সর্বনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।"

—"সর্বনাশ বলতে কি বলতে চাইছ!" কুমারের স্বর আবার আগের মত উদাস হয়ে এসেছে,—"সর্বনাশ মানে কি ?"

—"কি জানি কি।" কৃষ্ণার গলা দ্বিধা করতে লাগল,—"মানে, শুনেছি, এতে নাকি লোকে পাগল পর্যন্ত হয়ে যায় ?"

—"হয়ত যায়, কিন্তু তোমার ভয় নেই কৃষ্ণা, আমি পাগল হব না।" কৃষ্ণার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল কুমার।

—"বলা যায় না।" কুমারের চোখের হাসিকে আমল না দিয়ে বিজ্ঞের মত কৃষ্ণা বলল,—"এ সব সাধনা করতে হলে দীর্ঘদিন ধরে শরীরমনকে তেমনি করে গড়তে হয়। 'সুপার ন্যাচারাল'কে আয়ত্ত করতে গেলে 'সুপারম্যান' হতে হয় সত্যি, অলৌকিককে পেতে গেলে হতে হয় অসাধারণ।" দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিল এতক্ষণে কৃষ্ণার চোখে। আবার তেমনি হাঁটুতে মাথা রেখে বললে,—"এবারে গল্পটা শেষ করুন।"

—"আর গল্প নয়।"

মস্ত একটা হাই হাত দিয়ে চাপা দিয়ে কুমার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের উপরে। বিকেলের আলো ততক্ষণে ঝিরঝিরে গাছের পাতায় গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ঢেলে কাঁপতে শুরু করেছে। কাল সারারাত ঘুম হয় নি কুমারের। আজ সারাদিন পরে ওর শরীর ক্লান্ত হয়ে এসেছে। শুয়ে শুয়েই কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে বললে,—"বড় ক্লান্ত লাগছে কৃষ্ণা, একটু চুপ করে শুয়ে নিই—দু'মিনিট।"

মাথা হেলিয়ে কৃষ্ণার হ্যাঁ বলার আগেই কুমারের চোখ বুজে এল। একটা হাত চোখের উপরে তোলা, কুমারের সুগঠিত দেহ কৃষ্ণার চোখের সামনে ঘাসের উপরে বিশ্রামে মগ্ন হয়ে পড়ে রইল। অন্য হাত অলসভাবে বুকের উপর ফেলা। তাঁর শিল্পীসুলভ দীর্ঘ অনামিকায় ওর বাপের বিয়ের হীরের আংটিটা পরা। তাতে লক্ষ যোজন দূর থেকে লাল সূর্য জ্বলে জ্বলে উঠছে, আর বসন্তবাতাস ওদের দু'জনকে ঘিরে ঘিরে সুখের মত শিউরে উঠছে, ক্লান্ত পাখীরা কিচিরমিচির শুরু করেছে। যারা এসেছিল রোদমাখা দিনটাকে ভোগ করতে, ভোগশেষে উচ্ছিষ্ট দিনাবশেষটাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা ফিরে চলেছে ঘরে। এখনও যারা এখানে-ওখানে ছিটিয়ে রয়েছে তারাও যাব যাব করছে মনে মনে, সংগ্রহ করে নিচ্ছে তাদের ছড়ান জিনিসপত্র। কুমারের চুলগুলি বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওর বুকের উপরে রাখা হাতটা নিশ্বাসপতনের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে। কৃষ্ণার হাত আকুল হয়ে উঠছে ওর এলোমেলো চুলের মধ্যে ডুবে যাবার জন্যে। কিন্তু সে হাতকে মনে মনে শাসন করে কৃষ্ণা বসে রইল, ফিরিয়ে নিল তার দৃষ্টি, মেলে দিল দূর শূন্যে। কুমারের হাতের উপরে হাত রাখার অধিকার নেই কৃষ্ণার, ও অন্যের, ও অস্পৃশ্য।—কেন? তর্ক ঘনায় কৃষ্ণার মনে—ভালবাসার কি জাত আছে? সে কি ছোঁয়া যায়? কুমার আর একজনকে তার প্রেম দিয়েছে বলে কৃষ্ণা কেন তাকে ভালবাসবে না? এইটুকু কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা করতে পারে যে, সে কাড়াকাড়ি করবে না, কারণ কাড়াকাড়ি করে নেওয়া বড় বিশ্রী—অসুন্দর, ওতে ভালবাসা ব্যাহত হয়ে—প্রেমের মূল্য যায় কমে। কাড়াকাড়ি না হয় নাই করল, কিন্তু ভালবাসতে দোষ কি? মনে মনে? গোপনে? কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, শুধু কৃষ্ণার ছোট্ট বুকের গোপন ঘরে, সে ভালবাসা প্রদীপের মত জ্বলবে।

কিন্তু, আবার দ্বিধা জাগে কৃষ্ণার। প্রেম নাকি লুকিয়ে রাখা যায় না. কবি যা বলেছেন তা সত্যি, "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" কিন্তু শুধু আলো ত হয় না। আলোর পিছনে আছে আগুন, সে যে পুড়িয়ে মারে। ক্ষুধার্ত অগ্নি সর্বগ্রাস করতে চায়। কৃষ্ণা যদি নিজেকে প্রশ্রয় দেয় তবে তার প্রেম কি শুধু হাতটুকু ধরেই ক্ষান্ত থাকতে চাইবে?—

ন, না, আলোর মূলে আছে আগুন, আর প্রেমের মূলে আছে কাম। একটুতে তার তৃপ্তি নেই। আগুনের মত বাতাসে উড়ে উড়ে সে কেবলই একটা থেকে আর একটায় বিস্তৃত হয়ে যায়। তার লালায়িত রসনা সমস্ত সুন্দরকে চেটে চেটে কুৎসিত করে তুলছে। ওই ত তার বীভৎস মুখটা কৃষ্ণা দেখতে পাচ্ছে নিজের মধ্যে। না, না, ওই লোভী রাক্ষসটার দাবি মানবে না কৃষ্ণা। লোলুপ মুঠি দিয়ে যে আত্মাকেও পিষে ফেলতে চায়। পবিত্রকে করে কলঙ্কিত—ওই ত তার সামনে শুয়ে আছে পবিত্র পুরুষ দেহ। কবিরা কেন বলেন শুধু নারীদেহ পবিত্র। পুরুষ কি পবিত্র নয়? সুন্দর নয়? নারীও ত পুরুষকে কম কলঙ্কিত করে না—এই ত একটু আগে কৃষ্ণা নিজেই তাই করছিল। চোখের জল দিয়ে, ভাবের মায়া দিয়ে কৃষ্ণা নিজেই ত মোহ রচনা করেছিল—টেনে নিয়েছিল কুমারের করুণা—যে করুণা প্রেমের সহোদরা। যদিও কৃষ্ণা নিজের অজ্ঞাতে না জেনেই করেছিল যা করবার, ময়ূর যেমন প্রাণের আবেগে না জেনেই পেখম ধরে, কোকিল যেমন না জেনেই ডেকে ডেকে মরে, মাকড়সা যেমন জাল বুনে যায়, তবু সবটাই কি না জেনে? কে বলে পুরুষই শুধু প্রতারক? তাকে প্রতারক করে তোলে মেয়েরাই। মেয়েরাই ত ভোলায় বেশী। পুরুষই ত ভোলে—সে যে ভোলানাথ।—এই ত মেরী ডিকসন একে ভুলিয়েছে। তার পরে কৃষ্ণা নিজেই কি আবার ভোলাতে এল নাকি? কেন এল কৃষ্ণা—কেন এল ওর দিকে উন্মুখ হয়ে? এখন কি করবে কৃষ্ণা, কি করবে? কিন্তু কৃষ্ণারই বা দোষ কি? ওর যে উপায় ছিল না? কারা সব যেন কানাকানি করল, চুপি চুপি ইসারায় সবাই মিলে হাসাহাসি করল, বাতাসে বাতাসে যেন রব উঠল—ওই তোর বর, ওই তোর বর। তাই ত কৃষ্ণা চোখ মেলে তাকিয়েছিল, আড়ালে আড়ালে চুপি চুপি, চুরি করে করে দেখেছিল। কিন্তু তখন ত সত্যি প্রেমে পড়ে নি। আজ যখন জানল যে, ও আর তার বর নয়, কোনদিন হবার সম্ভাবনাও নেই, তখনই কেন এমন হ'ল, বার বার কেন ওর মুখের দিকে দৃষ্টি ছুটে যায়?

কি সুন্দর গায়ের রং কালো ত নয়ই, ফরসাও নয়। একেই বোধহয় বলে মসৃণ-চিক্কণ। কৃষ্ণা এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল, এ বর্ণ শুধু মেয়েদের নয়—পুরুষেরও আছে। এ রঙের কি আশ্চর্য মহিমা, শান্ত, গভীর অথচ কেমন মৃদু-কোমল, কি সুন্দর চওড়া কপাল, আর তাতে গাছের পাতার সঙ্গে সূর্যের

আলোর কেমন ছায়া ঢাকা ঢাকা খেলা। আর তার নীচেই কালো ভুরুর কোলে দুই বোজা চোখের আশ্চর্য শান্তি। খাড়া নাকের নীচে তাম্রবর্ণ অধরের দৃঢ়বদ্ধ রেখা। আর কঠিন চিবুকের তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। লাল টাইটা ঢিলে হয়ে এক পাশে আধখোলা ভাবে ঝুলছে। ডোরাকাটা বিলাতি শার্টের গলার বোতাম খোলা। তার ভিতর দিয়ে লোমশ বুকের একাংশ আর গেঞ্জীর একটু সাদা জাল দেখা যাচ্ছে।

এই সমস্তই কৃষ্ণা দেখছে। ছি ছি, এ সে করছে কি? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে পুরুষ ঘুমোচ্ছে, সে মেয়ে হয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করছে। এ কোন দৃষ্টি তার চোখে? এরই নাম কি কামনা? মাগো? কোথায় তুমি? কোথায় তোমার সব বড় বড় উপদেশ? তোমার কৃষ্ণা এ কি করছে? জেনে-শুনে, পরপুরুষের দিকে লোভের দৃষ্টি হানছে। না, কৃষ্ণা এত নীচে নেমে যাবে না। এমন করে হারিয়ে ফেলবে না নিজেকে। ছিনিয়ে নিয়ে যাবে নিজেকে নিজের হাত থেকে। এখুনি, এই দণ্ডে, আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করবে না। আস্তে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল কৃষ্ণা। ঝিনঝিন-ধরে-যাওয়া পা কষ্টে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু সেই স্বল্পমাত্র আওয়াজেই ধড়মড় করে উঠে বসল কুমার।—"ইস্ অনেকটা ঘুমিয়েছি।" ঘড়ি দেখে বলল,—'পনরো মিনিটেরও বেশী, কেন তুলে দাও নি কৃষ্ণা? এই প্রথম বিলেতে ট্রেন ফেল করব। আর সে তোমারই জন্যে।"

নিজের পোর্টফোলিওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুমার। আবার কৃষ্ণা ভুলে গেল। আবার একটু মায়াজাল রচনা করে, বললে,—"বারে! ঘুমোলেন আপনি আর দোষ হ'ল আমার? এমনি মেয়েদের কপাল বটে, দোষ করে পুরুষ, আর দায় চাপে মেয়েদের ঘাড়ে।"

—একটু ঘুমিয়েই কুমারের ক্লান্তি যেন অনেক ঝরে গেছে। খুব তাজা একটা হাসি হেসে কুমার বলল,—"হঠাৎ চুপি চুপি পা টিপে টিপে কেন পালাচ্ছিলে কৃষ্ণা, তোমার ত আর ট্রেন মিস করার ভয় নেই?"

—"নাঃ, পালাই নি ত?" হঠাৎ মিথ্যে বললে কৃষ্ণা,—"বসে বসে পায়ে ঝি ঝি ধরে যাচ্ছিল, তাই উঠে একটু পায়চারি করব ভাবছিলাম।"

"ওরে বাবা, এসব জায়গায় একা একা পায়চারি করা মোটেই সুবিধের

নয়। এখানে চারিদিকে একবারে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' দেখছ না?" বলে কুমার, চারিদিকে একবার তাকাল। মাঠ ততক্ষণে অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা বললে,—দেখেছি বই কি, আপনি যতক্ষণ মগ্ন হয়ে গল্প বলছিলেন, ততক্ষণ কানে আপনার কথা শুনছিলাম বটে, কিন্তু চোখ-কান দুইই অকুপাইড ছিল।'

কুমার আবার একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। কৃষ্ণা বুঝল, ওর কথা বলার ক্ষমতা মুগ্ধ করেছে কুমারকে। যাকে নেহাত সরলা বালিকা বলে ভাবত, তাকে হঠাৎ এ রকম বাকপটিয়সী হতে দেখে, অবাক হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা আবদারের সুরে বললে,—"চলতে চলতে আপনার গল্পটা শেষ করুন না।"

কুমার বললে,—"গল্প ত আর বেশী বাকী নেই। আচ্ছা, তা হলে শেষটুকু বলি, বলতে ইচ্ছে করছে আমার। ধৈর্য ধরে বকবকানি শুনছ বলে ধন্যবাদ।"

এর উত্তরে কৃষ্ণা শুধু তার বড় চোখ বড় করে কুমারের দিকে তাকাল।

কুমার বললে,—"সেই অন্ধকার ঘরে বসে, একমাত্র মেরীর সন্ধান পাবার বাসনাটিকে মনের মধ্যে রেখে, আর সমস্ত ভাবনা মন থেকে দূর করে দিতে ব্যগ্র হয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে আমার শরীর অবশ হয়ে এল। ডান হাতটা ব্যথা করতে লাগল, হাতটা যেন কাঁধ থেকে খসে পড়ে যাবে, তার পরে সেই ব্যথাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টনটন করতে লাগল, তার পরে বাঁ হাতটা। ক্রমে এমন হ'ল যেন দুটো হাতই খসে পড়ে যাবে, তার পরে সেই ব্যথাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টনটন করতে লাগল। আমি কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে কখন যে ওরা ঘরে ঢুকে ব্র্যাণ্ডি-ট্যাণ্ডি খাইয়ে আমাকে চাঙ্গা করেছে মনেও নেই। জ্ঞান হলে ওরা বললে, 'কি হ'ল?' আমি বললাম, 'কিছু না।"

—'সে কি? একেবারে কিছুই না? যা জানতে চেয়েছিলে, পাও নি?'

—"আমি বললাম, 'না'। শুনে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, বলল, 'পারবে পারবে, আজই জানতে পারবে দেখ।"

—"আমি যখন ওদের ওখান থেকে বেরুলাম, প্রায় দশটা বেজে গেছে। মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। যেন মস্ত একটা শূন্য দেহের উপরে টলমল করছে, আর পেটের মধ্যে জ্বলছে চনচনে খিদে।"

শুনে কৃষ্ণার বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠল।—আহা রে! কাল সন্ধ্যাবেলা, কৃষ্ণা যখন পরিপাটি সেজে, কুমারের জন্যে প্রতীক্ষা করেছিল, তখন কুমারের মুহূর্তগুলি এই বেদনার মধ্যে দিয়ে কেটে চলেছিল।

কুমার বললে,—"পকেটে বেশী পয়সা ছিল না। রাত দশটায় প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ঘুরে একটা ছোট রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করলাম। তারা তখন বন্ধ করব করব ভাবছে। আমায় দেখে বিরক্ত হ'ল। বললে, 'শুধু একটু খরগোসের ঝোল আছে। তাই চাও ত এনে দিতে পারি।'

—বসে আছি, হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। আমি টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে, দুই মুঠোর মধ্যে মাথা রাখলাম। ধীরে ধীরে সব যেন কেমন একরকম হয়ে গেল। আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম মেরী সেইখানে উপস্থিত আছে, আমার পাশে, আমার খুব কাছে। ওর সান্নিধ্য আমায় যেন ঘিরে আছে। আমার মনে হ'ল, আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'মেরী, মেরী'। অমনি যেন মেরী বললে, 'কি কি'।

—"আমি বললাম, 'তুমি কোথায়'?"

—"সে বললে, 'এই ত আমি তোমার পাশে।"

—"একি কাণ্ড! মেরী মেরী মেরী।"

—"এই যে, এই যে, এই যে! ঘর ভরে উঠল মেরীর হাসিতে। আমি পাগলের মত মুখ তুলে তাকালাম। শূন্য ঘর শুধু মেরীর আভাস ভরে নিয়ে চুপ করে আছে।"

ওরা চলতে চলতে বাগানের গেটের কাছে এসে পড়েছিল। কৃষ্ণা সেখানে একটু থেমে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এটুকু না দাঁড়িয়ে সে পারল না। সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কুমার বললে,—"এর ব্যাখ্যা কি করবে তুমি?"

কৃষ্ণা চোখ মেলল, তর্কের সূচনায় অনেক হালকা হয়ে এল ওর মনের ভাব। বলল,—"এর ব্যাখ্যা ত খুবই সোজা। আপনার আড়াই ঘণ্টার

একনিষ্ঠ চিন্তা মেরীকে আপনার কাছে মূর্ত করে তুলেছিল। সেইটুকুই এর মধ্যে সত্যি। মেরী হয়ত সেই সময় দিব্যি করে কারুর সঙ্গে সিনেমা দেখছিল। কিংবা স্রেফ ঘুমুচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই টেরও পায়নি যে, রাত দশটায় এক রেস্তোরাঁয় বসে খরগোসের কারীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আপনি তাকে নিয়ে একটা ধ্যানলোক সৃষ্টি করে বসেছেন। অবশ্য আপনার মনের মধ্যে সে বাস্তব হয়ে উঠেছিল।"

—"কিন্তু সে আপনারই মনের রচনা। সত্যি মেরী কখনো ওভাবে এখানে আসতে পারত না, মরে গেলেও না। মৃত আত্মার উপস্থিতিও আমি বিশ্বাস করি না। তা মেরী ত বেঁচেই আছে, যখন বলছেন, সে বিয়ে করেছে।"

—"তা সত্যি", ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নাড়ে কুমার,—"কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি ব্যাপারটা একেবারে হালকা করে দিলে। সত্যি, আমি কিন্তু কখনও ভাবি নি যে, তুমি এইরকম ভাবে কথা বলতে পার। তোমাকে দেখে মনে হয় এত নরম-সরম—"

—"এখন দেখছেন নেহাত অতটাই অবলা-সরলা নয়", বলেই অস্থির হয়ে উঠল কৃষ্ণা। ওর দেহের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা ওকে অসহিষ্ণু করে তুলল। হঠাৎ কৃষ্ণা বলে উঠল,—"এ সব থাক, আসল কথা বলুন? কি করে জানলেন যে, মেরী আবার বিয়ে করেছে?"

—"আহা তাই ত বলতে চাইছি, তুমি বলতে দিচ্ছ কই?"

—"আমি? আচ্ছা অপরাধ স্বীকার, এবার বলুন।"

"আচ্ছা শোন," কুমার বললে,—"আমি তখন ভাবলাম, এ কি হ'ল, আমি ত মেরীকে চাই নি, শুধু তার সন্ধান চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধান ত পেলাম না, তার বদলে মিনিট দুয়েকের জন্যে তাকেই পেলাম। এর অর্থ কি? এই সব ভাবতে ভাবতে, পকেট থেকে পাস বার করে আমি তার মধ্যে থেকে মেরীর ছবিটা বার করে নিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দেখছি, আর কি যে ভাবছি, তা জানি না। এমন সময় লোক দুটোর একজন টেবিলে কাঁটাছুরি সাজাতে এল। টেবিলের উপরে ছবিটি দেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে ভাঙা ভাঙা গুমগুমে গলায় অশিক্ষিত উচ্চারণে বললে, 'আই নো দি গর্ল'।

"তাই নাকি?"

—"আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম, 'বলত এর নাম কি' ?"

—'ওর নাম ? মেরী—মেরী—মেরী। কি আমার মনে পড়ছে না। তবে সবাই ওকে মেরী বলে ডাকত মনে আছে।'

—"সবাই—কে ?"

'সবাই, মানে ওর বন্ধুরা।'

—"বন্ধুরা কে ?"

'তুমি পাগল।' লোকটা বললে, 'মেরী প্রত্যেক শনিবার এখানে খেতে আসত।' 'আর জান', লোকটি বললে, 'এইখানেই ওর সঙ্গে আমার ভাগ্নের দেখা হ'ল।'

—"কে তোমার ভাগ্নে ?"

'আমার ভাগ্নে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার।' বুড়ো বললে, 'রবার্ট...কি যেন একটা উপাধি বললে, আমার মনে নেই।' বললে, সে ত গেছে তোমাদের দেশে বাঁধ বাঁধার কাজে।'

—"আমি বললাম, 'তার সঙ্গে মেরীর সম্পর্ক কি' ?"

'দাম্পত্য সম্বন্ধ।' বুড়া হাসলে, 'সে যে ওর স্বামী।'

—"স্বামী ? মেরী বিয়ে করেছে ?"

" 'নিশ্চয়ই, আমারই বোনের ছেলেকে। আমার বোন যে-সে নয়। অনেক টাকার মালিক তার স্বামী। আর ছেলে ত রীতিমত বিখ্যাত। সে যে হঠাৎ এমন করে বিয়ে করবে, তা আমরা ভাবতেও পারি নি। কিন্তু রবার্ট বলত ও মেরীকে বিয়ে করছে বলার চেয়ে মেরী ওকে বিয়ে করছে বলাই ঠিক। কারণ প্রেমের প্রথম টানটা মেরীর দিক থেকেই এসেছে'।"

সেই মুহূর্তে আবার মেরীকে অনুভব করলাম কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মেরীর টান এড়ান কত শক্ত। মেরী যা চায়, তা সে নেবেই। কিন্তু হঠাৎ একে চাইল কেন মেরী সে ত এত খেলো নয়। তবে এটা কি আমার উপরে ক্রোধেরই আর একটা পরিণতি ? নাকি আমার প্রেম ওকে প্রেম চাইতে শিখিয়েছিল। প্রেম ছাড়া ও হয়ত বাঁচতেই পারছিল না। এত কথা তখন অবশ্য আমার মনে হয় নি। শুধু মাথা ঝিমঝিম করছিল। বুড়ো অনেক কথা বকে যাচ্ছিল। আমার কানে ভাল করে তার শব্দগুলোও পৌঁছাচ্ছিল না। হঠাৎ কানে এল বুড়ো বলছে, মেরী কিন্তু তোমাদের

দেশটাকে ভালবাসত। রবার্ট বলত, ভারতবর্ষ দেখার শখ মেরীর এত বেশী যে, আমার এক এক সময় সন্দেহ হয়। ভারতে যাবার লোভেই হয়ত মেরী আমাকে ভালোবেসেছে।”

—‘যাক খবর পাওয়া গেল, যার জন্যে এত সাধনা, অবশেষে তা সিদ্ধ হল। যার জন্যে এত উতলা হয়েছিলাম তা এক মুহূর্তে জানা হয়ে গেল দৈনিক খবরের মত। খরগোসের ঝোল গলা দিয়ে নামল না। দাম রেখে জলের গেলাসটা ঢক ঢক করে শেষ করে আমি বেরিয়ে এলাম। লোকটি বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

—“বাইরে এসে দেখি, আকাশে যেন উৎসব লেগে গেছে। পূর্ণ জ্যোৎস্না থমথম করতে করতে রূপো ছড়াচ্ছে। চারিদিকে ঢালছে যেন রূপের মদ—নাকি সুরলোকের মদ, যা খেলে সুন্দরে কুৎসিতে ভেদ ঘুচে যায়। নইলে কালো-কুশ্রী বড় বড় বাড়ীগুলি চাঁদের আলোয় অমন অপার্থিব মায়াময় হয়ে পড়ে কি করে বল ত। আমার হঠাৎ এত ভাল লাগতে লাগল কৃষ্ণা, এতদিনের মনের ভার যেন কেমন করে হালকা হয়ে গেল। গাছের মাথায় মাথায় ঝিকমিকে জ্যোৎস্নার স্বপ্ন। পীচ ঢালা নেহাতই বাস্তব মোটা রাস্তাটা যেন নন্দনকাননের পথ। আর তার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠছে বসন্তের বাতাস। সেই পথ, সেই বাতাস যেন আমাকে নতুন জীবন এনে দিল। ঘুরে ঘুরে অনেক হেঁটে প্রাণভরে বুকের মধ্যে খোলা হাওয়া পুরে নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম।”

কৃষ্ণা মনে মনে বললে,—‘সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখে অভিমানে কেঁদেছিলাম।’

কুমার বললে, “ঘরে এসে দেখি কে আমার জন্যে পুডিং বিস্কিট আর এক গেলাস দুধ ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। ঠিক বুঝলাম, এ রমলার কাজ। খেয়ে নিয়ে পোশাক-টোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবাতে যাব, হঠাৎ তাকের উপর থেকে মেরীর ছবিটা পড়ে গেল আমার বিছানায়। কি আশ্চর্য। ছবিটা পড়ল কি করে? তুলে নিয়ে দেখি ওর স্ট্যাণ্ডটা পুরোনো হয়ে ছিঁড়ে নড়বড় করছে। এতদিন খেয়ালই করি নি। ছবিটা দেখতে দেখতে আর সন্ধ্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে অজস্র ঘুমে চোখ ভরে এলেও কিছুতে ঘুমুতে পারলাম না; ভোরের দিকে একটু ঘুমুতে পেরেছি।”

হঠাৎ কৃষ্ণা মুখ ফিরিয়ে বললে,—"আজ ত ট্রেন ফেল করলেন, বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিন না এখন। কাল সকালের ট্রেনে গেলেই ত হবে।" ব্যাগ খুলে দরজার চাবি বার করলে কৃষ্ণা।

—"না না, তা কি হয়, আজকেই যেতে হবে। আর একটা ট্রেন আছে রাত এগারটায়। ট্রেনের দুলুনিতে আরাম করে ঘুমুব, আর স্বপ্ন দেখব।"

কৃষ্ণার চোখের দিকে চেয়ে কুমার হাসল। বলল,—"কৃষ্ণা!"

—"কি?" চমকে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণা।

ওর চোখে চোখ রেখে হাসল কুমার। বলল,—"কৃষ্ণা, মেরীর সঙ্গে আরও একটা ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি মুখ আজ আমার স্বপ্নে স্বপ্নে ভাসবে।"

শুনে কৃষ্ণা দরজা খুলে এক ছুটে ভিতরে চলে গেল। আর সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে কুমার ভাবল, ও অমন করে পালাল কেন?

রমলারা বিলেতে এসেছে প্রায় বছর ঘুরে এল। ইতিমধ্যে একটা ছোটখাট সাপ্তাহিকে একটা ছোটখাট কাজ জুটিয়ে নিয়েছে রমলা। ওর নিজের খাওয়া আর হাতখরচাটা তাতেই চলে যায়। তাছাড়া জার্নালিসম্ যেমন পড়ছিল পড়ছে। ভালো একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে আরো প্রায় বছরখানেক লাগবে। ইতিমধ্যে মামাবাবু দেশে ফিরে গেছেন। আবার একবার আসার কথা আছে তাঁর, কতগুলি বক্তৃতা দেবার জন্যে। অবশ্য সেটা শেষ অবধি হবে কিনা কে জানে। রমলার ইচ্ছে করছিল মামার সঙ্গে দেশে ফিরে যায়। কুমার ঠিকই বলেছিল জার্নালিসম্ ওর ধাতে সইবে না। কেন যে ও এসব পড়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছে কে জানে। শুধু সময় নয়, পয়সাও,—সুশান্তর মৃত্যুর মূল্যে কেনা পয়সা,—ইন্‌সিওরেন্স আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড। কেন এই দুর্মূল্য মূল্য দিয়ে জার্নালিসমের ডিগ্রী কিনতে এল কে জানে।—এখানে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদিও এদেশ অনেক বেশী সম্পদশালী এবং পরিচ্ছন্ন। আর মানুষগুলিও বোধ হয় অনেক বেশী শক্তিমান, বেশী কর্মঠ। তবু তার নিজের দেশের নিজের জাতের

চেনাশোনা মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে রমলার মন কাঁদছে। সেখানে নিভৃতে একটা ছোটখাট বাড়ী করে তার অর্ধেক ভাড়া দিয়ে দুখানা ছোট ঘরেই জীবনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেত। পার্থকে মানুষ করে তোলার মত যথেষ্ট সঙ্গয় ওর তো আছে। না, না রোজগার তাকে করতেই হবে। ঐ মৃদু সুরের ছন্দে জীবনকে ভোগ করার ওর শুধু যে অবসর নেই তা নয়, অধিকারও নেই। সুশান্ত বেচারা তো কোনদিন অবসর ভোগ করতে পায়নি। সেই তার অসমাপ্ত জীবনের প্রাণান্ত পরিশ্রমের মূল্যে রমলা তার চিরজীবনের জন্যে অখণ্ড অবসর কিনে নেবে নাকি? না, কাজ তাকে করতেই হবে। সুশান্তর টাকা থাক, তার ছেলের জন্যে। ওর জীবন কাটুক ওর নিজের পরিশ্রমের ফসলে। কিন্তু সেই পরিশ্রম দিয়ে এই মিথ্যের ব্যবসা কেন করবে রমলা?

আগে ভেবেছিল জার্নালিসম্‌ ওর ভালো লাগবে।—ওর মন শিল্পরসিক, সাহিত্যপিপাসু। ও ভেবেছিল, জার্নালিসমে বুঝি সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের পরিণয় ঘটেছে। কিন্তু এখন দেখছে উল্টো ব্যাপার। সাহিত্য থেকে সত্যকে ছেঁকে বার করে নিতে হয়, আর সত্য থেকে সাহিত্যকে। ফোলানো, ফাঁপানো, সাজানো রাঙানো খবরগুলিকে চেঁছে ছুলে, তার উলঙ্গ সত্য-রূপকে বার করতে হবে। সেইটেই প্রধানত শেখবার। সত্যকে চেনা,—কোন্‌টা খবর আর কোন্‌টা নয়, তা দেখতে পাওয়া। এই পর্যন্ত রমলার বেশ লাগে। কিন্তু তার পরের ব্যাপারটাই একটু গোলমেলে, ওটার সঙ্গে রমলা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। শুধু সত্যকে চিনলেই হবে না, তাকে কাগজের মালিকদের ইচ্ছেমত করে তৈরি করতে হবে। একটু কথার রকম ফেরে টর্চের আলো যেন উল্টেপাল্টে পড়ে। সত্যের মাটির মূর্তির গড়ন যায় বদলে। সত্যের উপরে সাহিত্যের সাজ পরাবার দরকার নেই। দেখে যেন মনে হয় সে তেমনি সহজভাবেই আছে। শুধু বিভিন্নমতের বিচিত্র রশ্মিপাত তাকে ভ্রান্ত করে তুলবে মাত্র। প্রসাধনের তেমন দরকার নেই। শুধু হাতের টর্চটি এমনভাবে ঘুরিয়ে ফেলতে হবে যাতে দড়িকে মনে হবে সাপ, আর সাপকে মনে হবে দড়ি,—চাঁদকে মনে হবে যক্ষ্মাক্রান্ত, আর টাকাকে মনে হবে চাঁদ।

এ যেন একটা নতুন রকমের খেলা,—ভারী মজার। এক এক সময়ে

রমলার বেশ লাগে। বিশেষত এখন যেন কিছুদিন ধরে মনটা ওর একটু সহজ মুক্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। মনের এমন একটা সহজভাব বহুদিন পরে ফিরে পেয়েছে রমলা—বোধহয় পার্থর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে বলেই। তার পার্থ। তার খোকা। তার সোনাধন ভালো আছে,—সুখে আছে। রমলা সেদিন দেখে এসেছে নিজের চোখে। দুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস ওর শরীর মনের ভিতরে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে দুই কাজল-কালো চোখের ভিতরে জ্বলে জ্বলে উঠছে। সেদিন ওদের প্রিন্সিপ্যালও তাই বললেন,—"আশ্চর্য ছেলে তোমার শ্রীমতি চ্যাটার্জি!—এত শক্তি, এত উৎসাহও পেল কোথা থেকে? আমার একএক সময়ে কি মনে হয় জানো? ওর মধ্যে তোমাদের প্রাচীন জাত বোধহয় আবার জেগে উঠেছে—কিংবা ও হয়ত তোমাদের নতুন যুগের ভারতবর্ষের দূত। তোমার কি মনে হয়? কোনটা সত্যি?" শুনে রমলা হেসেছিল।—মাতৃত্বের গর্ব ওর প্রাণের মধ্যে খুশীর ঝরণা বইয়ে মুখের হাসিতে ঝরে পড়েছিল। হাসতে হাসতে রমলা বলেছিল—'তুমি ওর টীচার, আশীর্বাদ কর, যেন দুটোই ওর মধ্যে সত্য হয়—ও যেন নূতনকে আহ্বান করতে পারে, আর প্রাচীনকে করতে পারে জাগ্রত। ও যেন পুরোনো জমিতেই নতুন সার দিয়ে নতুন ফসল ফলাতে পারে,—ও যেন নিজেকে ভুলে না যায়,—প্রতিষ্ঠা না হারায়,—ও আর ওর মত সব ছেলেরা।"—

—"ওর মতো আরো কি অনেক ছেলে আছে নাকি তোমাদের দেশে?" প্রিন্সিপ্যাল বললেন,—"ছবি দেখে তো মনে হয়—ভারতবর্ষ যত রসহীন শক্তিহীন ছেলেদের দেশ।"

—আবার সেই জার্নালিজম। সেই সূক্ষ্ম প্রপাগাণ্ডা।—"যা দেখ, তা সত্যি বটে। আবার তার উল্টোটাও সত্যি। সেখানে আলো পড়ে না—দৃষ্টি চলে না। মার্কিন আর ব্রিটীশ পাক্ষিক আর সাপ্তাহিক পত্রগুলিতে ভালো আর্ট পেপারে যে সব নির্জীব রসহীন,—কখনো বা বিকৃত বিকলাঙ্গ মানবশিশুদের ছবি দেখ, তারা ভারতের অনেকটাই জুড়ে আছে, মিথ্যে নয়। কিন্তু তারাই কি ভারতের সত্য পরিচয়?—যে প্রাচীন সভ্যতার অধিকাংশই বালি চাপা পড়েছে, তাকে দেখতে গিয়ে শুধু কি বালিয়াড়িই দেখব—না, তার ভিতর থেকে এখানে ওখানে যে মন্দিরের চূড়াগুলি

মাথা উঁচু করে রয়েছে তাদের দিকেও দেখব।" "কিন্তু।"—প্রিন্সিপ্যাল বাধা দিয়েছিলেন। মুচকি হেসে বলেছিলেন—"এই বালিই তো বর্তমান—ঐ মন্দির তো অতীত।" রমলার বললে,—"শুধু বালি নয় মাটি; যে মাটি দিয়ে ঐ মন্দির গড়া হয়েছিল,—তা এখনো বর্তমান। এখনো আমাদের দেশে কত বিরাট ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করছেন। তোমরা তাদের নামও শোননি। অবশ্য সে-সব ঐ উল্টো প্রপাগাণ্ডার ফলে।"

—"হতে পারে", দ্বিধান্বিত গলায় প্রিন্সিপ্যাল বললেন,—"অবশ্য এটাও ঠিক, যে ভারতবর্ষকে আমরা তেমন করে চিনতে চাইও না। কিন্তু সে কথা থাক,—তোমার ছেলে—" বাধা দিয়ে রমলা বললে,—আমার ছেলের মত এমন আরো অনেক ছেলে"—হঠাৎ রমলার কথা বন্ধ হোল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

"একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?" অবাক হয়ে রমলা বললে,—"কী?" সাহেব অল্প একটু হেসে বললেন, "তোমার মতনও কি এমন আরো অনেক মেয়ে আছে সে দেশে?" রমলা হাসল না, বললে,—আরো অনেক, অনেক। কিন্তু কি হবে তাদের কথা শুনে। যে দেশ হাজার বছর ধরে পরাধীন, তোমার মত স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে তার কথা হাসির ছাড়া আর কিছু নয়। সেসব তুমি কিছুতেই বুঝবে না। তার চেয়ে আমার ছেলের কথা বল? আমার একটু ভয় ছিল, যদি সে প্রথমটা ঘাবড়ে যায়।"

—"ঘাবড়ে যাবে? বল কি!" ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। ও কাউকে এতটুকু ভয় পায় না। ছুটোছুটি মারামারি কিছুতেই ওর সঙ্কোচ নেই। এতগুলি সাদার মধ্যে ওই একমাত্র অন্য রঙের,—কিন্তু তা নিয়ে ওর মনে কোন দ্বিধা তো নেইই, বরং নিজের উপরে জোরটা যেন আরো বেশী। জানো, প্রফেসর হাসলেন,—সেদিন খুব একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল। শুনলে তোমার ভালো লাগবে মিসেস চ্যাটার্জি। তোমার ছেলের গলায় কি একটা সুতো ঝোলানো আছে না? তোমাদের ধর্মের সঙ্গে ওর বোধহয় কিছু সম্পর্ক আছে,—sacred thread?—"হ্যাঁ" রমলা মাথা হেলাল,—আর অমনি ওর মনে পড়ে গেল সেই পৈতের দিনটার কথা। ঠিক আট বছর বয়সেই ওর দাদু ওর পৈতে দিয়েছিলেন।—সেদিন কী

উৎসাহে, কী আগ্রহে ওর দাদু ওকে দ্বিজত্বে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সে পৈতে তো ওদের কাছে একটা ফাংশন মাত্র ছিল না। তার মধ্যে দিয়ে আর্য ভারতের মহিমা যাতে বালকের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ওঠে, এই ছিল ওদের কামনা। ওদের সেই আদর্শের ছোঁয়া যে পার্থর মনের উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তা ওর সংস্কৃত শেখার আগ্রহ দেখেও ততটা বুঝতে পারে নি,—যতটা বুঝতে পারল আজ।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন,—তারপরে শোন, দল বেঁধে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটবার সময় তোমার ছেলের গলার সুতোটা দেখে, অন্য ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠল—"আরে ওটা কি"? পার্থসারথী সুতোটা কোমরে এঁটে বেঁধে গর্বভরে বললে,—"এটা পবিত্র সুতো।"—শুনে ওরা হো হো করে হেসে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওর ঘাড়ে পড়ে ওটা কেড়ে নিতে গেল।

একসঙ্গে একদল, এযে সপ্তরথীর কাণ্ড।—বুক কেঁপে উঠল রমলার! সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন,—"ভয় নেই। তোমার ছেলেকে ওরা কিছুই করতে পারে নি। সে যেমন মার খেয়েছে, তেমনি মার দিয়েছেও বটে। আমি ছেলেদের বকলুম বটে, কিন্তু একটু ভয়ও পেলাম। ছেলেমানুষ তো, আবার যদি সুবিধে পেয়ে ওকে মারে। তাই পার্থকে ডেকে বোঝালাম,—দেখ বাছা, ছেলেদের কাণ্ড। ওরা মিছিমিছি তোমায় ক্ষেপাবে। সুবিধে পেলে আবার হয়ত মারামারি করবে,—তার চেয়ে তুমি ওটা খুলেই রেখে দাও না!" শুনে ও চমকে উঠল,—"সে কি করে হবে?—ওটা যখন পরেছিলাম, তখন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে, ওটা আর খুলব না জীবনে। ঠাট্টা আর মারের ভয়ে তাকে খুলতে যাব!" আমার একটু মজা লাগল,—একটু জিদও চাপল,—আমি বললাম,—"তা খুলতেই বা তোমার আপত্তি কি? তুমি তো সায়ান্স পড়ছ। তোমার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠুক, এটাও আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। তুমি কি মনে কর, ঐ সুতোর মধ্যে থেকে কোন পবিত্র শক্তি লুকিয়ে থেকে তোমায় ঠেলে তুলছে?"—তোমার ছেলে তার কালো চোখে আলো জ্বালিয়ে বললে—সুতোর মধ্যে শক্তি নেই। শক্তি আছে আমার মনে।—সুতোটা আমার শক্তির পরীক্ষা। ওটা একটা প্রতীক মাত্র—প্রতিজ্ঞার প্রতীক। সুতো হিসেবে ওর দাম হয়ত যে-কোন পুরোনো সুতোর চেয়ে বেশী নয়;

কিন্তু ব্রত হিসেবে ওর দাম পুরো জীবনকাল।'' আমি অবাক হয়ে গেলাম, এতটুকু ছেলের মুখের কথা শুনে,—তবু আর একটু পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হোল। আদর্শ রক্ষার গৌরবে ওর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম,—"বেশ, তাহলে কিন্তু তোমার ঐ স্থতোর দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আমি অবশ্য ছেলেদের বলে দিয়েছি,—মারামারি করলে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তা সত্বেও যদি আবার মারে, তাহলে আঘাত পাবার হাত থেকে তোমাকে তো আর বাঁচাতে পারব না। নিশ্চয়ই না, তোমার ছেলে জোর গলায় বলেছিল, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার ব্রতের দায়িত্ব আর কেউ নিতে পারে। এ ভার সম্পূর্ণ আমার।—এর জন্যে মার খেতে হয়, সেও আমার। আর যদি ভয়ে হেরে যাই,—সে হারও আমারি।' আমি সত্যিই সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম"। প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন,— "যদিও আমি এটা সমর্থন করি না,—তুচ্ছ একটা স্থতোর জন্যে এতখানি শক্তির অপব্যয়। তবু এইটুকু ছেলের এত সাহস, আর এত পরিষ্কার মর্যাদা-বোধ আগে দেখেছি বলে মনে হয় না।"

—"কিন্তু"! ভয় পেতে লজ্জা পেলেও বলে ফেলল রমলা। "এতগুলি ছেলেদের বিরুদ্ধে একলা ওকি পারবে? শেষে একটা কাণ্ড না বাধায়"।

"এটা তো বীরছেলের মায়ের উপযুক্ত কথা হোল না",—প্রিন্সিপ্যাল হাসলেন,—"দল যতই ভারী হোক, ন্যায় আর আত্মবিশ্বাসের কাছে বেশী দূর এগোতে পারে না। এটা আদর্শের কথা নয়। জেনো,— বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার কথা। জুলুম সর্বদা জুলুমের কাছেই জব্দ থাকে। তোমাদের গান্ধী কি বলেন জানি না, আমার তো মনে হয়, ভালোমানুষী দিয়ে জুলুমবাজী বন্ধ করা যায় না। যাই হোক, আমরা তো আছি, স্কুলের ডিসিপ্লিনও আছে,—কাজেই ভয় পাবার সত্যি কোন কারণ নেই। তাছাড়া আমি কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, ওর বন্ধুর সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এমন কি আজকাল গুটিকতক স্তাবকও জুটে গেছে,— ও হতেই হবে। যে ছেলে যত ডানপিটে,—তার স্তাবক সংখ্যা তত বেশী।"

"সত্যিই তাই,—পার্থ যখন তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এল,—তখন তাকে ঘিরে এল চার পাঁচটি ছেলের একটা ছোট দল,—হৃষ্টপুষ্ট, গুণ্ডা গুণ্ডা সব ছেলেরা,—স্বাস্থ্যের আভা তাদের সাদা রং রক্তিম করে তুলেছে।

গালগুলি টুকটুকে লাল। কপালে চিবুকে নাকেও লালচে ছোপ, —আর চোখের তারা সমুদ্রের মত গভীর নীল,—কারো বা আকাশের মত ফ্যাকাসে। গলা খোলা চেক সার্ট হাফ প্যাণ্টের ভিতর থেকে প্রায় উঠে উঠে আসছে। ছোট করে ছাঁটা সোনালী চুল অবিন্যস্ত এসে পড়েছে। —ওরা ওদের নীল চোখে কৌতূহল ভরে, প্যাটসারাটীর মাকে দেখতে এসেছে। ওরা যদিও ওদের দুরন্ত প্রাণোচ্ছ্বাস অনেক চেষ্টায় ভদ্র সংযত করে এনেছিল,—তবু ওদের চোখের তারায় আর চিবুকের রেখায় বন্দী দুষ্টুমির উদ্ধত বিদ্রোহ দেখতে পেয়েছিল রমলা। আর অমনি ওর বুকের মধ্যে সমুদ্রের মত কি যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগল। রমলার ইচ্ছে হোল সব কটিকেই একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে। এতদিন পরে ছেলেকে দেখেও শুধু তারই উপরে ঝাঁপিয়ে পডল না দৃষ্টি। সব ছেলেগুলিকেই যেন একসঙ্গে গ্রহণ করল।—পার্থ যেন একা নয়,—সব কটিকেই একসঙ্গে নিয়ে এসেছে। রমলার ইচ্ছে হোল,—পাখীমায়ের মত দুই বিরাট পক্ষ বিস্তার করে ওদের সবাইকে ঢেকে ফেলে। পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে রমলা,— যে যাই বলুক, সব মায়ের মধ্যেই বোধহয় একটি করে ষষ্ঠীবুড়ী লুকিয়ে থাকে।—শিশুর দল নইলে তার চলে না,—মাতৃত্বের ক্ষুধা একটি দুটি সন্তানকে নিয়ে তৃপ্ত হয় না। তার বিরাট অনুভবের জন্যে বিশাল বিস্তৃতির প্রয়োজন।—

পার্থর বন্ধুরা কিন্তু রমলাকে আমল দিল না।—যে রমলাকে যুবক, বৃদ্ধ, এমনকি মহিলারা পর্যন্ত অবহেলা দেখাতে সাহস করে নি—এরা তাকে অনায়াসে অবজ্ঞা করে দূরে সরে রইল। রমলা দেখল ওদের চোখে আছে কৌতূহল আর সন্দেহ,—কিন্তু ভালোবাসা নেই। পার্থ এসে কাছে দাঁড়াল,— 'মা!' 'মা!' রমলা জবাব দিল ছেলেকে বুকে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে রমলার দুচোখ জলে ভেসে গেল। পার্থ কিন্তু তার কান্না হাসি দিয়ে ঢেকে দিল।—মা তুমি খুকী, ছোট্ট একটা খুকী। কাঁদছ কেন? গ্যাখ না আমি কত বড় হয়ে গেছি।—ছমাসে দু' ইঞ্চি লম্বা হয়েছি। গ্যাখ। গ্যাখ। পার্থ জোর করে মায়ের কাছ থেকে একটু সরে এল। রমলা ওকে দুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেখতে লাগল।—খোকা একটু লম্বা হয়েছে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু রোগা রোগা লাগছে। ছাঁচিপানের মত চিকন

গায়ের রঙে একটু যেন পালিস লেগেছে। রুক্ষ চুল একটু কটা। একটা সাদা গেঞ্জীর সার্ট আর সাদা হাফপ্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু যেন ফ্যাকাসে, একটু যেন ডেলিকেট। অন্যদের মতো স্বাস্থ্যের আভা ওকে তো এখনো রঙীন করে তোলে নি। মৃদু হতাশা রমলার মনের মধ্যে একটু একটু ঘ্যান্ ঘ্যান্ শুরু করবার আগেই রমলা শাসন করল নিজেকে। ও ভেবেছিল, বিলেতের স্কুলে ভর্তি হলেই ছেলে তার লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু ঠিক যেমন চাওয়া যায় তাই কি সব সময় ঘটে? না উল্টোটাই? খোকার গাল তো লাল হয়নি এখনো—কিন্তু চোখ ওর আরো কালো হয়ে উঠেছে। কালো হীরের কথা শুনেছে কি কেউ?—খোকার চোখ যেন তেমনি জ্বলছে। রমলার মনে হোল তার ছেলের মধ্যে যেন নূতন শক্তির বিদ্যুৎ জেগে উঠেছে হঠাৎ। আর তারই রসদ যোগাতে বোধহয় দেহ থেকে লাবণ্য একটু ঝরে গেছে। কিন্তু ভাবনার কিছু নেই, কে যেন রমলার কানে কানে বললে, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে ওর লাবণ্য শতগুণে বেড়ে। বিদ্যুতের ফ্যুশ্‌নে ওর স্বাস্থ্য এবং মন দুইই একসঙ্গে দীপ্ত হয়ে উঠবে নবীন মনুষ্যত্বে। আর সেই বিচিত্র কিরণপাত দেখবার জন্যে রমলা বেঁচে থাকবে। এক মুহূর্তে সমস্ত ঘর ভরে একটা উজ্জ্বল নিবিড় ভবিষ্যৎ রমলার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল। ওকে কাছে টেনে এনে রমলা ডাকলে,—খোকা! খোকা অমনি উপুড় হয়ে পড়ল মায়ের কোলে,—খোকা! খোকা—সোনা ধন!—রমলার বুকের মধ্যে ব্যাকুল স্নেহ খোকাকে বুকে করেও আকুল হয়ে রইল। 'প্যাটসারাটী, প্যাটসারাটী!' খোকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল,—"ও, রস্টিন! মা এই দেখ আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড।" রমলা দেখল—সব ছেলেগুলিই পালিয়েছে। একটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাঘেরা কদমছাঁটা ছোট ছোট সাদা চুল,—গলায় ফিতে বাঁধা,—তাতে হুইস্ল ঝুলছে। রমলা তাকিয়ে দেখল—ওর চোখে আছে অনেকখানি কৌতূহল, আর কিছু ভালোবাসা,—একটু বুঝি কৌতুক আর অনেকখানি আশা।—পার্থ বললে,—"মা, আমার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" শুনে ছেলেটি তার নীল চোখে উৎসাহের বাতি জ্বালিয়ে বললে,—"আমার নাম রস্টিন—উইলিয়াম রস্টিন।" রমলা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল,—ওর উদ্যত ফুলো ফুলো হাতটা খুব করে নেড়ে দিয়ে বললে,—"রস্টিন,

ছুটিতে তুমিও কিন্তু এসো আমার কাছে পার্থর সঙ্গে,—কেমন?" রস্টিন বললে,—"আমি ভেবেছিলাম পার্থই আমার সঙ্গে যাবে। আমার বাড়ী ডেভন্‌সায়ারে,—সেখানে খুব ভালো ক্রীম পাওয়া যায়।"

অদ্ভুত ছেলে এই রস্টিন,—সমস্তক্ষণ যেন পার্থকে ছায়ার মত ঘিরে থাকে,—হতে পারে হয়ত পার্থর বিদেশী ভাবভঙ্গী ওর মন টেনেছে—কিংবা ওর দুরন্তপনা আর বড় বড় কথা—

পার্থ বললে,—"জানো মা, আমি বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছি।"—"হ্যাঁ, খুব ভালো শিখেছে," রস্টিনের গর্ব পার্থর চেয়েও বেশী,—"তৃতীয় দিনেই ও ছুটে যাওয়া খরগোস মেরেছিল।"

"সত্যি তুই খরগোস মারতে পারলি?" সেই মুহূর্তে রমলার একটা ছবি মনে পড়ে গেল—বহুদিন আগেকার একটা দৃশ্য—দূরে রাখা ছাগশিশুকে মারবার জন্যে বন্দুক তুলেছিল রমলা—কিন্তু পারে নি,—বুক কেঁপে শরীর থরথরিয়ে উঠেছিল। শঙ্করদা হেসে বলেছিলেন, "তুমি পারবে না রমলা,—ফিরে যাও।—এ পথ তোমার নয়।"—শুনে অনেকেরই মুখ অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন যে লজ্জার ভার মাথায় নিয়ে রমলা পিছনে সরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেকথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রমলার। সে লজ্জার কোন চিহ্ন কি আজ কোথাও অবশিষ্ট নেই? "হ্যাঁ," রমলার ছেলে বললে—হ্যাঁ মা, আমি পারলাম। ছোট সাদা জন্তুটা লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু আমার কিছুই হোল না। অনায়াস সহজ গলায় পার্থ বললে,—"কেন মা? আমি কি খুব নিষ্ঠুর?" রমলা কিছু বলার আগেই কাছে সরে এল রস্টিন,—বললে,—"এটা কি সত্যি কথা?"

—"কী?—কোন্‌টা"? রমলা প্রশ্ন করল।

—"পার্থ বলে, তোমাদের নাকি বাইবেলের মত একটা বই আছে?—তার নাম গীতা?"

—"হাঁ সত্যি!"

—"আর তাতে নাকি আছে,—হত্যা করা দোষের নয়।"

—"কিন্তু কতবার তোমাকে বোঝাব রস্টিন,"—পার্থ বললে,—"হত্যা করা দোষের,—যদি লোভের জন্যে কর। নইলে নয়।"

—"তার মানে?" রমলার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই রস্টিন বললে।

—"তার মানে,—যেদিন থেকে বন্দুক ছোঁড়া শিখেছে সেদিন থেকে মাংস খাওয়া ছেড়েছে প্যাটসারাটী।"

রোগা হবার কারণটা তাহলে বোঝা গেল। এরকম করলে চলবে কি করে এই শীতের দেশে। তর্কে হারিয়ে ওকে বোঝাতেই হবে মাংস না খেলে এদেশে চলবে না। রমলা বললে, "মাংস না খেলেই বুঝি হত্যা করা দোষের নয়। তাহলে নরহত্যাও দোষের নয়। মানুষ তো আর খায় না লোকে?"

—"বাঃ"! পার্থর চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলো হেসে উঠল,—"বাঃ মা তুমি এই কথা বলছ? মানুষ না খাক্ তার টাকাটা তো খায় লোকে, আর সেই জন্যেই তো হত্যা করে,—টাকার লোভে, যশের লোভে, রাজ্যের লোভেই তো যত হত্যা। যেখানে এসব কোন লোভ নেই, যেখানে শুধু সাধুর পরিত্রাণের জন্যে আর পাপের বিনাশের জন্যে হত্যা, সেখানেও কি তা পাপ? তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণও পাপী। তাহলে তো যত বীর, যত দেশপ্রেমিক, দেশের জন্যে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে তারা সবাই পাপী?—হেরে গিয়ে ছেলের কাঁধে মাথা রাখলো রমলা,—"না রে না, এরা কেউ পাপী নয়। তবে মাংস খেলেও পাপ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির আরো যত যত বীর সবাই প্রায় মাংস খেতেন।"

—"তা ঠিক," পাপের জন্যে নয় মা,—এমনিতেই", পার্থের চোখে লজ্জিত হাসি অপ্রতিভ হয়ে উঠল,—"গরুর মাংস খেতে আমার গা কেমন করে।"

ওর সেই গা কেমন করা, রমলা যেন তার নিজের সমস্ত গা দিয়ে অনুভব করলো। তবু বুঝলো,—এতে সায় দেওয়া চলবে না। তাহলে শরীর টিকবে না। তাই পার্থর চোখে হাসিমাখা চোখ রেখে, চুপি চুপি বললে,—"এটা কিন্তু স্রেফ দুর্বলতা।" "দুর্বলতা!" চমকে উঠল পার্থ,—"আচ্ছা খাব,—আস্তে আস্তে একটু একটু করে।"

"বেশতো," রমলা বলেছিলো,—"আস্তে আস্তেই খেও, একটু একটু করে,—ওষুধ খাওয়ার মতো। আমি ব্যবস্থা করে যাব,—যাতে তোমাকে ওরা ভেড়ার মাংস দেয়। খাওয়ার লোভটা ভালো নয় মানি,—কিন্তু না খাওয়াটাকেও একটা ব্যসন করে তোলার মানে হয় না।"

নিজের ছেলে বলে নয়,—নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই ভাবতে চেষ্টা করে রমলা।—পার্থ সত্যিই আশ্চর্য। ওর মনটা ওর বয়সের পক্ষে অনেক বেশী পরিণত।—কারণ ছোট বেলা থেকেই ও পড়েছে অনেক, শুনেছে অনেক, দেখেছেও অনেক। দেখেছে ওর দাতুকে আর ওর নিজের বাবাকে। তুজনের শিক্ষার ধারা তুরকম হলেও, প্রেম এবং আদর্শ ছিলো এক। তুজনের প্রেম তুরকম ভাবে একই আদর্শে ওকে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

দাতুর কাছে তিনবছর বয়স থেকে রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধ চৈতন্যের গল্প শুনে শুনে ওর মুখস্থ। দাতুর ইজি-চেয়ারের পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসে, ছ'বছরের ছেলে যখন তুলে তুলে স্থর করে রামায়ণ পড়ে শোনাত, তখন ওরা আড়াল থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখত, তুই অসমবয়সীর এই সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব। দশ বছর বয়সেই গীতার অধিকাংশ ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আর ওর বাবা ওকে শোনাতেন ইয়োরোপীয় আদর্শের কথা—ইয়োরোপের জীবনবেদ! রবিন্‌সন ক্রুসোর মত সে বাঁচতে চায়, পৃথিবীর এই দ্বীপটাতে,—সব বাধাবিঘ্ন তার বুদ্ধির ছুরি দিয়ে কেটে কেটে, সে বাঁচতে চায় মানুষের মত—তার বাঁচার তাগিদে জন্মায় সায়ান্স, ধরা পড়ে অচেনা বিশ্বের যত অজানা রহস্য—সমুদ্রমেখলা বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে, ছবি হয়ে, ম্যাপের পাতায় বন্দিনী হয়ে শিশুদের জানার সীমানায় এসে ধরা দেয়। শুধু সায়ান্সের কথা নয়,—বাপের কাছে কবিতা শুনতে ভালোবাসত পার্থ। বুঝত না হয়ত, তবু হয়ত ওর মর্মের গভীরে কিছু কিছু বোঝা হয়ে যেত। কবিতার কোন বাছ-বিচার ছিল না—আধুনিক থেকে প্রাচীন, ইলিয়ট থেকে টেনিসন—out of the deep my child, out of the deep—সুশান্তর সেই গম্ভীর গলা হঠাৎ যেন কানে এসে বাজল রমলার। এই পড়ন্ত বিকেলে, লণ্ডনের বন্ধ ঘরে বসে খবরের সামারী করতে করতে সেই সুন্দর গলার স্বর মনে পড়ে গেল রমলার। সুশান্তর পিতৃহৃদয় তখন টেনিসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত, বুঝতে পারত রমলা—তবু বলত—রাখো তোমার টেনিসন—তার চেয়ে অনেক গভীর অথচ অনেক সহজ সত্য—

"আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,

আমার মায়ের দিদিমায়ের পরাণে,
পুরানো এই মোদের ঘরে,
গৃহদেবীর কোলের পরে,
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে।"

—সুশান্ত মাথা নাড়ত, 'যতই বল ওটা মায়ের মনের কথা,—টেনিসনে পিতার। রমলা ঠাট্টা করত,—'ভারী তো বাপ'। শুনে সুশান্ত হেসে উঠত। পার্থও দেখাদেখি কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে অল্প অল্প হাসত। ওদের হাসিতে রাত ঘন হয়ে উঠত। মৃদু আলোয় 'পূরবী' পড়ত রমলা,—শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত পার্থ। রাত গভীর হয়ে, নিঃশব্দ হয়ে রিমরিম করতে থাকত,—তখন একসময় বইটা হঠাৎ বন্ধ করে রমলা বলত,—'আর নয়'। তাকিয়ে দেখতো সুশান্ত ওর মুখে চেয়ে বসে আছে। চোখের জল মুছে উঠে বসত রমলা। সুশান্ত বলত,—'চোখে জল কেন রমলা'? রমলা ভাবত,—কেন? একী কাব্যরসাস্বাদের আনন্দ,—কিংবা মর্মের গভীরে কোন অবর্ণনীয় বেদনা,—কোন নিষ্ফল কামনার শোক,—কোন লজ্জিত জীবনব্রতের ধ্বংসাবশেষ?

—পার্থকে কোলে করে পাশের ঘরে তার নিজের ছোট খাটের ছোট বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসত সুশান্ত। নরম গদী দেওয়া খাটে, নরম বিছানায় সুশান্তর বুকের মধ্যে ঘন হয়ে শুয়ে নরম নরম উষ্ণ চুম্বনের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ রমলার বুক কেঁপে উঠত। একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ ভিতরে ভিতরে ওকে যেন ঠেলতে থাকত। এই সুখে যেন ওর কোন অধিকার নেই। এই নিশ্চিন্ত নির্ভরের সুখ, এ যেন ওর জন্যে নয়। চারিদিকের দুঃখজীবনের মাঝখানে ও যেন কোথা থেকে সুখের ভরা পাত্রটা চুরি করে এনে চুমুকে চুমুকে পান করছে। এখনি যেন কার হাতের তাড়নায় পাত্রটি ফসকে পড়ে যাবে। ভেঙে যাবে চুরমার হয়ে। এই অকারণ অদ্ভুত ভয় ভরা ভোগের মাঝখানেও কখনো রমলাকে ভেসে যেতে দেয়নি আনন্দ সাগরে।—একটা ভাঙা ডালের খোঁচার সঙ্গে আটকে রেখে দিয়েছে—এই তীরে, এই সংসারের বাঁধাঘাটে। সমুদ্রের মত পূর্ণসুখের রূপও দেখেছে বই কি,—ওর পাশেই সুশান্তর মধ্যে। যার মধ্যে কোন ভয়, কোন দ্বিধা, কোন সন্দেহ ছিলো না। সহজ সুখ, সরল আনন্দ যেখানে ভরা

জোয়ারের মত ছলছল করত। যার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ায় রোমাঞ্চ ছিল,—ভেসে যাওয়া ডুবে যাওয়া সহজ ছিলো। কিন্তু রমলা পারেনি। কি ওকে বাধা দিত, কি ওকে টেনে রাখতো, কে ওকে বেঁধে রাখত এই মাটিতে। সুখের সঙ্গে সম্বন্ধে ওর কোথায় যেন খিঁচ ছিলো,—ও তার মধ্যে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারত না। সুখের অর্ঘ্যও তেমন করে নিতে পারে নি, দুঃখও তো গ্রহণ করতে পারছে না,—পারেওনি কোনকালে। শঙ্করের সেই দারুণ দুর্দিনে, সেই বিষম দুঃখের ভার ওকি একদিনও বহন করতে পারত, যদি না সুশান্ত থাকত ওর পাশে। সেদিনও দুঃখের মূর্তি দেখে ও ভয় পেয়েছিলো,—আজ দুঃখের আর একরূপে ও বিপর্যস্ত।—

পার্থর দায়িত্ব অবশ্য সে খুব সহজে বহন করছে। সে তো আর দুঃখ নয়। সেইটুকুই তো এখন ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই তো গৌরব। কিন্তু পরম দুঃখ, এই সঙ্গহীনতা, প্রেমের অভাবের এই শূন্যতা—এর ভার আর সে বইতে পারছে না। রমলা বুঝতে পারছে, বাইরে যতই শক্তি দেখাক, ভিতরে সে ভেঙে পড়চে। দুঃখ পেল, অথচ তার দান জীবনে সার্থক করতে পারল না, এ কী দুর্ভাগ্য। যখন সুখ ছিল রক্তগোলাপের মত জীবনের ডাল আলো করে, তখন তার দিকে ভালো করে চেয়েই দেখনি রমলা, শুধু কাঁটার খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে অকারণ। আজ কেন তবে সেই সুখের জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।

কিছুতেই আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হয় না। এই আসন্ন হেমন্তের নিস্তেজ বিকেলে,—এই বন্ধ ঘরের কাঁচের জানালার বাইরে, দিনগুলি যেন কেবলি মুষড়ে মুষড়ে পড়ছে। ন্যাতাবুলানো ঝাপসা আকাশে মরে যাওয়া সূর্যের ভূতে পাওয়া আলো—আর কেউ নেই,—শুধু কেউ নেই। কুমার আছে ব্রিস্টলে। কচিৎ কখনো একআধটা চিঠি দেয়। মাঝে মাঝে কোন কাজে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। দেশে ফেরার কোন তাড়াই যেন নেই। এদিকে কাকা কাকীমা ভেবে অস্থির হচ্ছেন। ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। মামাবাবু বলেছিলেন, ওর নাকি কি একটা দুঃখ আছে কিন্তু ও নিজে থেকে না বললে, মামাবাবু জানতে চাইবেন না, এই তাঁর পণ। রমলারও সেইরকমই মনোভাব। আজকাল কুমারের কথা মনে হলেই অভিমানে গলা ভারী হয়ে আসে রমলার। সেই কুমার কি

করে এমন পর হয়ে গেল ভেবে পায় না। কি এমন হোল কোথায়। রমলা ভাবতে চেষ্টা করে। তার নিজেরও নিশ্চয় দোষ আছে। কিন্তু সেটা কোথায় দেখতে পায় না রমলা। ভাবে ওর মনে তো স্নেহের কমতি নেই, তবে কেন কুমার আর আসে না ওর কাছে প্রাণ খুলতে। এদিকে শুনেছে কৃষ্ণার সঙ্গে নাকি চিঠি লেখালেখি চলে—অথচ কৃষ্ণাকে বিয়ে করবার কথা বললে হেসেই অস্থির। কৃষ্ণা তো কেম্ব্রিজে ভালোই আছে। এই একবছরে ও যেন বড্ড বেশী চালাক হয়ে উঠেছে। আজকাল চোখে-মুখে কথা,—কথায় কথায় হাঁসি কটাক্ষ। একি বিলেতের জলহাওয়ার গুণ, নাকি কারো ভালোবাসায় পড়েছে মেয়ে কে জানে। আগে তো মনে হোত, যেন কুমারকে বিয়ে করতে ইচ্ছে আছে। আজ-কাল কথা উঠলেই গম্ভীর হয়ে যায়। বলে,—"রক্ষে কর আমার বিয়ের ভাবনাটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। বিলেতে এসে অন্তত বিলিতী কানুন মানা উচিত, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।" কৃষ্ণার ব্যবহারেই সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে রমলা। কৃষ্ণা যেন আর ওকে আমলই দিতে চায় না একেবারে। কাছে থাকলেও যেন থাকে না। যেন কোথা থেকে দুটো পাখা সংগ্রহ করে উড়ে গেছে ও। কথাবার্তা প্রশ্নোত্তর যা কিছু করে সবই যেন বাইরের, সবটাই যেন কৃত্রিম। মনের মধ্যে রমলাদের সঙ্গে যে সুতো বাধা ছিল তা যেন ছিঁড়ে গেছে। এখন শুধু জোর করে ভঙ্গীটুকু জাগিয়ে রাখা, সম্বন্ধটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। অবাক হয়ে রমলা ভাবে,—কেন এমন হোল। ও তো কৃষ্ণার ভালো ছাড়া আর কিছুই চায় না। কিন্তু কৃষ্ণা কেন সব বাঁধন কেটে ফেলতে চায়। রমলা যত এসব কথা ভাবতে চায় না, তত নানা ভাবনা ঘুরে ফিরে আসে। কেন সবই এমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, কেন সম্বন্ধে সম্বন্ধে ঘুণ ধরে, কেন বন্ধুত্ব মলিন হয়ে আসে, প্রেমের সুতোয় পড়ে টান ?

আর ভাবতে পারে না রমলা। মনটা যেন হাঁপিয়ে উঠে প্রাণের দম বন্ধ করে দিতে চায়, ওর সমস্ত প্রাণ চাইছে এখান থেকে ছুটে চলে যেতে, কারু কাছে, কারু স্নেহের আশ্রয়ে। কিন্তু কোথায় যাবে। গৃহসুখ তো ওর জন্যে বরাদ্দ নয়। ওর জন্যে "আছে শুধু পাখা" আর আছে আকাশ আর উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা,—

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।

—না, পাখা বন্ধ করবে না রমলা, উড়ে চলবে, যতদিন না ঘুরে পড়ে মরে। ছোটবেলায় রঞ্জনদার সঙ্গে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যখন দেহের রক্ত জ্বলে উঠত আলোর মত—তখন কে জানত যে এ কবিতা একদিন শুধু রঞ্জনের নয়, শুধু দেশের নয়, তার নিজের নিতান্ত সাধারণ জীবনেরও একান্ত মর্মবাণী হয়ে দাঁড়াবে।

টেবিলের উপরে দুই কনুই ভর করে দুই হাতের অঞ্জলির ভিতরে তপ্ত কপাল শুইয়ে দিল রমলা। 'এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।' না, এখনো সময় হয়নি। এখনো অনেক আকাশ পরিক্রমা করতে হবে। অনেক পথ চলতে হবে। এইখানেই আরো কত দিন মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে, এই ছোট চাকরিতে। এই ছোট ছোট খবরের সত্যমিথ্যার তাস খেলায় মেতে। কেন? পার্থকে ছুটিতে একটু গৃহসুখ দেবার জন্যে, ওর তপস্যার মধ্যে একটু আনন্দের আয়োজন করার জন্যে, রমলাকে এখানে থাকতেই হবে। আর না থাকবেই বা কেন? পার্থ ছাড়া আর ওর কেই বা আছে, যার জন্যে দেশে ফিরে যেতে হবে। অবশ্য মা আছেন,—

মায়ের তো একাকী জীবন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া দেওররা তাঁকে তো মাথায় করে রেখেছেন। আজ এর বাড়ী, কাল ওর বাড়ী,— তাঁর দিন চলে যাচ্ছে। মেয়ে নিজের ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে আছে, দুঃখের মধ্যে তবু এইটুকুতেই হয়ত খুশী তিনি। কিন্তু স্বাধীনতার সুখ রমলা তো হাড়ে হাড়ে বুঝছে। সত্যি স্বাধীনতা কোথাও আছে কি, সবই তো কোন-না-কোন রকমে পরাধীন। রমলা কি স্বাধীন? ওকি নিজের ইচ্ছেমত কিছুই করতে পারে? শত সহস্র 'যদি' আর 'বিধির' ভ্রূকুটি এড়িয়ে, অদৃশ্য নিষেধের যত তর্জনী সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে, ও কিইবা করতে পারে ইচ্ছেমত? আর ইচ্ছেও তো মূঢ়ভাবে চালিত হচ্ছে ঐ তর্জনীর ইসারায়।

স্বাধীনতার জন্যে নয়, এমনিতেই ওকে এখানে থাকতে হবে, দেখতে হবে চেষ্টা করে সুশান্তর ছেলেকে তার ইচ্ছেমত মানুষ করা যায় কিনা। সুশান্তর একান্ত আশা ছিল, তার ছেলের মধ্যে পূব পশ্চিমের দুই বিপরীত

ভাবধারা সংহত হয়ে উঠুক। রমলা জানে পার্থের মধ্যে সেই শক্তি আছে। তাই তো আছে। আরো থাকতে হবে, আরো কত বছর কে জানে, যতদিন না পার্থ আর একটু শক্ত হয়। দেশের স্মৃতি ওর মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে বাধা না পায়। তাই তো আছে এখানে পড়ে। আরো হয়ত বছর আষ্টেক থাকতে হবে। ততদিনে জীবন শেষ হয়ে আসবে, ফুরিয়ে যাবে যৌবন। নিবে যাবে আকাঙ্ক্ষা,—তবে?—এ তো জানা কথাই। সবই তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। সেই চরমকে প্রথম থেকে মেনে নিলেই তো চুকে যায় সব চাওয়া-পাওয়া, সব কাড়াকাড়ি মারামারির ঝামেলা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই তো তাকে মেনে নিয়ে জীবন শুরু করে। রমলাও তাকে মেনে নিয়েছে বই কী? মেনেছে জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে। কিন্তু এখনো কেন প্রাণে মানতে পারছে না। এখনো কেন প্রাণের মধ্যে ক্ষুব্ধ বাসনা থেকে থেকে বিদ্রোহ করে ওঠে। গণ্ডীবদ্ধ মনকে গণ্ডী অতিক্রম করার দুঃসাহসী পথে বার বার ঠেলে দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঠেলে কোথাও তুলতেও পারে না,—ফেলতেও পারে না, নিজের মনেই হেসে ওঠে রমলা। যতই মুক্তি ভালোবাসুক, ভারতের মেয়ের মন সীতার অবস্থা দেখে চালাক হয়ে উঠেছে। ঐ গণ্ডীর মধ্যেই চলে তার সংক্রমণ। গণ্ডী পেরোবার সাহস নেই। এমন কি যদি কোন ভিক্ষুক ঝুলি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, জিদ করে বলে,—অমন দূর থেকে নয়, সীমা লঙ্ঘন করে, গণ্ডী পার হয়ে বেরিয়ে এসে দান কর, তবুও নয়।

হঠাৎ সেই অদ্ভুত রাতটার কথা মনে পড়ে গেল রমলার, যেদিন মার্কাসের সঙ্গে চেডার পজে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন আর একটু হলেই গণ্ডী পেরিয়ে যেত পারত। কিন্তু পারেনি। পাখা ঝাপটেই ফিরে এসেছিল। সেই যেবারে মার্কাস রমলা ও পার্থকে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল, চেডারে ওর মা বাবার কাছে। সেদিন রাত আটটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা সবাই বাগানে বেরিয়ে এসেছিল। সবাই অর্থাৎ মার্কাসের মা আর বাবা। যদিও আকাশে সূর্য ছিল না, তবু তার স্তিমিত আলো ফ্যাকাসে চাঁদটাকে পূবদিকের গায়ে ছবির মত ঝুলিয়ে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল ওটা যেন চাঁদ নয়, চাঁদের ছবি, তাও যেন ভালো ছবি নয়, যেন কোন অক্ষম শিল্পীর দুর্বল তুলির টানে আঁকা। চাঁদটা যদিও তার সমস্ত মহিমা অবলুপ্ত

করে দীনভাবে আকাশের প্রান্তে পড়েছিল, তবু গড়ানে পাহাড়টা থেকে ভেসে আসছিল বুনো ফুলের মৃদু সৌরভ। জায়গাটা এত শান্ত এত সুন্দর যে, সেই মুহূর্তে রমলার সমস্ত প্রিয়জনদের জন্যে মন কেমন করে উঠল, বার বার মনে হোল, কেন সুশান্তর সঙ্গে একবার আসেনি এখানে। তাহলে অনায়াসে এখন হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে আসতে পারত অনেক দূর। এই চমৎকার শান্ত সন্ধ্যায় এই বাগানের ভদ্র পরিবেশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচারটে অবান্তর কথা বলতে ভালো লাগছিল না ওর।—ইচ্ছে হচ্ছিল বেরিয়ে পড়তে, ছুটে চলতে কারু সঙ্গে, যে নিতান্ত আপনার। সে আর কে? সুশান্ত ছাড়া? কিন্তু সুশান্ত তো নেই, না সে তো নেই। কিছুতেই কোনমতেই সে আর আসবে না রমলার পাশে। অন্য কোন বৃহত্তর মহত্তর প্রয়োজন তাকে রমলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কেমন সে প্রয়োজনের চেহারা কে জানে?—কেন মানুষ আসে, কেন যায়। কী প্রয়োজনে এই অর্থহীন বেঁচে থাকার, এই খাওয়া পরা কাজ করা, এই আরাম বিরাম, এই শিক্ষা দীক্ষা ভালোবাসার? যতক্ষণ রমলা শ্রী ও শ্রীমতী 'হিউর' সঙ্গে খুঁটিনাটি গল্প করছিল, ততক্ষণ ওর মনের আনাচে-কানাচে সেই একঘেয়ে চিরপ্রশ্নটা হানা দিয়ে ফিরছিল। স্পষ্টভাবে প্রশ্নটা জেগে উঠতে পারছিল না বলেই, তার ভারে মনটা যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। পার্থ শুতে চলে গেল ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও। জানে এদেশে সাতটার মধ্যেই শোবার নিয়ম, সে ক্ষেত্রে ও প্রায় আটটা বাজিয়েছে। আর দেরি করলে ওর নিজের দেশের মান থাকবে না। কেন যে এই অদ্ভুত নিয়ম এদেশে, পার্থ ভেবে পায় না। ওর অনিচ্ছুক পদক্ষেপের দিকে চেয়ে রমলার মনের মধ্যে উদ্বেল স্নেহ হেসে উঠল। এতক্ষণের বিষাদের ঘোর কেটে গেল যেন হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটে। মৃত্যু যেন দূরে সরে গেল জীবনের দ্রুত সঞ্চালনে।

এমন সময়ে বাগানের ওপাশের ঘোরানো কাঁকরের লাল রাস্তায় গাড়ী থামার আওয়াজ হোল। মার্কাস গ্যারাজ থেকে তার লাল টুসীটারটা নিয়ে এসেছে। দরজা খুলে নেমে এল মার্কাস, বললে,—"হেই হো,—কে কে আমার সঙ্গে ড্রাইভে যেতে চাও হাত তোল।" শুনে শ্রীযুত হিউ হাহা করে হাসলেন, বললেন, "তোমার ঐ টুসীটারে তো আর দুজন ছাড়া ধরে না। তোমার যদি আমাদের নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, তাহলে আমার বড় গাড়ীটা

বার করলে না কেন বাপু ? সত্যি কথা বল তো, আসলে শুধু রমলাকে নিয়ে যেতে এসেছ কিনা ? শ্রীমতী হিউও হাসলেন।

—"নবীন রক্ত নবীন রক্তেরই সঙ্গ খোঁজে,—বুড়োদের নয়।"

—"তা ঠিক নয়," একটু লাল হয়ে মার্ক বললে।

—"তবে রমলা একে অতিথি, তায় বিদেশী, তাই ভাবছিলাম ওকে একটু গর্জের ভিতর দিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে আসব—কি বল" ? রমলার দিকে ফিরে বলল,—"আপত্তি নেই তো" ? একটু চুপ করে রইল রমলা, দ্বিধাভরে বলল, "আপত্তি ঠিক নয়, তবে।"— "তবে আবার কি, যাও না রমলা," শ্রীমতী হিউ উৎসাহ দিলেন, "চেডার গর্জ তুমি তো শুধু একবার দেখেছিলে, তাও দিন দুপুরে, এখন গেলে তোমার খুব ভালো লাগবে, একটু পরে, যখন চাঁদের জোর বাড়বে, তখন অপূর্ব লাগবে,—যাও যাও ঘুরে এস,—"

অবাক হয়ে গেল রমলা, এ কেমন দেশ, কোথাও কিছু বাধা নেই, যেখানে খুশী যখন খুশী গেলেই হোল। রমলা এতক্ষণ ধরে মনে মনে বোধ হয় এটাই চাইছিল, ওর মনের একটা দিক উৎসুক হয়ে উঠল,— অন্যদিকটা দ্বিধাভরে ভাবল,—সেটা কি ঠিক হবে ?

রমলার সেই দ্বিধার দিকে অনুনয়ে চাইল মার্ক,—বললে, "চল না রোমালা,—প্লীজ !" "আচ্ছা চল, কিন্তু খুব শীগ্‌গির ফিরতে হবে," ধীর পায়ে এগিয়ে চলল রমলা,—আর সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেক কালের পুরোনো কিসব ঘুণধরা জিনিস তার পায়ের নীচ থেকে খসে খসে পড়তে লাগল।

পথে মার্কাস কথাই কইলে না প্রায়। রমলা একটু আধটু গল্প জমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু মার্কাস যেন কিসের ঘোরে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেল। একটু অবাক আর একটু অস্বস্তি রমলাকে খোঁচাতে লাগল বটে— কিন্তু পাহাড়ের কোল বেয়ে কালো রাস্তার দিকে চেয়ে ওর সেই অস্বস্তি ভুলতে দেরি হোল না। রাস্তার একপাশে পাহাড় অন্য পাশে কোথাও আপেলের বাগান, কোথাও বা স্ট্রবেরীর ক্ষেত। মিনিট কয়েকের পথ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ওরি মধ্যে দিনের আলো অনেক কালো হয়ে এল, আর চাঁদের গায়ে এল অনেক জোর। গর্জ অর্থাৎ দুধারে পাহাড় মাঝখানে পথের উপত্যকা, তারি এক জায়গায় বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি পাওয়া গেল। সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে গাড়ী

তুলে দিয়ে এতক্ষণ পরে মার্কাস ওর দিকে পূর্ণ চোখে তাকিয়ে হাসল। আর ওদের গাড়ীর বাইরে মধুমাস মর্মরিত হতে লাগল।

হুডখোলা গাড়ীর ভিতরে টপটপ করে ঝরে পড়ছিলো কত সব নাম-না-জানা ফুল। রমলার পিঠের উপরে ঝুলছিল পাতলা একটা নরম কোট, তার ভিতর দিয়ে অনিরুদ্ধ মৃদু শীত ওর শরীরে একটু একটু শিউরে উঠছিল, ওর ধূসর রঙের শাড়ির সরু জরির রূপোলী পাড় চাঁদে মাখামাখি হয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল। জ্যোৎস্না যেন হাওয়ায় উড়ছিল। এই দারুণ রোম্যান্টিক পরিবেশের মধ্যে স্বামী ছাড়া অন্যপুরুষের সঙ্গে যে রমলা কোনদিন প্রবেশ করতে পারে, এমন ধারণা ওর আগে ছিল না। তাই যখন মার্কাস হঠাৎ গাড়ী চালাতে চালাতে এই বাঁকের চওড়া মুখে গাড়ীটাকে ঘাসের উপরে তুলে দিয়ে স্তব্ধ স্টীয়ারিংএর উপরে অলস হাতটা রেখে শরীরটা একটু টান করে দ্রুত চারিদিকে চেয়ে বললে,—'কী চমৎকার রাত!' তখন রমলার হাতে পায়ে আর বুকের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি ধ্বক্ ধ্বক করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল রমলা, লজ্জা হোল ভয় পেতে। বিশেষত মার্কাসের মত ভদ্রমানুষকে ভয় করার কোন অর্থই নেই। তবে কি নিজেকেই ভয় নাকি? কথাটা চকিত বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে চমকে উঠতেই—জোর করে নিজেকে সহজ করে নিল রমলা, পিছনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললে,—"সত্যিই আশ্চর্য রাত। এমন রাতে রবিঠাকুরের গান হলে তবেই চাঁদ পূর্ণ হোত।

দ্বিধাভরে ওর দিকে তাকাল মার্কাস, ভয় হোল পাছে সুর কেটে যায়। তবু বললে,—"তোমার পশ্চিমের সুর ভালো লাগে না রমলা?

—লাগে বই কী। ক্ল্যাসিকাল সুর যখন আধ অন্ধকার ঘরে রেকর্ডে কিম্বা রেডিওতে বাজতে থাকে, তখন রমলার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কারা যেন আকুল হয়ে ওঠে। বিলিতী ক্ল্যাসিক্যালের অতুলনীয় ঝঙ্কার তখুনি যেন ওর স্মৃতির তারে তারে একটু একটু করে বাজতে শুরু করে। রমলা খুশী হোল, মার্কাসকে একথা বলতে পারবে ভেবে, যে, একটা বিষয়ে অন্তত ওদের দুজনের মতের মিল আছে।

কিন্তু রমলা কিছু বলার আগেই মার্কাস আবার প্রশ্ন করল,—"ধর বীঠোভেন?"

—"বীঠোভেন,—সে তো স্বপ্ন", রমলার স্বরে স্বর মিলিয়ে মার্কাসও হাসল। কিন্তু,—একটু সিনিক্যাল একটু অবহেলার হাসি—নিজের ইমোশনকেই ব্যঙ্গের ভান করা হাসি। সহজ কথা সুন্দর হলেই তার জাত যায় আজকের যুগে। সভ্য মানুষের সেকথা বলতে লজ্জা হয়, তাই ব্যঙ্গের ভান করে বলে। তাই মার্কাস তেমনি স্বরে অল্প একটু ঠাট্টা মিশিয়ে ভঙ্গী করে মাথা নেড়ে বললে,—অহো কি মোহময় রাত। এমন রাতে আমার কিন্তু সেই বহুবার শোনা মুনলাইট সোনাটা শুনতে ইচ্ছে করছে।

রমলা বললে,—"আচ্ছা শুনেছি কালা হবার পরেই নাকি বীঠোভেন ওটা রচনা করেছিলেন। বাইরের কান বন্ধ না হলে ভিতরের কান এমন খুলতে পারে না।

সেকথার উত্তর দিল না মার্কাস, রমলার চোখে চোখ রেখে হেসে উঠল, গুনগুন করে গেয়ে উঠল কোন নাম-না-জানা কবির এক লাইন গান :

Blue moon, you saw me standing alone ;
Without a dream of my heart,
Without a love of my own, blue moon,—

চোখ নামিয়ে নিতে ভুলে গেল রমলা, যখন মনে পড়ল, তখন ঠাট্টার হাসি দিয়ে দৃষ্টিকে লঘু করে আনতে চাইল রমলা। বলল, এটা আবার কি গান, কার লেখা ?

মার্কাস বললে, "লেখা যারই হোক, আপাতত গানটা আমার। একান্তই আমার—

Now I am no longer alone, blue moon,
I am no longer alone.

রমলার শরীরে একটু একটু অস্বস্তি উসখুস করে উঠল। হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইলে তা,—ঠাট্টার স্বরে বললে,—"বেচারা চাঁদ। প্রেমিকেরা চিরকাল তাকে কথায় কথায় সাক্ষী মেনে এসেছে। নেহাত জড় বলেই বেচারা এখনো মরে যায় নি,—থুড়ি মরেও মরেনি, ভূত হয়ে ঝুলে আছে আকাশের গায়ে।" বলতে বলতে আবার রমলার মনটা উদাস হয়ে এল।

কিন্তু মার্কাস অধীর চঞ্চল। প্রকৃতির আয়োজন ওর মধ্যে এখনি কাজ করতে শুরু করেছে। ওকে উদাস করেনি, ওকে ব্যগ্র উত্তেজিত করে

তুলছে। ওর আঙুলগুলো অকারণে অধীর হয়ে উঠছে। যেন কী এই মুহূর্তে মুঠি করে ধরতে চায়, যেন কি কেড়েকুড়ে নিতে চায়। কী অদ্ভুত মায়ারাত। শঙ্কিত মার্কাস ভাবে, আর কি মোহময়ী নারী! জ্যোৎস্না রঙের শাড়ি পরে জ্যোৎস্নার রঙে রঙ মিশিয়ে ও কে বসে আছে ছবির রেখার মত, গানের সুরের মত। Blue moon, I am no longer alone—ও কোন দূর দেশের মেয়ে হঠাৎ এসেছে আমার পাশে। সেই বিদেশে কি এই চাঁদ এমনি করেই জ্যোৎস্না ঢালে,—সেখানে কি পুরুষের ধমনীতে নারীসঙ্গের ইঙ্গিত এত উত্তেজনা বহাতে পারে! মার্কাস শুনেছে, সেদেশের মেয়েদের নাকি ছোঁয়া বারণ। ছুঁলেই নাকি ভীষণ কি কাণ্ড ঘটে যায়। তাই ওর সঙ্গে আজ অবধি হ্যাণ্ডসেক পর্যন্ত করেনি মার্কাস।

—যেদিন প্রথম নাম ধরে ডাকার অনুমতি পেল, সেদিন ভেবেছিল, অন্তত অমনি ঠাট্টার ভঙ্গীতেও ফরাসী ঢঙে ওর হাতে মৃদু ভালোবাসার স্পর্শ করবে। কিন্তু পারেনি। ভয় পেয়েছে হঠাৎ। ওকে ভয় করে মার্কাস। ও যে একসঙ্গে টানে এবং ঠেলে ফেলে দেয়। ও আগুন,—শুধু দীপ্তি নয়, জ্বালাও। ওই যে বসে আছে নিষ্ঠুর স্বপ্নের মত। একসঙ্গে যেন মূর্তিমতী আশা এবং আশাভঙ্গ,—যেন মরীচিকা. ছুঁতে গেলেই রূঢ় বাস্তবের পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাবে।

জ্যোৎস্নায় ওর ফ্যাকাসে মুখ আরো ফ্যাকাসে লাগছে। ঘাড়ের কাছে ঈষৎ রুক্ষ চুলের প্রকাণ্ড খোঁপাটা নুয়ে নুয়ে পড়েছে। তাতে একটু আগেই দুচারটে ফুলের অর্ঘ্য ছড়িয়েছে বাতাস। নিজের অজান্তেই ওর দিকে একটু এগিয়ে এল মার্কাস।

পুরুষের এই সব ভঙ্গী রমলার পরিচিত। ও শঙ্কিত হয়ে উঠল। ভাবল কেন এল ও, এই নির্জন চাঁদনী রাতে একলা এক পুরুষের সঙ্গে এই অদ্ভুত সুন্দর পাহাড়ের পথে, ও শুধু শুধু বেড়াতে চলে এল, একথা কে বিশ্বাস করবে। ওকি জানে না, মার্কাস শুধু ভদ্রলোক নয়, পুরুষ এবং ওর প্রেমার্থীও বটে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ রমলা চেষ্টা করল, তার মনটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। শরীরকে খুলে দিল মনের বন্দীশালা থেকে। দিল তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যা খুশী করবার। মন নিয়ে ও শুধু দূরে বসে চেয়ে দেখবে। মন ছাড়া দেহ থাকতে পারে কিনা। মনের সামনে

সুশান্ত এসে গেছে—যেন এই পাহাড়ে পথের নিরালা রাতে সুশান্তর সঙ্গেই ও বেড়াতে গেছে। আর চারিদিক ঘিরে চাঁদ হাসছে, রূপের সুধা উছলে উছলে পড়ছে। ভোগের কোন বাধা নেই, সুখের কোন শেষ নেই। সুখ যেন অনন্ত পূর্ণিমার মত ষোলো কলায় ভরা। সেখানে ক্ষয় নেই, হ্রাস নেই, কৃষ্ণপক্ষের কোন অন্ধকার ইঙ্গিত নেই। পাশে যে বসে আছে সে যেন পরপুরুষ নয়, ওর নিজেরি স্বামী, জীবনপথের সখা,—তাই বাধা দিল না রমলা, মনকে টেনে রাখল না দেহের সঙ্গে। প্রকৃতির এই অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে দেহের প্রকৃতিকে মনের শাসনে বন্ধ করে রাখতে চাইল না ওর প্রাণ। হঠাৎ দুর্বার সাহসে ওর নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল, ও দেখতে চায়, কে ওকে জিতে নেবে, প্রকৃতি না সংস্কার।

আবেগে মার্কাসের গলা বুজে এসেছিল। ওর মুখ থেকে একটা কথাও বের হোল না। ও শুধু এগিয়ে এসে রমলার চুল থেকে একটা একটা করে ফুল বড় যত্নে ছাড়িয়ে নিতে লাগল। আর ততক্ষণ রমলার ঘাড়ের ওপরে তার ব্যগ্র অধীর দ্রুত নিঃশ্বাসের উষ্ণ কার্বনডায়ক্সাইড ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তবু ওর শরীর নিথর হয়ে চুপ করে বসে রইল। কিছুই করল না, পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েও স্তব্ধ হয়ে রইল। ওর স্বাধীন শরীর কত কীই তো করতে পারত। এই মুহূর্তে প্রবল বলে, মার্কাসের মুখটাকে ওর গালের কাছ থেকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে পারত,—কিম্বা ওর দুই ক্ষীণ হাতে তাকে হঠাৎ আলিঙ্গনে বিভ্রান্ত করে তার বিশাল উদগ্রীব সপ্রেম বক্ষের পরে নিঃসঙ্গ জীবনের সমস্ত বেদনা আকুল কান্নায় ঝরিয়ে দিতে পারত। প্রেমের আবেগ কি এক জায়গায় রুদ্ধ হলে, অন্য কোথাও পথ পেতে পারে না?—তাহলে এক ছেলে মরে গেলেও কি করে অন্য ছেলেকে ভালোবাসে? একথাতে তো ভুল নেই যে রমলার বঞ্চিত জীবন আজো প্রেমের কাঙাল—তবে কেন মিথ্যা সংস্কারের এত অহঙ্কার যে, জীবনের এতবড় সত্যকে সে বাধা দিতে চায়? রমলা জানে, এই মুহূর্তে যদি রমলার দেহ, মার্কাসের দিকে এক ইঞ্চিও হেলে, ওমনি সমস্ত বর্তমান ওলোট পালট হয়ে যাবে, উত্তাল হয়ে উঠবে জীবনের ছন্দ। মুহূর্তে রমলার সব ভার মার্কাস তার প্রেমের পাখায় গৌরবে তুলে নেবে, আদরে আদরে তাকে ডুবিয়ে পার্থকে মাথায় করে রাখবে। ওঃ পার্থ—

পার্থ। হঠাৎ মনে মনে দম বন্ধ-হয়ে এল রমলার। ছি ছি, এতক্ষণ কি ভাবছিল সে, সুশান্তর ছেলেকে পরের দয়ায় মানুষ হতে হবে? পার্থ তা কখনো সইতে পারবে না, রমলাও পারবে না, হে ঈশ্বর, এজন্যে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও, পার্থ ক্ষমা কর তোর মাকে।

মার্কাস ততক্ষণে ফুলগুলি ওর চুল থেকে তুলে নিয়ে বাঁহাতটা ওর সীটের পিছনে লম্বা করে মেলে দিয়ে ডান হাতের বলিষ্ঠ চওড়া মুঠি ওর চোখের সামনে প্রসারিত করে ধরল। ওর দুই হাত দুদিক থেকে রমলার পাতলা শাড়ি ঢাকা পাতলা দেহকে আধখানা ঘিরে রইল।—রমলার দেহ পাষাণের মতই অচল। সে এক ইঞ্চির সিকিভাগও কোনদিকেই নড়ল না। মার্কাসের সাদা ধবধবে প্রসারিত করতলে গুটিকতক বিবর্ণ হলদে ফুল। আর রমলার কাণের অতি কাছে মার্কাসের ভাঙা গলার স্খলিত আওয়াজ,—"এই ফুলগুলি তোমার চুলে আটকে ছিল।" চমকে ফিরে তাকাল রমলা। মার্কাসের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। এত লাল মুখ আগে কখনো দেখেনি রমলা। রক্ত যেন জমা হয়ে সারা মুখ ছেয়ে গলা খোলা সার্টের ভিতর দিয়ে নেমে গেছে। আর ওর উত্তেজিত রক্তমুখ রমলার মুখের প্রায় উপরে নেমে এসে কী যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপচে,—এই বুঝি সে মুখের ভারে রমলার সমস্ত অতীত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাবে। রমলার শরীরের সর্বত্র আগুনের হল্কাগুলো সাপের মত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। নিজের অজান্তেই একইঞ্চি সরে গেল রমলা উল্টো দিকে, দেহের উপরে জয় হোল মনের। শত শত যুগের চিন্তাধারার নির্বাক শাসনের ইঙ্গিতে ওর ধমনীতে প্রবাহিত রক্তকণাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্তব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল। মুহূর্তে মার্কাসকে দুহাতে ঠেলে দেবার আগেই নিজেকে প্রচণ্ড ধাক্কায় সরিয়ে নিল মার্কাস। একলাফে ওপাশের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিল।

রমলা চুপ করে বসে রইল সীটের পিছনে হেলান দিয়ে। চাঁদটা এতক্ষণে প্রায় মাথার কাছে উঠে এসেছে। আর তার উপর দিয়ে পাতলা মেঘেরা থেকে থেকে আসা-যাওয়া করছে। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে উত্তেজনাকে শান্ত করে, রক্তের উষ্ণ উত্তাপকে স্নিগ্ধ করে আনছে। দুধারে দেয়ালের মত খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের থ্যাবড়া মাথায় ছোট ছোট নাম-না-জানা

গাছের চারা। তাদের ঝিরঝিরে পাতার শিশির বিন্দুতে চিকচিকে জ্যোৎস্নায় বা মেঘের ছায়ায় ক্ষণে ক্ষণে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। চুপ করে চোখ বুজে বসে রইল রমলা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ধীরে ধীরে তার শরীর জুড়িয়ে আসতে লাগল। দূরে কোন মন্দির থেকে সুরেলা ঘণ্টায় কোন্ প্রহর ধ্বনিত হোল, ঠিক ধরতে পারল না রমলা, কিন্তু সেই সুরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল! মেঘে মেঘে চাঁদ প্রায় ঢেকে গেছে। আলোরা ঝিমিয়ে পড়েছে গাছের মাথায় মাথায়—মার্কাসকে দেখা যাচ্ছে না দূরে কাছে কোথাও।—

কোথায় গেল ও—অবাক কাণ্ড। হুডখোলা গাড়ীর ভিতর থেকে চারিদিকে চেয়ে দেখল রমলা। মার্কাসকে দেখতে পেল না। এই রাতে আর কতক্ষণ এখানে একা বসে থাকবে রমলা। কাল সকালে মার্কাসের মা বাবা নিশ্চয় প্রশ্ন করবেন কিছু। নাও যদি করেন, তবু নিশ্চয় ভেবে নেবেন অনেক কিছু,—যেটা আরো খারাপ! অপরিচিত জায়গায় যদি ঘুম ভেঙে যায়,—পার্থ জেগে উঠে মাকে দেখতে পাবে না, কাল সকালে তার প্রশ্নের কি জবাব দেবে? সে সব যাই হোক, আর কতক্ষণ এমনি করে বসে থাকবে সে? তাই দরজা খুলে অবশেষে নেমে এল রমলা। পিছন ফিরে দেখতে পেল মার্কাসকে। একেবারে পাহাড়ের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, দুইপা ঈষৎ ফাঁক করে। হাত দুটো বুকের উপরে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে! পাগল নাকি! রমলার ইচ্ছে হোল হর্ণটা জোরে বাজিয়ে দেয়। কিন্তু সেই বিশ্রী বিকট আওয়াজ করে এই অপার্থিব সুন্দরের স্বপ্ন ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল না রমলার। তাই হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল ঐ পাহাড়টার দিকে। নীচে গিয়ে জোরে জোরে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল 'মার্কাস' 'মার্কাস'! অনেক ডাকাডাকি করলেও শুনতে পেল না মার্কাস।

তখন খাড়া পথটা দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল রমলা।—পায়ের খোলা চটিটা বিষম বাধা। তার উপরে দুরন্ত বাতাস শাড়ির ভিতরে ঢুকে ফুলে ফুলে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে দিল। রমলার ভয় হোল, পড়ে যাবে না তো? সাবধানে পা ফেলে বেশ কিছুটা উঠে এল রমলা।—মনটায় হঠাৎ একটা ছেলেমানুষী খুশী ঝিলিক দিয়ে উঠল। এইবারে শ্রবণের দূরত্বে এসে গেছে প্রায়! কিন্তু পরের পা ফেলার আগেই ওর

বাঁ পায়ের চটিটা খুলে পড়ে গেল,—গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে। ভাগ্যিস জায়গাটা একটু চওড়া ছিল, নইলে হয়ত ভারসাম্য রাখতে না পেরে রমলার নিজেরও ঐ দশাই হোত। অসহায়ের মত উপরে মুখ তুলে রমলা চেঁচিয়ে ডাকল—মার্কাস, মার্কাস। চমকে তাকিয়ে মার্কাস দেখল চড়াই পথের উপরে একটা শাড়ির বেলুন। হাওয়া ওকে শাড়ি সমেত পাছে উড়িয়ে নিয়ে যায়, এই ভয়ে দ্রুত নামতে লাগল, চেঁচিয়ে বললে, "আসছি"।—শুনে রমলা খালি পা-টা ঠাণ্ডা জমিতে আলতো করে রেখে নিচের দিকে চেয়ে দেখল,—ঘুমন্ত চেডার গ্রামের এখানে সেখানে ক্বচিৎ দু'একটা বিদ্যুতের দীপ জ্বলছে।

মার্কাস এসে দাঁড়ালো পাশে। শাড়ির বেলুনের ভিতর থেকে ওর একটা হাত উদ্ধার করে নিয়ে বললে,—ভয় পেয়েছ রোমোলা—আঃ! নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে বাঁচল রমলা। পুরুষের হাত নইলে রমলার মত মেয়েদের চলে না। তবু কেন এত অহঙ্কার!—মার্কাসের দিকে ভরা চোখে হাসল রমলা—"কি কাণ্ড বল তো? আমাকে বেড়াতে নিয়ে এসে একা বসিয়ে রেখে এই পাহাড়ে চড়ে বসেছ? এদিকে রাত কত বেজে গেল, কে জানে?—এটা কি ধরনের ভদ্রতা হোল বলত?" মার্কাস হাসল। অপ্রতিভ হাসি,—"সত্যি রোমালা। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। আমি নেহাতই বোকা। আস্ত একটা ক্যাড। তুমি কেন বার বার আমাকে ক্ষমা কর বুঝতে পারি না আমি। একি রোমা কাঁপছ কেন?—ভয় করছে?" "না," রমলা হাসল। "ভয় নয়, শীত,—বেজায় ঠাণ্ডা পড়ে গেছে—"

—"সত্যি,—দারুণ ঠাণ্ডা,—বলেছি তো আমি একটা ভয়ঙ্কর ক্যাড। এখন কি করবে রমলা?—নামতে পারবে তো?" অনেক ভালোবাসাভরা ডানহাত দিয়ে ও রমলার পিঠ বেষ্টন করে জড়িয়ে ধরল। রমলা বাধা দিল না,—বাধা দেবার কিছু ছিল না। সেই মুহূর্তে মার্কাস যদি ওকে চুম্বন করত, বাধা দেবার কথা মনে হোত না রমলার। কিন্তু তা করে নি মার্কাস। শুধু তেমনি করেই ওর পিঠ জড়িয়ে মৃদু পেষণে ওর বাহুমূলে ঈষৎ নাড়া দিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল,—"নামতে পারবে তো"? অল্প হেসে রমলা নিজের পায়ের দিকে তাকাল। দৃষ্টি অনুসরণ করে মার্কাস

শিউরে উঠে দেখলে রমলার এক পায়ে চটি নেই।—"একী অন্য পাটিটা কোথায় ?" মার্কাস চেঁচিয়ে উঠেছিল।—

—"ছি ছি চেঁচিও না", ফিসফিস করে রমলা বলেছিল,—"এই জ্যোৎস্নার সুর যাবে কেটে। অন্য পাটিটা পড়ে গেছে।"

"পড়ে গেছে ?" আবার বিস্ময় ধ্বনিত হোল মার্কাসের গলায়।—তোমরা ভারতীয় মেয়েরা সত্যি আশ্চর্য। এই হাওয়ার মধ্যে এই সময়ে ওই জুতো পরে কেউ পাহাড়ে চড়তে সাহস পায় ?—এখন নামবে কি করে শুনি ? উদ্বিগ্ন গলায় মার্কাস বললে,—"অবশ্য আমি তোমাকে অনায়াসে কাঁধে তুলে নিতে পারি। আমার মাসল্‌স খুব শক্ত। আর তুমি তো এত ডেলিকেট।" "হাঃ হাঃ", হেসে উঠল রমলা, "নিচে তো দেখলাম না কাউকে, কোন ব্রাভ্যাডো ফিল্ম কোম্পানীর কেউ ?"

"কেন ? ও !" মার্কাসও হাসল। রমলার কথার ভাবের ঘোর কেটে গিয়েছিলো। মার্কাস বললে, "তা ঠিক, ফিল্ম কোম্পানীর কেউ যখন নেই, তখন ও পোজটা আপাতত থাক, কিন্তু"—

"কিন্তু আবার কী।—আমার একটি মাত্র প্রাণ তোমার হাতে সমর্পণ করতে রাজী নই মোটেই—"তা জানি," মার্কাস ওর চোখে গভীর দৃষ্টিপাত করল। তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সত্যি নামবে কি করে শুনি ?

—"বল কি, একপাটি জুতোর অভাবে পাহাড় থেকে নামতে পারব না ?"—রমলা হাসল। মার্কাসকে এক হাতে শক্ত করে ধরে অন্য পায়ের চটিটা খুলে নিল।

মার্কাস বললে—"এটা কী হোল ?"

রমলা বললে—"নামবার উপায়। দেখ এবারে তোমার আগে নামব,—তোমার চেয়ে শীগ্‌গিরই।" "—বল কি ? খালি পায়ে মোজা নেই,—পায়ে কাঁকড় ফুটবে,—কাঁটা ফুটবে, ওঃ,—" শিউরে উঠল মার্কাস। আর ওর শিহরণের উপরে একটা দ্রুত হাসির ঝাপটা দিয়ে শাড়িটাকে একটু তুলে কোমরে আঁচল বেঁধে নিল। "বাঃ, তোমাকে ভারী স্মার্ট দেখাচ্ছে তো,"—মার্কাসের কথা শুনে রমলা হাসল। মার্কাস ওর চটিটা বগলদাবা করে নিয়ে ওর দিকে তাকাল। তারপরে বললে, "তোমাকে দেখে ভারি

অবাক লাগছে রমলা। মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি কখনো চিনি না। তোমার সুখ দুঃখ অভ্যেস, তোমার ভালো লাগা মন্দ লাগা,—আমার চেয়ে অনেক অনেক দূরে।"

হালকা হেসে ওর গভীর সুরকে বাধা দিল রমলা,—বললে,—"হাঁ, আমরা শুধু দুই জগতের বাসিন্দা নই,—দুই জাতের লোক,—তুমি ডাইনামিক্ আমি স্ট্যাটিক,—তোমার রক্ত লাফাচ্ছে আমার রক্ত ঝিমোচ্ছে। জানো তো আমার দেশে ভিন্ন জাতের লোককে ছোঁয়া বারণ।"

"তোমার দেশে আর কি কি বারণ একটা লিস্ট করে দিও। আমার সবসময় মনে থাকে না,"—মার্কের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গুমরে উঠল।

"রাগ কোর না মার্ক,—মানুষের জাত থাকতে পারে, বন্ধুত্বের কোন জাত নেই,—স্নেহের কোথাও বাধা নেই।" প্রশ্রয়ের সুর কণ্ঠে ঢেলে ওর চোখে ফিরে তাকাল রমলা। সাবধানে নিচে নেমে এল ওরা দুজনে। রমলাকে গাড়ীতে তুলে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মার্কাস। উপরে অনন্ত আকাশ ওদের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। মেঘে মেঘে ছায়া ছায়া জ্যোৎস্নারা লুকোচুরি খেলছিল, আর গাড়ীর জানলার উপরে রমলার হাতখানা অলসভাবে পড়েছিল। অন্যমনস্ক ভাবে সে হাতের সরু সরু চুড়ি তিনগাছা নাড়তে নাড়তে কী যেন ভাবছিল মার্কাস। হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "এটাও কি বারণ নাকি? এও অন্যায়?"

—"কোনটা?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রমলা।

—"এই যে তোমার চুড়ি নিয়ে আমার খেলা করাটা?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই", রমলা হাসল,—"ঘোরতর অপরাধ।"

—"ওঃ তাহলে দুঃখিত," হাত সরিয়ে নেবার আগেই কিন্তু মার্কাসের হাতটা ধরে ফেল্ল রমলা, বলল,—"আঃ তুমি বড় ছেলেমানুষ,—কেবল রাগ! কিছুই জানো না। চুড়ি নিয়ে খেলা করা কি বলছ। এই চুড়ি পরা, শাড়ি পরা, কস্মেটিক করা, তোমাকে স্পর্শ করা, কি তোমার সঙ্গে কথা বলা, তোমার দিকে চেয়ে দেখাও পাপ। জীবনের আনন্দ ভোজে, আমাদের দেশের বিধবার স্থান নেই।"

—"কি বিকৃতি! কী প্রটেস্ক!"—অবরুদ্ধ ক্রোধ যেন পথ হারাল মার্কাসের গলায়।

—"অত রেগো না," রমলা হাসল,—"আজকাল অবশ্য অনেক সহজ হয়ে এসেছে সব, এত কিছু কেউ মানে না,—সবাই প্রায় শাড়ি চুড়ি পরে। এই তো আমাকেই দেখো না,—ফস্ করে কেমন বিলেতে চলে এসেছি।"

—"হাঁ শুনেছি", মার্কাস বললে,—"আজকাল বিধবারা নাকি বিয়ে পর্যন্ত করে তোমাদের দেশে?"

—"হাঁ, শুনেছ ঠিক। প্রায় ষাট সত্তর বছর আগেই এ নিয়ম হয়েছে। বিয়েও যে মাঝে মাঝে দুচারটে না হয় এমন নয়—"

—"তবে?" মার্কাস ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। রমলা দেখল সে চোখে আশার বাতি জ্বালিয়ে বসেছে। রমলা হাসলে,—

"কি তবে?"

—"মানে, তবে, তুমিও তো বিয়ে করতে পারো?" দ্বিধান্বিত গলায় মার্কাস বললো—

সেই মুহূর্তে মার্কাসকে ভীষণ ভালো লাগল রমলার। কী পাগল, কী ছেলেমানুষ, এই একটু আগে কেমন রেগে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছিল। আবার এখনি ছেলেমানুষের মত আশায় অধীর হয়ে প্রশ্ন করছে, বিয়ে করতে পার। ওর সেই ব্যগ্র চোখের পরে চোখ রেখে হেসে উঠল রমলা। পার্থর ছেলেমানুষী দেখে মাঝে মাঝে যেমন হাসে। সেই মুহূর্তে মার্কাসকে ভালোবাসল রমলা। ইচ্ছে হোল ওর মুখের উপর হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দেয়। হয়ত এ ভালোবাসার আয়ু বেশীক্ষণ নয়,—হয়ত যেতে যেতে পথেই এর মৃত্যু হবে। তবু এই মুহূর্তে মার্কাসের প্রতি স্নেহে ওর মন দ্রব হয়ে গেল। মেয়েরা মা হলে বোধ হয় তাদের ভালোবাসার রং যায় বদলে। প্রেমিককে সে দেয় বটে তার প্রাপ্য চুকিয়ে কিন্তু সে দানের চেহারাটা যে অন্যরকম হয়ে যায় সন্দেহ নেই। রহস্যঘন মায়ামাখা আঁকা-বাঁকা পথ অনেক সহজ অনেক মুক্ত হয়ে আসে। যা ছিল নদী, তা হয় সমুদ্র। পূর্ণতর থেকে আর কি অপূর্ণে ফিরে আসা যায়? সমুদ্র কি কখনো নদীজলের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে পারে? তাই বোধ হয় সন্তানের জননীর আর তেমন করে প্রেমিকা সাজা চলে না। প্রেমের অর্ঘ্যে ফাঁকির মিশেল ঘটে,—কিন্তু স্নেহের দান হয়ত হয় পূর্ণতর। এই মুহূর্তে সেই দান ঢেলে দিতে সাধ হচ্ছে রমলার। ইচ্ছে করছে ওর মাথার চুলগুলি নেড়ে দিয়ে কপালে একটা চুমো

দেয়,—ওকে ঘরে ফেরার আগে অল্প একটু খুশী করে দেয়,—লোভী ছেলেকে নিজের ভাগের মিষ্টি দিয়ে যেমন নিজেই খুশী হয় মা। কিন্তু তা করতে সাহস হোল না রমলার। হয়ত মার্কাস ভুল বুঝবে, আর সে ভুলের মাশুল যোগাতে হবে অনেকদিন ধরে। তাই ওর হাতে শুধু অল্প একটু চাপ দিয়ে রমলা বললে,—প্লীজ্ মার্ক, বাড়ী চল।

তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওর সেই হাত দুহাতে চেপে ধরল মার্কাস। বললে,—"তোমার দেশ আর তার ফাঁকা নিষেধের ভয়ে এতদিন তোমাকে স্পর্শ করি নি আমি। আজ তোমার হাত ধরব। তোমার দেশ এখান থেকে সাত হাজার মাইল দূরে। আর তার নিষেধগুলিই বা ক'হাজার বছরের পুরোনো কে জানে? এই বর্তমান দেশে আর বর্তমান কাল মুহূর্তে, আমি তোমার হাত ধরলাম।"—এই বলে রমলার সেই অবশপ্রায় কোমল ঠাণ্ডা হাত মার্ক তার নিজের কপালে আর চোখে মুখে জোরে চেপে ধরে বার বার চুম্বন করল। জড়িত কণ্ঠে বললে,—"রোমোলা রোমোলা। রোমোলা—তুমি আমার প্রেম, আমার রাণী, আমার প্রিয়তমা। এতদিন তোমাকে না দেখে কি করে ছিলাম জানি না। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। আমাকে ভালোবাসতে দাও রোমোলা।" বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না রমলার। শিথিল হাতে ছিল না কোন জোর। বার বার আধস্বরে প্রেম উচ্চারণ করল মার্কাস। রমলার শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে এল,—ভালোবাসার রূপ যেমনি হোক, পুরুষের স্পর্শ নারীকে অভিভূত করে, কামনার ছোঁয়ায় জননী হয় কামিনী। স্খলিত কণ্ঠে রমলা বললে,—"বাড়ী চল মার্ক, অনেক রাত হোল।"

তেমনি স্বরে মার্ক বললে,—"ভয় নেই রোমোলা, ভয় নেই। আমি জানি, আমাকে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে,—হয়ত বা চিরদিন।" তারপরে আর একবার ওর হাত নিজের কপালে বুলিয়ে নিয়ে মার্ক বললে,—"ধন্যবাদ রোমোলা, এমন আশ্চর্য সুন্দর একটা রাত আমাকে দিয়েছ বলে।"

—"কী যে বল," নিঃশ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকাল রমলা,—"তোমার যোগ্য কিছুই দিতে পারি নি। কি করব বল,—আমি গরীব, এর চেয়ে বেশী কিছু দেবার সাধ্য আমার নেই।"

মার্কাস চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল, একথা শুনে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখে চোখে চেয়ে হেসে বললে,—"এটা ঠিক হোল না রোমোলা, তুমি গরীব নও মোটেই, যথেষ্ট ধনশালিনী, তবে কৃপণ বটে।"

সেদিন আর একটু হলেই প্রায় গণ্ডী অতিক্রম করেছিল রমলা। কোন অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলো, কে তাকে ধরে রেখেছিল সেদিন কে জানে। পাহাড়ের কিনারা থেকে টাল খেয়ে পড়ে যেতে দেয় নি কিন্তু মনে মনে কি পা ফসকায়নি রমলার? একথা কি সত্য নয় যে সেদিন ওর মধ্যেও আদি নারীর কামনা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে নারীকে বঞ্চিত করে জয়ী হয়েছে পার্থর মা। ঈভ্‌কে বন্দিনী করে ভাস্বতী হয়ে উঠেছে ম্যাডোনা।

কিন্তু তবু কি সব ভয় গেছে?

এখনি কি প্রমাণ গেছে রমলার মধ্যে কার আহ্বান বেশী সত্যি? কমিনীর, না জননীর? ঈভের, না ম্যাডোনার?

এখনো মার্কাস মাঝে মাঝে আসে,—বারবার জিজ্ঞেস করে যদি কিছু প্রয়োজন থাকে। রমলার বেশী প্রয়োজন থাকে না। নিজের কাজ নিজে করে নেবার অভ্যেস হয়ে গেছে রমলার অনেকদিন আগে। তবু মার্কাস যখন আসে ভালো লাগে রমলার। কোথায় যেন মনে মনে কি একটা জানাজানি হয়ে গেছে। ওকে আর তেমন পর বলে মনে হয় না। সুখদুঃখের কথা ওকে বলে আরাম পায় রমলা। পার্থ স্কুল থেকে ফিরে এসে যখন সব গল্প করল, তখন মার্কাস সত্যিই খুশী হয়েছিলো। পার্থকে ভালোবাসে মার্ক। বন্ধুর মত গল্প চলে দুজনে।

রমলার ভাবনাগুলো প্রায়ই এমনি স্মৃতির দরজায় হুড়মুড় করে ভিড় করে। কি করবে ভেবে পায় না ও। মাঝে মাঝে সুশান্তর জন্যে মন কেমন করে। ঠিক সুশান্তর অভাবে নয়,—অভাব নেই বলেই। নিজেকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মনে হয়। সুশান্ত ছাড়াও বেশ তো দিন চলে যাচ্ছে। অবশ্য দিন কারু জন্যে বসে থাকে না। এই তো এখনি যদি রমলাই হঠাৎ মরে যায়,—কাল কি কারু জন্যে একমুহূর্তও থামবে? মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই সে যে শুধু দেহেও থাকবে না তা নয়, মনেও থাকবে না,—কারু মনেই নয়। মৃত্যুমুহূর্ত থেকেই স্মৃতি আপন কাজ করে চলে,—কাজ তার মোছা। নিজের লেখা নিজেরই জন্যে মুছে মুছে চলা। সেই মোছার তাগিদে মুহূর্তে রমলা পর

হয়ে যাবে,—এমন কি পার্থর কাছেও,—মায়ের কাছেও, আর যে মার্কাস নবীন ভালোবাসা বুকে পুরে প্রতীক্ষা করে আছে, তার কাছেও। কারু সিকি পয়সার প্রয়োজন আর থাকবে না তাকে দিয়ে। তাকে ছাড়াই সমস্ত সংসার বেশ চলে যাবে।

কিন্তু জার্ণালিসমের এই চাকরিটাও বোধহয় চলে যাবে, আর বেশীদিন টিকবে না এরকম করলে। একটা সাধারণ খবর তৈরি করতে এত দেরি! নিজের উপরে রাগ হোল রমলার। এত খামখেয়ালী মন নিয়ে কোন কাজ করা যায় না। এদেশের মেয়েরা সত্যি অনেক বেশী এফিসিয়েন্ট, কী কাজই করে, তবু ক্লান্তি নেই। তারপরে কী করে যে আবার সাজ করবার আর প্রেম করবার সময় পায় কে জানে। যাই হোক আপাতত আলো জ্বেলে বসবে রমলা কাজটা শেষ করে তবে উঠবে।

উঠল যখন আটটা বাজে। এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে বসে বসে পা ধরে গেছে রমলার, ইচ্ছে করছে বেরিয়ে পড়ে। যদিও ঘরে তার খাবার আছে, তবু কোন ছোটখাট দোকানে গিয়ে, কিছু আলো কিছু হাসি, কিছু লোকজনের মধ্যে বসে অল্প কিছু খেতে খেতে জীবনের উজ্জ্বল দিকটার মধ্যে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে হোল। চুলটা একটু আঁচড়ে, কোট গায়ে দিয়ে নেমে এল রমলা!

বেশীর ভাগ দোকানই কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে,—মানে যেগুলো সস্তার দোকান, রমলার এই মেকি সিল্কের আটপৌরে শাড়ির মতন আটপৌরে দোকানগুলি। বড় হোটেলে আলোঝলমল রাত কিশোরী মেয়ের মত এখনো মুখ তুলে চায় নি। রমলা যদি দামী শাড়িতে দামী সুগন্ধি মেখে একটা ট্যাক্সি করে সেখানে গিয়ে নামে, অমনি কালো পোশাক পরা বিলিতি চাকর এসে সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দেবে। অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে ভিতরে,—সেখানে ঝক্‌ঝকে পোশাক আর ঝমঝমে সুর আর শতখণ্ড কাঁচপাত্রে ঠিকরে-পড়া বিদ্যুতের চক্‌মকিতে মনটাকে যেন কিছুক্ষণ ধাঁধা লাগিয়ে দেবে। মনে করতেই হাঁফ ধরল রমলার। তার চেয়ে এই নিসঙ্গ স্তিমিত সন্ধ্যায় একা একা হাঁটা অনেক ভালো! এই রকম একা একা হাঁটতে এক এক সময় রমলার যেন নেশা ধরে যায়। কি অদ্ভুত স্বাদ ওর শরীরের রোমকূপে কূপে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়াঢাকা

ভালোলাগা,—কেমন অদ্ভুত একটা অন্তরঙ্গতা। কার সঙ্গে? তা জানে না রমলা। তবু মনে হয় যেন বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে,—যেন একটা জানাজানি বোঝাবুঝির কিনারায়, কাকে জানা—কি বোঝা তা কে জানে। তবু যেন নরম সহানুভূতির মতন কি একটা জড়িয়ে ধরে মনকে। হেঁটে হেঁটে চলে যায় অনেক দূরে,—ওদিকে মোড়ের মাথায় একটা ছোট চীনে খাবার দোকান খোলা থাকে অনেক রাত অবধি জানা আছে, কিন্তু এখনি কোন ঘরের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না—একেবারেই না। মাঝে মাঝে এরকম একা ঘুরতে ভারি ভালো লাগে রমলার,—অথচ সাধারণত মেয়েদের যে তা লাগে না, রমলা ভালোমতেই জানে। বিশেষত এই সন্ধ্যে বেলায়, এদেশের মেয়েরা সাধারণত চায় ঐ রকম কোনো আলো-ঝলমল, সুরে ঝমঝম রেস্তোঁরায় ঢুকতে, অনেক আলো, অনেক আওয়াজ আর অনেক ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রাণটাকে চুবিয়ে নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্যে মনের দম বন্ধ করে দিতে। নিজের মনের সঙ্গে একা একা কথা কইতে ভয় পায় এরা, ভয় পায় মুখোমুখি দাঁড়াতে। তাই অবসরগুলিকে দম দেওয়া কলের গাড়ীর মত খুব কষে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু এই যে রমলা চলেছে, ওতো সত্যিসত্যি একা নয়। ওরা দুজনেই তো চলেছে,—হাতে হাতে ধরে,—ও আর ওর মন।

চলতে চলতে একটা বাস স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল। আর যে বাসটা প্রথম এসে দাঁড়াল তাতেই উঠে পড়ল। নম্বর দেখল না, কোথায় যাচ্ছে তাকিয়ে দেখল না। শুধু ব্যথিত পাদুটোকে বিশ্রাম দিতে উঠে বসল। কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে গাড়ী চলল গড়িয়ে। প্রথমটা খেয়াল করল না রমলা। যখন করল, তখন দেখল,—চলেছে শহর ছাড়িয়ে, উত্তরমুখে, সেই জু-গার্ডেনের দিকে। পাশ দিয়ে খালের মত বাঁধানো জলধারা,—এতো টেমস্। নাঃ এখন নামতেই হবে। নেমে একটা ফিরতি বাস খুঁজতে হবে। না পায়, তো নামবে ভূমিগর্ভে বিদ্যুৎবাহিত লৌহযানে।

নেমে পড়ল রমলা। রেলিংএ ঘেরা বাঁধানো পেভমেণ্টের নীচেই মলিন টেমস্ সন্ধ্যার রঙের সঙ্গে ছায়ার মত মিলিয়ে আছে। রেলিং ধরে তাকিয়ে দেখে রমলা, দূরে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি'র সরু চূড়ার কোণে এখনো লেগে আছে কয়েকটা সোনার আঁচড়ের দাগ। যদিও একে ঠিক নদী বলে বোঝা

যাচ্ছে না, —তবু নদীতীর জনবিরল। শানবাঁধানো পথটায় অপরিচিত শঙ্কার ঘনায়মান সন্ধ্যা।

অজানা আশঙ্কা হঠাৎ রমলার গায়ে পায়ে ছমছম করতে লাগল। রমলা চেষ্টা করল তাকে আমল না দিতে। তবু একটু জোরে পা চালাল রমলা,—কোন্‌দিকে তা না জেনেই,—এদিকে ধারে কাছে একটা পুলিস অবধি দেখতে পাচ্ছে না যে, জেনে নেবে টিউব স্টেশনটা কোন্‌দিকে। যেদিকেই হোক, যেতে যখন হবেই তখন একদিকে পা চালালো রমলা। একদিক দিয়ে কোন-না-কোন দিকে পৌছানো যাবে নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা মিলল একটি মানুষের। গাছটার ঝাঁকড়া ছায়া আড়াল করে রেখেছিল তাকে। দেখে ভরসা হোল রমলার। এতক্ষণ যে এই জনশূন্য সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন রাস্তায় একটু একটু গা ছমছম করছিল,—তা মানুষেরই ভয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মানুষকে দেখেই আবার ভরসা হোল রমলার। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা রেলিং-এর উপরে উঠে বসে আছে কেন। সামনে ধূসর আকাশ প্রতিক্ষণে কৃষ্ণতর হয়ে আসছে,—নীচে নদী আরো কালো। এই সময়ে ওই মানুষ অত উঁচুতে উঠে বসে আছে কেন? আরো অদ্ভুত, লোকটা বোধহয় ভারতীয়। বোধহয় নয়, নিশ্চয়ই। মাথার উপরে উঁচু মতন জিনিসটা পাগড়ী না হয়ে যায় না।

রমলার কেবল মনে হতে লাগল,—লোকটা পাগল। হঠাৎ পাগড়ীটা মাথা থেকে খুলে নিয়ে পাশে রেখে দিল লোকটা। একপা দু'পা করে সরে পড়াই ভালো। রমলা ভাবল,—পথের খোঁজ করতে গিয়ে পাগলের পাল্লায় পড়ার কোন মনে হয় না। তাঁর চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই ভালো। কিন্তু সরে পড়া হোল না রমলার,—তার আগেই লোকটা দুহাতে ভর দিয়ে আধবসা ভাবে উপরের রেলিং-এ পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে রমলার গলা থেকে তীব্র চীৎকার নির্জন সন্ধ্যাকে চিরে চিরে কেটে দিল। একী পড়ে যাবে যে,—টাল খেয়ে রেলিং ধরে নিজেকে সামলে নিল লোকটা, রেলিং ধরেই ঝুঁকে এদিকের ফুট পাথে লাফিয়ে নেমে পড়ল। তার কঠিন বিস্মিত দৃষ্টিতে স্তব্ধ ভর্ৎসনা।

রমলা বললে,—"কী কাণ্ড, পড়ে যেতে যে!" লোকটা তেমনি স্থির তে রমলার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। রমলার সমস্ত

শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। পাগল,—নির্ঘাৎ পাগল। লোকটা এগিয়ে এল, একেবারে কাছে এসে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললে,—"আমি পড়ে যেতাম তো,—তোমার কী ?"

"বাঃ," রমলা ক্ষীণকণ্ঠে তিনপা পিছিয়ে এল,—"পড়ে গেলে তো বাঁচতে না।"

—"নাই বাঁচতাম, তোমার কী ?" নাটকীয় ভাবে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। আরো তিনপা পিছিয়ে এল রমলা। বললে,—"যদিই দৈবাৎ না মরতে, তো জখম হয়ে পড়ে থাকতে হোত, তার উপরে পড়তে পুলিশের হাতে।"

—"তাতে তোমার কী ?"

—"বেশ, যদি তোমার আত্মঘাতে বাধা দেওয়া অন্যায় হয়ে থাকে, তো ক্ষমা চাইছি।" কথা কইতে কইতে রমলার ভয় কেটে গেল ; ও বললে,—"বেশ তো তুমি আবার ওঠ রেলিং এর উপরে,—যতবার খুশী পড় আর মর। শুধু আমার একটা উপকার করে যাও। যদিও আমি তোমার অপকার করেছি, অবশ্য তোমার মতে।"

লোকটা একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে চুপ করে রইল। তারপরে ভুরু কুঁচকে. ঘাড় নাচিয়ে বললে—"কী উপকার ?"

"টিউব স্টেশনটা কোন্‌দিকে ?"

"কেন ?"

—"কেন ?—বাড়ী যাব বলে।"

—"ওঃ আচ্ছা এস,—লোকটার মাথা ঠিক না থাকলেও বুদ্ধি ঠিক ছিল। রমলাকে চুপচাপ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল,—স্টেশনের কাছে এসে হাত তুলে স্টেশনটা দেখিয়ে দিল। নিশ্চিন্ত হয়ে রমলা বললে—"অনেক ধন্যবাদ,—"

কিন্তু ও পেছন ফিরে স্টেশনে ঢুকবার আগেই লোকটা হাত তুলে পাগলের ভঙ্গীতে বললে,—"স্টপ্"। ভয়ে ভয়ে ফিরে দাঁড়াল রমলা—"কী ?"

—"তুমি ভারতীয় ?"

—"হাঁ, বাঙালী।"

"ও সব এক, সব এক, বাঙালীও যে পাঞ্জাবীও সে,— ভারতীয় মেয়ে মানেই ভারতীয় মেয়ে।"

রমলা চুপ করে রইল, সে বললে, "জানো আমার একটি ভারতীয় স্ত্রী

ছিল?" রমলা মাথা নাড়ল। টিউবস্টেশনের ভিতরে দুচারজন করে লোকজন যাচ্ছে আসছে, বাইরে দাড়িয়ে রমলার বেশ একটু শীত শীত করছে, তবু রমলা ওকে বাধা দিয়ে চলে যেতে পারল না। "আমার স্ত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা, সে কলেজেও পড়েছে জানো"? পাগল গর্জন করে ধমকে উঠল যেন দোষটা রমলার, তবু রমলা চুপ করে রইল। লোকটা বললে, "সে চাইত তার স্বামী খুব মস্ত লোক হোক, অনেক অনেক বড়,—" বলতে বলতে স্বর নরম হয়ে এল,— "অনেক নাম, অনেক খ্যাতি। সবাই যেন তার স্বামীকে জানে মানে। কিন্তু কেউ তার স্বামীকে মানত না। মানবে কেন? বি-এ পাশ করে যে ছেলে বছর চারেক ধরে একটা চাকরি বাগাতে পারল না, তার উপরে আশনাই করে একটা বিয়ে করে বসল। কে তাঁকে মানবে জানবে? কিন্তু তবু কমলা চাইত সবাই জানুক আমার নাম। তার বাপের বাড়ীর সবাই জানুক যে, সে যাকে বিয়ে করেছে, সে ধনে গরীব হলেও মানে ধনী।" রমলা বললে, "রাত হয়ে যাচ্ছে, তোমার বাড়ী কোন্‌দিকে? যদি কাছে হয় হেটেই চলো না। তোমাকে পৌছে দিয়ে এসেই নাহয় আবার ট্রেন ধরব। কিংবা যদি বাস একটা পাই।"

লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে রমলার দিকে তাকাল, বললে—"দরকার নেই, আমাকে তোমার বাড়ী পৌছে দিতে হবে না। আজ রাতের মত মৃত্যুর কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। পর পর এই কদিন হোল যতবারই মরতে গেছি, একটা না একটা বাধায় ঠেকে গেছে। বোধহয় মরা এযাত্রা আমার নসীবে লেখা নেই। হয়ত এ জন্মেই কমলার সঙ্গে ফয়সলা সেরে নিতে হবে।" রমলা স্টেশনের সেডের ভিতরে ঢুকে এল। লোকটাও সঙ্গ ছাড়ল না, পিছনে এসে বললে,— "তোমরা ভারতীয় মেয়েরা মনে কর তোমরা খুব সতী! না?" রমলার বাক্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অতি ধীরে সে ঘাড় নাড়ল,—"না"।

—"না নয়, হাঁ; নিশ্চয়ই "হাঁ"; তোমাদের ধারণা তোমরা সতী, স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারো, এত ভালোবাসা! ভুল ভুল, সমস্ত ভুল, একেবারে মিথ্যে,"—চেঁচিয়ে উঠল পাগল।

রমলা ফিসফিস করে বললে—"আস্তে"। পাগল বললে, "তোমরা

কেবল নিজেদেরই ভালোবাসো, নিজেদের আদর্শকে; স্বামীর মধ্যে পেতে চাও তাকেই। স্বার্থপর ভালোবাসা তোমাদের, দারুণ স্বার্থপর। স্বামীর মধ্যে দিয়ে পেতে চাও নিজের নাম, নিজের সুখ, নিজের গর্ব। কেন তোমরা স্বামীর জন্যেই তাকে ভালোবাসো না। সে যেমনই হোক তেমনই। কেন স্বামীকে একেবারে নির্দোষ দেখতে চাও। কেন তার দুর্বলতাকেও ভালোবাসো না? আমি ভেবেছিলাম কমলা দেবী, স্বর্গেও তার প্রেমের তুলনা নেই। কমলাও তাই ভেবেছিলো, এখনো বোধহয় তাই ভাবে। কিন্তু হাঃ হাঃ কমলার সেই স্বর্গীয় প্রেম এতটুকু বদনামের টাল সামলাতে পারল না। হাঃ হাঃ সে ছিটকে পড়ল। যাক্ তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম, যাও যাও বাড়ী যাও।" পাগল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমলার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ পরে একটু স্বাভাবিক ভাবে হাসল।

হঠাৎ রমলার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। অভাগা লোকটার দাড়িগোফের জঙ্গলের উপরে শীর্ণ মুখের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল তার ভিতর থেকে এক জোড়া তীক্ষ্ণ ছোট ছোট ক্ষুধার্ত অতৃপ্ত চোখ ওর মনকে পীড়িত করে তুলছিল। পাশের বেঞ্চিটায় বসে পড়ে রমলা বলল। তোমার গল্পটা শেষ কর না মিঃ সিং, শুনতে আমার ভালো লাগছে।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটা। বিশ্বাস করতে একটু দেরি হোল বোধ হয় কথাটা। তারপরে খুশী হয়ে একপাশে বসে পড়ল,—"সত্যি বলছ, সত্যি তুমি আমার গল্প শুনতে চাও? আমার আর কমলার? বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার চোখ,—বললে—জানো—কমলা আমাকে তার সব গয়না দিয়ে দিয়েছিল,—সব গয়না। আমি চাইনি,—আমি বারণ করেছিলাম,—বলেছিলাম,—কি হবে কমলা আমাদের এত হৈ-চৈতে? অনেক নাম, অনেক খ্যাতি, অনেক বিত্তে দিয়ে কী এমন লাভ হবে? তার চেয়ে এইখানে এই শহরতলীতে ছোট-খাট একটা দোকান করি। তুমি যখন আমার সঙ্গে কষ্ট সইতে রাজীই হয়েছ, তখন এস না, এখানেই দুজনে মিলে কষ্ট করি। ও শুনল না, —বলল,—'না, তোমাকে বড় হতেই হবে,—অনেক অনেক বড়। আমার বাপ-ভাইএর চাইতেও বড়। অনেক নাম, অনেক ধন, অনেক চরিত্র।' বেচারা কমলা জানত না ওর কোনটাই আমার নেই। ও গয়না

বেচে আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে নিজে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিল। আমি এসে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ভর্তি হলাম। কিন্তু পাশ করতে পারলাম না। কমলা বুঝল না, যে, বিদ্যে না থাকলেও আমার মন আছে, পাশ না করলেও আমি মানুষ,—ভালোবাসা পাবার যোগ্য।

"বাপের বাড়ীতে নাকি ওর মাথা কাটা গেল। না হয় গেলই,—ওর ভালোবাসা কেন ওর লজ্জার উপরে উঠতে পারল না?—তবে ওর কিসের গর্ব? তবে ও কেমন সতী? ও কেন স্বামীকে ভালোবাসতে পারল না, শুধু তার মহত্বকে ভালোবাসতে চাইল! কেন? আমি তো চিরকাল ওর মহত্বের খোলস খুলে ওকেই ভালোবাসতে চেয়েছি, পারিনি। সর্বদা মনে হোত ও আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচুতে। বাপের ঘরের ঐশ্বর্য ফেলে ও আমার মত দরিদ্রকে বরণ করেছে শুধু প্রেমের গৌরবে। আর সেই গৌরব বাড়াবার জন্যেই বোধ হয় গয়না বেচে নিজে মাস্টারী করতে করতে স্বামীকে মানুষ করতে লাগল। দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করে উঠল। আর ওর বদান্যতার প্লাবনে,—এই সাতহাজার মাইল দূরে বসে আমি অনবরত কুঁকড়ে যেতে লাগলাম।

"ওকে দূর থেকে যত বেশী ভালোবাসলাম, তত কেবলি পা পিছলে পিছলে পড়ে যেতে লাগলাম। এদেশের মেয়েরা ফুলের মত রঙীন, সুন্দর। এদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। এরা অস্পৃশ্যা বা অসূর্যম্পশ্যা নয়। এরা মানুষ, এরা নারী,—তোমরা শুধু সতী, শুধু ভালো। মানুষ নও, তাই মানুষকে ভালোবাসতে পারো না, খালি দেবতাকে ভালোবাসতে চাও। আমার অনেক সময় মনে হয়, কমলা যদি অত ভালো না হোত, অমন কঠিন সতীত্বের বর্ম দিয়ে নিজের চারিদিক ঘিরে না রাখত, মাঝে মাঝে ওরও যদি আমারি মতন পদস্খলন হোত, তাহলে ও আমার কাছ থেকে অত দূরে, অত উঁচুতে থাকতে পারত না। তাহলে হয়ত আমরা মিলতে পারতাম। জানো, আমি ওকে এত বেশী ভালোবাসতাম, এত বেশী শ্রদ্ধা করতাম যে, সর্বদা ভয়ে থাকতাম, পাছে ওর গায়ে ব্যথা লাগে। পাছে কোথাও ওর সুকুমার রুচিতে বাধে, পাছে ওর পবিত্র চরিত্রে আঘাত লাগে।"

রমলা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। অন্ধকার একটু একটু করে জমছিল কাদার

তালের মত। নিয়ন সাইনের ভুতুড়ে বাতিগুলির জোর বাড়ছিল, আর রমলার প্রাণের মধ্যে ফেরার তাগিদ অস্থির হয়ে উঠছিল, তবু রমলা চলে যেতে পারল না। পাগল বললে,—"আর আমার এই স্ত্রী,—দেখে এস গিয়ে একদিন, ঠিকানা দিচ্ছি, আমি তাকে যেমন ইচ্ছে চালাতে পারি, যেদিকে ইচ্ছে ফিরাতে পারি,—এখুনি বাড়ি গিয়ে হ্যাঁচকাটানে রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে পারি ছেলেদের সামনে। ও রাগতো করেই না, বরং খুশী হয়, হয়ত একটু গর্বিতও। আমি ওকে চিনি, জানি, ও আমারি মতন মানুষ। তাই আমাকে ও ভালোবাসে। আমার সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও। আমাক মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলে ও গালাগাল করতে করতে আমায় তুলে এনে শুশ্রূষা করবে। ও আমার জন্মে খেটে খেটে অস্থিচর্মসার করেছে। ওর রোজগারের প্রায় সবটাই আমি ছিনিয়ে নিয়ে মদ-জুয়ায় ঢেলে দিই,—আমি যত অধঃপাতে যাই, ও তত আমাকে ঢেকে ধরে। আর তোমাদের কমলা, তোমাদের দেবী আমার একটু বেচাল বরদাস্ত করতে পারল না। কোথায় কার কাছে কি খবর পেল, আমি কার সঙ্গে চা খেয়েছি, কার সঙ্গে সিনেমায় গেছি,—অমনি ঠিক করে ফেলল যে, আমি শুধু পরীক্ষায় ফেল করি নি, চরিত্রেও।—অমনি এককথায় এতদিনের সব সম্পর্ক ছেদ। দেশশুদ্ধ লোক আমাকে ছি ছি করতে লাগল। কমলা আর আমার ফেরার পথ রাখলে না। আর ওখানে গিয়ে খাবই বা কি। চাকরি জুটবে না, পাশ করতে পারিনি।" রমলা বললে,—"আজ চলি অনেক রাত হোল।" পাগল বললে, "আর একটু শুনে যাও,—আচ্ছা বল তো কমলা কেন আমাকে আর একটু সহ্য করল না, আর একটু ক্ষমা? তাহলে হয়ত আমার এদশা হোত না,—রোজ সন্ধ্যেয় মরতে ছুটতে হোত না, হয় পাবের নরকে,—নয়তো আত্মহত্যার নরকে। জানো, আমি পাঁচটা সন্তানের পিতা, তারা আমাকে ড্যাড্ ড্যাড্ বলে ডাকে,—আর দূর থেকে ভেংচি কেটে ছুটে পালায়। আমি কেন কমলার গর্ভে একটা সত্যি সত্যি আমার ছেলের জন্ম দিতে পারলাম না? একবার তার সামনে গিয়ে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, যে, বৃথাই তোমার প্রেমের গর্ব। ভালোবাসা কাকে বলে, তুমি তার কিছুই জানো না। জানতে চাও তো এসে দেখে যাও। ও হয়ত দেখেশুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে

হাসবে, বলবে,—এটা ভালোবাসা নয়। কিন্তু আমি জানি এই ভালোবাসা, সুসি আমাকে সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু তবু সে সতী নয়। তোমাদের ঐ বেলজিয়ামের কাঁচের তৈরি ঠুনকো চরিত্র তাকে কবে ভেঙে ফেলতে হয়েছে। তবু সে আমাকে সত্যি ভালোবাসে। আমি মরে গেলে অন্তত একদিন সে অঝোরে কাঁদবে, তারপরেই আবার কাধে তুলে নেবে সংসারের জোয়াল। ছেলেমেয়ে মানুষ করবে, আর কঙ্কালসার দেহে মহিষের মত খেটে মরবে। আর যদি কোনদিন ভাগ্যবশে কেউ বিয়ে করতে চায়, তো রাজী হতে দেরি করবে না। আর ঐ কমলাকে দেখ না, আজীবন ব্রহ্মচারিণী, পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাদা থান পরে মাস্টারী করে বেড়াচ্ছে। আর পুরুষ দেখলেই চোখ পাকিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।"

এতক্ষণ পরে আবার সেই পাগলের মত হেসে উঠল লোকটা, বললে,—"জানো, ও নাকি আজকাল আর কুস্কুম পরে না,—মঙ্গলসূত্রম্ ছিঁড়ে ফেলেছে। তাইতো আরো মরতে ছুটি। বেচারার আশা একটা দিকে অন্তত সফল হোক। ও সত্যি সত্যি বিধবা হোক। এদিকে দেখ, আমার সুসি এখনো আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যত রাতই হোক বাড়ী ফিরে দেখবআমার জন্যে খানিকটা রুটি কাবার্ডে আছেই। আর ছোট ছেলের বরাদ্দ থেকে একটুখানি দুধ। ঐ একটি জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়, তাও বাচ্চাদের জন্যে। সেই ভয়ে সুসি বাচ্চাদের সব একসঙ্গে বাড়তে দিতে চায় না। একটির পরে একটি কোলেই রেখে দেয়।

রমলা বললে,—"কোথায় তোমার বাড়ী ?"

—"সেই হোবর্ণ ছাড়িয়ে—"

—"ওমা, সে যে অনেক দূর। চল তাহলে টিউবে ওঠা যাক। হোবর্ণ পর্যন্ত একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

—"হাঃ হাঃ" পাগল হাসল, "টিউবে করে বাড়ী যাব ? পয়সা কে দেবে ? তুমি ? ওগো দয়াময়ী ভারতী নারী, টিউবে অথবা বাসে আমি চড়ি না।"

—"তবে তুমি এলে কি করে এতদূরে—

—"হেটে। আবার কি করে ? এই পা গাড়ীতে রোজই তো মিল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করি। একেবারে শক্তির শেষ পর্যন্ত গিয়ে একজায়গায় চুপ করে বসি। বসে বসে কমলার সঙ্গে ঝগড়া করি। বলি,

কম্‌লা, তুমি যদিও জান আমি জাহান্নমে গেছি,—আমি বলব, হাঁ জাহান্নম বটে,—তবু বেঁচে আছি। তোমার মত শুকনো স্বর্গে পাথরের দেবী হয়ে মরে বেঁচে থাকা নয়,—সত্যি সত্যি বাঁচা। আমার যে কত প্রাণ তা প্রাণ দিয়ে দেখাব,—মরে বুঝিয়ে যাব—"

"তুমি কোন্ মিলে কাজ কর?" রমলা বাধা দিল। "কেন বোন মিল। হাড় গুঁড়ো করি। যাবে তুমি একদিন দেখতে? হাঃ হাঃ—হাড় কেমন গুঁড়ো হয়ে যায় দেখতে?"

—"সেখানে কি আরো অনেক ভারতীয় কাজ করে"? "কেন করবে না? ভারতীয়রা সবাই কি তোমার মত বড়লোকের মেয়ে? জামাইকান আর আফ্রিকানদের মত সব ছোট কাজেই ভারতীয়রা ঢুকতে শুরু করেছে। কি করবে, নইলে খাবে কী? পড়তে আসে হয় ধার করে, নয় তো বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করে। এসে দেখে বই পড়ার চেয়ে 'লভে' পড়া অনেক সোজা। তাই চাকরিতে ঢুকতে হয়। আর করতে হয় এই সব ছোট কাজ, যা আজকাল সাদাচামড়ারা করতে চাইছে না নিজেদের হাতে। প্রেমের জন্যে ছেলেরা সব আধপেটা খেয়ে কাজে ঢুকছে। পাশ না করা বিদেশী ছেলেকে এর চেয়ে গৌরবের কাজ দেবে কেন?" পাগল হাসল, "তোমার হাতে ঘড়ি আছে? রাত কটা?"

রমলা বললে "দশটা।" ঘড়ির দিকে চেয়ে রমলার মুখ শুকিয়ে এল। ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে, "আজ যাই।"

—"যাবে"? পাগল বললে,—"যাও যাও, সব যাও। আমিও যাব। আবার ঘণ্টা দুই হাঁটব। তা দেখ, পাগল ঘাড় নাচাল, যাবার আগে কিছু দিয়ে যাবে নাকি? তুমি তো দেখছি বড়লোক"!

রমলা ব্যাগ খুলে একটা দশ শিলিংএর নোট বের করল। তা দেখে পাগল হাসল, বলল,—"লেখক হলে আমিও পয়সা করতে পারতাম। এই দেখনা, একটা গল্প শুনিয়ে দশ শিলিং রোজগার করলাম।—লিখলে না জানি আরো কত পেতাম।"

রমলার চোখ জলে উঠল—"বেশ তো লেখ না, আমি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেব। তোমার ভাষা ভালো,—ইংরেজী শুদ্ধ। তুমি তোমার জীবনের চারপাশের ছোটখাট খবরগুলি আমাকে লিখে পাঠিও।"

—"দূর! আমি লিখতে পারি না, লিখতে বসলেই নানা ভাবনা এসে মাথায় ঢোকে। মনোযোগ দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মুখে মুখে বলতে পারি যা শুনতে চাও।"

"বেশ তাহলে সেই কথাই রইল। তুমি সপ্তাহে একদিন করে এসে আমায় গল্প শুনিয়ে যেও। অবশ্য গল্পগুলি যে সত্যি তার প্রমাণ আনতে হবে।"

—"বেশ বেশ, সে বেশ হবে। তা কত দেবে খবর পিছু?

"ছোট-খাট খবরে আধ ক্রাউন আর বেশী কিছু নতুনত্ব থাকলে পাঁচ শিলিং।"

—"আর তোমার কত থাকবে দয়াময়ী?—শুধু শুধুই যে আমার উপুরে করুণা করে এতটা করছ তা তো মনে হয় না।"

—"তা তো বটেই।" রমলা বললে,—"আমারও নিশ্চয় লাভ আছে। নিজের লোকসান করে তোমার লাভ করিয়ে দেব, এত দয়াময়ী সত্যিই আমি নই।"

—"তাহলে," ভুরু কুঁচকে পাগল বললে,—"এই দশ শিলিংটা কি দাদন?"

—"না, এটা তোমাকে এমনি দিচ্ছি, বাসে করে সুসির কাছে ফিরে যাবার জন্যে, আর কাল সকালে তোমার ছেলে-মেয়েদের কিছু খাবার কিনে দেবে বলে।"

—"ও ধন্যবাদ।" ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে নিল পাগল। তারপরে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—"যদি এটা দিয়ে ছেলেদের খাবার না কিনে, তাদের বাবার জন্যে মদ কিনি,—তোমার আপত্তি হবে কি?"

চমকে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল রমলা, এই পাগলকে শাসন করবার কে ও? সামান্য দশ শিলিং দান করে তার উপুরে নিজের ইচ্ছার স্বাক্ষর এঁকে দেবার কি অধিকার আছে ওর?

পাগল বললে,—"কি গো, চুপ করে ভাবছ কি? রেগে গেছ না? ভাবছ জোচ্চরটা বড় ঠকাল!"

রমলা ধীরে ঘাড় নাড়লে,—"না।"

—"না? তাহলে মদ কিনলে আপত্তি নেই তো?"

রমলা তার আশ্চর্য চোখ পাগলের মুখের পরে মেলে ধীরস্বরে বললে,

"ওর উপরে আমার আর কোন অধিকার নেই। ও দিয়ে তুমি যা খুশী করতে পার। টাকাটা সৎকাজে ব্যয় হলে খুশী হতাম। যদি না হয় তো কি করতে পারি।" রমলা মুখ ফিরিয়ে স্টেশনের ভিতরে ঢুকে গেল। ওর অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে পাগল আবার হাহা করে হেসে উঠল। আর সেই হাসি তীক্ষ্ণ তীরের মত রমলাকে পিছন থেকে বিঁধতে লাগল। সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্নিহিত মস্ত ফাঁকিটা যেন দাঁত বের করে পাগলের মত হেসে উঠল। এতদিন রমলা যাকে সত্য বলে জানত, পাগলের ব্যঙ্গ তার মূলে গিয়ে আঘাত করল,—হঠাৎ রমলার মনে হোল, তবে কি সত্যেরও কোন চিরন্তন মূল্য নেই? সত্যও কি শাশ্বত নয়? তবে কেন কবি লিখেছেন,—'আমি আছি, তুমি আছ,—সত্য আছে স্থির।'

আমি কি সত্যিই আছি?—এই আমি, এই মানুষ? আর তুমিও কি আছ, তুমি ভগবান?—মানুষের সৃষ্ট ভগবান নয়, মানুষের সৃষ্টিকার, বিশ্ব-ভুবনের কর্ত্তা, সকল মানসের মননকারী ভগবান। আর আছে কি এই উভয়কে ঘিরে এমন কোন চির সত্য,—যার আদর্শে মানুষ বারবার নিজের সমাজ ও সভ্যতা ভাঙছে আর গড়ছে? টিউবের ঝক্‌ঝক্ আওয়াজ ছাপিয়ে পাগলের সেই হাসি রমলার কাণের মধ্যে বিঁধতে বিঁধতে এইসব প্রশ্ন করে চলল। কামরার একটা মাত্র সহযাত্রী 'বেরে' টুপিটা নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল, আর দুরন্ত কৃত্রিম আলোর ঝিলিকে ভূগর্ভের বুক চিরে গর্জ্জন করতে করতে ছুটে চলছিল বৈদ্যুতিক ট্রেন। রমলার মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যুপুরীর দ্বার খুলে গেছে। আর তার সেই বিরাট হাঁ-করা গহ্বরের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে এই তুচ্ছ কটা প্রশ্ন —আমি কি আছি? তুমি কি আছ? আছে কি কোন চিরন্তন সত্য?

আগস্ট মাসের গোড়ায় দিন দশেকের ছুটি পেল কুমার, ভাবল বেড়িয়ে আসবে কিছুদূর। ইতিমধ্যে চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে ওর সেই পুরোনো ভাঙা গাড়ীটার বদলে আর একটা গাড়ী কিনেছে কুমার। ঠিক করেছে তাতে করে ক'বন্ধু মিলে, উত্তর ইংলণ্ডটা ঘুরে আসবে। শুধু

পেট্রলের খরচ। চারজনে মিলে ভাগ করে নিলে কারুই তেমন গায়ে লাগবে না।

খবর পেয়ে কৃষ্ণা লিখল,—চারবন্ধুর মধ্যে দুজনের নাম লিখে নাও। কৃষ্ণা বোস আর জোন ডারলিং। ইচ্ছে করলে অবশ্য তুমি তাকে শুধু ডারলিং বলেও ডাকতে পার, আমার বন্ধু কেয়ার করবে না। ও নামে ডারলিং হলেও কাজে একেবারে বেরসিক,—কারু প্রিয়তমা হবার ধার ধারে না। তাছাড়া ও গাড়ীচালাতেও খুব ওস্তাদ,—তোমার হাতকে অনেক বিশ্রাম দিতে পারবে। আর আমি গান গেয়ে তোমাদের **entertain** করব,—তার জন্যেও কিছু চার্জ দিতে হবে না।

চিঠি পেয়ে খুশীতে মেতে উঠল কুমার, গাড়ীর গতির সঙ্গে কৃষ্ণার কলকণ্ঠের গান। আঃ যে কোন কবি আজ কুমারকে হিংসা করতে পারে। —জোন ডারলিঙের গল্প কুমার অনেক শুনেছে,—সে নাকি কৃষ্ণার মনকে মুক্তি দিয়েছে,—মৃদু কোমল ভাবের কুয়াসা থেকে একেবারে প্রখর সূর্য্যালোকের মধ্যে। আর কৃষ্ণা ভয় পায় না,—চোখে চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে গায়ের আঁচলটা টেনে দেয় না। চোখ তুলে সত্যকে দেখতে শিখেছে ও,—শিখেছে সত্য কইতে। কৃষ্ণার সঙ্গে তারপর থেকে চিঠিতে চিঠিতে ওর বেশ ভাব জমে উঠেছে। সহজ বন্ধুত্বের সুরে কৃষ্ণার সঙ্কোচ গেছে উড়ে। এখন নিজের যা কিছু ভাবনা যা কিছু পরামর্শ সব কুমারের সঙ্গে চিঠিতে চলে। এতদিন পর্যন্ত ও নিজের কথা সহজভাবে কাউকেই বলতে পারত না, এমন কি নিজের বাবা মাকেও নয়। কিন্তু কুমারের কাছে কোন সঙ্কোচ হয় না। পড়াশুনো, খাওয়া দাওয়া, কোন্ প্রফেসর কিরকম, কোন্ বন্ধু কি করে, সব খবর কুমারকে দিতে বাধে না। কুমারও কৃষ্ণাকে বিশ্বাস করে সুখী হয়। এমন একজন বন্ধু, যাকে সব কথাই বেশ বলা যায়। অথচ যে রাগ করে না,—যার জন্যে অভিমান ভাঙানোর দায় নেই। তাই কৃষ্ণার অযাচিত আমন্ত্রণ গ্রহণে লাফিয়ে উঠল কুমার। সঙ্গী হিসাবে কৃষ্ণা অনিন্দনীয়া সন্দেহ নেই।

অবশ্য এধরনের যাত্রায় তিনজনের ভাগাভাগিই যথেষ্ট। চারসঙ্গী নাহলেও টাকার ঘাটতি হোত না। কিন্তু দুই নারী সঙ্গে নিয়ে এক কুমার—উঃ ভাবতেও ভয় হয় ,—এ একেবারে নৈব নৈব চ।

এডমণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করল কুমার,—এডমণ্ড ফিন্। ওর পাশের ঘরে থাকে। এক আপিসে কাজ করে। দুজনেরই পড়াশুনো শেষ হয়েছে, এ কাজ নিয়েছে শুধু অভিজ্ঞতা বাড়াতে। তার সঙ্গেই প্রথম থেকে পরামর্শ চলছিল। হঠাৎ নারীসঙ্গীর প্রস্তাবে উৎসাহিত হবে, না দমে যাবে, ভেবে পেল না সে। মেয়েরা সাধারণত বড় খুঁতখুঁতে হয়। এখানে থাকতে পারবে না,—ওখানে শুতে পারবে না। বিশেষত ভারতীয় মেয়েদের বিচার আরো বেশী—এ খাবে না, সে খাবে না—তাহলে? "কিন্তু না করার কোন মানে হয় না," কুমার বললে,—"যাত্রাটা যে অনেক বেশী মনোরম হবে সন্দেহ নেই।"

—"নাঃ সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ", এডমণ্ড ঘাড় নাড়ে,—"তবে রাজী হয়ে যাও,—দুই মহিলার দুই রক্ষক। সে একরকম মন্দ নয়,"—হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল দুই বন্ধু।

এড বললে,—"সেই যাবেই যদি, তাহলে এ দ্বীপের বেড়া ডিঙিয়ে সাগর পেরিয়ে মহাদেশে চল না, ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, সুইজারল্যাণ্ড?"

"না না, অত টাকা নেই,"—কুমার হাসল, "তাছাড়া দুই দুগ্ধপোষ্য কুমারী নিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে কি হবে? ওরা তো বোধ হয় শ্যাম্পেন খেতেও জানে না।"

যাবার দিন ঠিক করে রমলাকে একটা চিঠি লিখে দিল কুমার লণ্ডনে। মামাবাবু দেশে ফিরে গেছেন বেশ কিছুদিন হোল। যাবার সময় কুমারের সঙ্গে দেখা হয় নি,—কিন্তু মামাবাবুকে বোধহয় সামনের বছর আবার আসতে হবে এডিনবরায়, অবশ্য ততদিনে কুমারের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত,—কিন্তু সব উচিত কাজ কি হয়ে ওঠে করা?—কুমার কি করবে কে জানে। দেশে গেলে, ভালো চাকরি এখনই ও পেতে পারে, মায়ের জন্যেও মনটা মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠে। বেচারা কতদিন ধরে আশায় আশায় দিন গুনছে, ছেলে ফিরে আসবে মানুষ হয়ে,—আসবে আলো নিয়ে, দীপ্তি নিয়ে,—দিনে দিনে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে তার খ্যাতি। এতদিন ধরে কষ্ট করা সার্থক হবে মায়ের। সেই মায়ের জন্যে মন কেমন করে কুমারের। তবে কেনই বা ফিরছে না দেশে? মেরী সেখানে আছে বলে নাকি? তা সে থাকে থাকুক না,—তার স্বামীর অধীনে কাজ না

নিলেই হোল,—যদি কোনদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়,—তা যাক না, কি আর এমন হবে তাহলে, মৃদু হেসে কুমার হয়ত জিগ্যেস করবে—কেমন আছ? কিম্বা হয়ত কিছুই বলবে না,—চেনেই না এমন ভান করে চলে যাবে। আচ্ছা এখন মেরীকে দেখলে ওর কি মনে হবে? এখনো কি তার জন্যে ওর সেই আকুলতা আছে, যে আকুলতা নিয়ে, মেরীর খবর জানতে ও দুঘণ্টা ধ্যান করেছিল? না মেরীর খবর পাবার পরে সে আকুলতা ওর মনের মধ্যে মরে গেছে। মেরীর সঙ্গে এখন আর দেখা করতে চায় না কুমার,—ঠিক্ এমন ভাবে অন্যের স্ত্রীরূপে ওকে কল্পনা করতে বাধে। মেরী থাকলে হয়ত, এই নিয়েই তর্ক ঘনাত,—মেরী বলত, পুরুষের ভালোবাসার তিনভাগ অহঙ্কারে পোরা, বাকী একভাগে প্রেমিকা বেচারী কষ্টে-সৃষ্টে থাকে। প্রিয়ার উপরে যেই তোমার সত্ত্ব খারিজ হয়ে গেল,—অমনি আর সে কেউ নয়। যতক্ষণ সে তোমার, ততক্ষণই তার উপরে ভালোবাসা,—যেই সে অন্যের হয়ে গেল্, ব্যস্, আর তার দিকে চাইবে না। মেয়ের ভালোবাসা এত অগভীর নয়। মেয়ে যাকে একবার ভালোবাসে তাকে আর ছাড়তে পারে না,—এমন কি যখন শোনে যে, সে অন্যকে বিয়ে করেও দিব্যি সুখে আছে, তখনো তার রুদ্ধ মনোরথ ভুলে যাওয়া প্রিয়তমের সন্ধানে ছুটে যেতে চায়।

মেরীর সঙ্গে কুমারের এই কাল্পনিক বিতর্ক শুনে এড বললে,—"বাজে কথা, মেয়েরাও আসলে ছেলেদের মতই অহঙ্কারী। প্রেমের দায়ে, প্রিয়কে স্বামীরূপে সম্পূর্ণ অনুগত করা ওদেরও মনোগত বাসনা। তবে ওদের আকাঙ্ক্ষা আরো জোরালো। তাই প্রেমিক হাতছাড়া হয়ে গেলেও হাত ছাড়তে চায় না।" কুমার হাসল,—"খাঁটি কথা, পুরুষের প্রেমে আসক্তি কম, প্রেমের ঘূর্ণিপাকে ডুবতে ডুবতেও ওরা মুক্তি খোঁজে,—তাই মুক্তি পেলেই তাকে চিনে নিতে ওদের দেরি হয় না। মেয়েরা মুক্তিকেই ভয় পায়, ওরা খাঁচার পাখীর জাত, তাই হাতের কাছে মুক্তি এলেও বন্ধনের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে। যে প্রেমিক ছেড়ে যায় দুই বাহু মেলে তাকেই ফিরে ফিরে ডাকে।"

কথা হচ্ছিল কারখানার এক কোণের ঘরে বসে। তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে সময় প্রায় সাড়ে সাতটায় গিয়ে পৌঁছেচে। এডের ছিল রাত বদ্‌লি অর্থাৎ

নাইট সিফ্‌টের পালা। কুমারের ফেরার কথা ছিল অনেক আগে। কিন্তু আসন্ন যাত্রার খুঁটিনাটি আর এইসব বিরাট প্রেমতত্ত্বের আলোচনায় অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে। এখন তো আর কোন কাজ নেই শুধু watch করা, শুধু পাহারা দেওয়া, শুধু সতর্ক থাকা, পাছে কোথাও না কিছু অঘটন ঘটে যায়। তাই নাইট সিফ্‌টের সময় ওদের কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আড্ডা চলে। বন্ধুত্ব বলতে এডের সঙ্গেই জমেছে ওর এখানে এসে অবধি। এডও ওরই মত এঞ্জিনীয়ার, এ কারখানায় এসেছে ওরই মত চাকরি নিয়ে। কুমার দেশে ফিরে যাবে, এডের এখানেই পাকা চাকরি হয়ে যাবে।

স্টাফরুমের কোণে, ছোট টেবিলে ছোট একটা বিদ্যুৎচুল্লী। তাতে জল গরম করে কফি তৈরি করল ওরা। 'নেসেল্‌স' কোম্পানীর জমা দুধ ঢেলে নিল তাতে। কদিন ধরেই ওরা ভাবছে, এখানে দুটো চামচ কিনে রাখবে। তা রোজই ভুলে যাচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে মেরীর কথা মনে পড়ে। মেরী যখন ছিল, ছোটখাট অভাবগুলি ও খুঁজে বার করত। যাই হোক, মেরী যখন নেই, তখন কফিতে কণ্ডেন্সড মিল্ক দিয়ে তারপরে— ?

—তারপরে, মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, এই নীতির অনুসরণ করে নিত্যকার মতই স্ক্রু-ড্রাইভারটা বার করে নিল। তার বাঁট দিয়ে কফি ঘুটে দেখা গেল, চামচে ঘোটা কফির রঙের অথবা স্বাদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। আরাম করে কফি খেতে খেতে ওরা দুজনেই স্বীকার করলে,— সন্তোষের জন্যে উপকরণের মূল্য কত কম। "আর তাইতো আমাদের দেশটা পাতার কুঁড়েতেই জন্ম কাটালো, খামোখা উপকরণের দায় বাড়িয়ে লাভ কী ?"

—"কিন্তু সেই খোড়ো ঘরেই তো তোমরা আজ বিদ্যুতের লাইন টানছ ?"

"হাঁ তাতো টানছি।"

—"আচ্ছা কুমার, তোমার কি মনে হয়, সত্যি বলত ? আমি অনেক দিন ধরে জিগ্যেস করব ভাবছি। কিন্তু এও ভাবছি, তুমি আবার কী মনে করবে।"

—"বলে ফেল, বলে ফেল," কুমার হাসল,—"ভণিতায় কাজ নেই।"

এড বল্লে,—"এই যে তোমরা জোর আধুনিকতা টেনে নামাচ্ছ,—এই

যে এত বাঁধ, এত আলো, এত লোহা, আর এত কোটি কোটি টাকার লেন, দেন, এতে করে, দেশের সত্যিকার জনসাধারণের বিশেষ কিছু উপকার হবে কী? নাকি শুধু উপরতলার কতগুলি লোকের খানিকটা সুবিধা হবে?"

—"কি জানি," কুমারের মনে পড়ল,—তার মায়ের চিঠির কথা,—মা লিখেছেন,—"কুমার তোদের দেশ তো এখন স্বাধীন, দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? এ গান তো আর গাওয়া চলবে না। আজ তো আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি, আর সব দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, তবু আজো কেন এদেশের পথে পথে ভিকিরির মিছিল,—যে গৃহস্থ মধ্যবিত্ত একদিন বাঙালীর মেরুদণ্ড ছিল, তাদের ছেলে-মেয়েরা আজ শহরের অলিতে গলিতে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। হাঁরে, করছেই তো, আর করবে নাই বা কেন? পেটে যাদের ভাত নেই,—সাধু হবার বিলাসিতা তাদের সাজে না, নীতিকথা তাদের কাছে দুর্নীতির সামিল।" মা লিখছেন,—"হ্যাঁরে তোরা নাকি শুনছি সব গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিক নিয়ে যাবি? কিন্তু গ্রামই বল, আর শহরই বল, অধিকাংশ বাড়ীর অধিকাংশ ঘরে যে পুঞ্জ পুঞ্জ অশিক্ষার অন্ধকার চেপে বসে আছে, তা দূর করবে কে?"

হঠাৎ কুমারকে চুপ করে যেতে দেখে এড্ ওর দিকে ফিরে তাকাল,—ভাবলে,—হয়ত এসব কথা না তোলাই ভালো ছিল। কুমার বললে, তোমার কথার জবাব দিতে গিয়ে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। মাও ঠিক এই কথাই লিখেছেন চিঠিতে। মায়ের মত,—আমরা হঠাৎ বড়লোক হবার চেষ্টায় সত্যকার বড় হবার পথে এগোচ্ছি না। ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণ করতে করতে আমাদের সমস্যাগুলিকে আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না। সমস্যাগুলির মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলার চেষ্টা না করে, বিচিত্র ঢাকনা দিয়ে তাদের ঢাকতে চেয়েছি। যেন ডাস্টবিনের উপরে জরির চাদর বিছাতে এসেছি, ভেতর থেকে যে পচা গন্ধ বেরুবে,—সে খেয়াল নেই।"

"সব দেশেই কিন্তু এ ধরনের গলদ আছে," সান্ত্বনা দিতে চাইল এড,—"এই আমাদেরই দেখ না? আমাদের সমস্যাগুলির মূলেও কেউ আঘাত করছে না। শুধু অভাবের পর অভাব সৃষ্টি করে, সেই অভাব মেটাবার নিত্য নবপন্থা আবিষ্কার করে আমরা মনে করছি, জীবনের মানদণ্ড খুব বাড়াচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে সুখের মানও যে কমে আসছে, সে খেয়াল নেই।

স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে ছুটতে ছুটতে প্রতিপদে স্বাচ্ছন্দ্যকেই হারাচ্ছি। তাছাড়া শুধু তোমাদেরই নয়,—আমাদেরও সাধারণ শ্রমিকদের জীবনে অনেক হতাশ্বাসের জড়ো করা কাহিনী লেখা। তুমি তো দেখোনি সে সব। লণ্ডনের পূর্বতম প্রান্তভাগে তুমি তো যাওনি কুমার, তাহলে দেখতে পেতে। এই ব্রিস্টলেই যে সব স্লাম আছে একদিন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব।

কুমার চুপ করে রইল,—নিজের দেশের কথা পরের দেশের লোকের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছে আর ছিল না। এখানে অনেক দূরে অনেক ঘুরে তবে বস্তি দেখতে যেতে হবে। আর সেখানে যে সারা শহর জুড়ে বস্তি মুখ বার করে রয়েছে। আর সে কি বস্তি! এদেশে বস্তি যত খারাপই হোক, পাশ দিয়ে তো আর খোলা ড্রেন যাচ্ছে না; দুফুট অন্তর তো আর আস্তাকুঁড়ের বোঝা জমে উঠছে না, আর সেই জঞ্জালের উপরে তো আর ছেলেরা খেলে বেড়াচ্ছে না। এখানে যে আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে। মানুষের প্রাণের মূল্য আছে,—তা সে যত ছোটই হোক। সেখানের মানুষ এখানের মানুষের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। তবু সেখানে যে শৃঙ্খলা নেই,—জীবনবোধ নেই। সেখানে যে, স্বার্থপর মূঢ়দৃষ্টি দেশকে আজো দেশের লোকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখছে।

এড দেখলে কুমার গম্ভীর হয়ে গেছে,—কুমার ভাবলে এটা ঠিক হচ্ছে না,—দুজনেই বুঝতে পারলে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে।

এড বললে,—রাজনীতি আর সমাজতত্ত্ব মুলতুবী থাক। আপাতত যাত্রার প্ল্যান ঠিক করে ফেলাটা সবচেয়ে দরকারী। আর তো মাত্র দুদিন বাকী আছে,—এ দুদিনও তো সময় পাওয়া যাবে না। তোমারও কাজ শেষ মুহূর্ত অবধি,—আমারও তাই।

কুমার বললে,—ঠিক কথা, এস এখুনি ম্যাপটা আগে দাগ-টাগ দিয়ে ঠিক করে নিই।

"A A"-র রোড-ম্যাপ নিয়ে এসেছি,—কোথায় কোথায় ভালো হস্টেল আছে তাও এতে লেখা আছে। কুমার পোর্টফোলিও থেকে ম্যাপ বের করে আনল। এড আরো দুকাপ কফি ঢালল। পকেট থেকে ক্ষয়ে যাওয়া লাল পেন্সিল বের করে দুজনে মিলে ম্যাপের উপরে ঝুঁকে পড়ল।

যতক্ষণ যাবার তেমন স্থিরতা ছিল না, ততক্ষণ কৃষ্ণার উৎসাহ ছিল অমিত।

যাবার কথা একেবারে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকেই ওর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। থেকে থেকেই মনের মধ্যে একটা দ্বিধা কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল। ব্যাপারটা একটু যেন কেমন লাগছে। মা শুনলে হয়ত রাগ করবেন,—কিন্তু মা শুনবেনই বা কি করে। কুমার মামীকে সব লিখেছে—সে আবার নিশ্চয়ই মাকে লিখবে। "লিখলেই বা কি হয়েছে?" জোন হেসে লুটিয়ে পড়ে,—"তুমি নিজেই লিখে দাও না?—এতে রাগের কি আছে? তুমি তো আর প্রেমে পড়নি,—শুধু তো বেড়াতে চলেছ?"

"না, কিন্তু বেড়ানোর মাধ্যমে যদিই পড়ে যাই,—অন্ততঃ মায়ের সেই ভয় হতে পারে।"

"তাতে ক্ষতি কি? তোমাদের দেশে প্রেমে পড়াও বারণ? তাহলে বিয়ের পরে কি হয়?"

"ওঃ", কৃষ্ণা হাসল,—"তখন প্রেমে পড়া যেতে পারে। Infact তখন প্রেমে না পড়াই পাপ। বিয়ের পরে, স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়তেই হবে।"

"ধর যদি নাই পড়, যদি, তার আগেই আর কারো সঙ্গে পড়ে যাও?"

—"তাহলে একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। অবশ্য আজকাল আর অত কিছু হয় না,—অনেকেই করছে। তবু যারা ভালো বলে নাম কিনতে চায়, তারা মা-বাপের কথামত তাঁদের সংগ্রহ করে আনা বরের গলাতেই লক্ষ্মীমেয়ের মত টুক্ করে মালা পরিয়ে দেয়।"

"আর তারপর থেকেই তাকে ভালোবাসতে শুরু করে?"

—"হাঁ, সেই মুহূর্ত থেকে।"

—"কী আশ্চর্য, একি সত্যিই সম্ভব।"

—"সম্ভব বই কী।" কৃষ্ণা বললে, "আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে চিরকাল এই ভাবেই বিয়ে করে এবং ভালোবেসে এসেছে।"

—"হাউ ফানি", জোন হাসল,—"কী অদ্ভুত!"

—"আমাদের নিয়মটা তোমাদের অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু তোমাদের ব্যবহারটা আমাদের আরো ভীষণ রকম 'ফানি' লাগে",—কৃষ্ণা বললে,—"এই যে তোমরা যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, যার সঙ্গে বিয়ে হবার কোন সম্ভাবনাই নেই তাকেও জড়িয়ে ধরে নাচ, ফস্ করে এসে একে তাকে চুমু খেয়ে যাও, এও আমাদের দারুণ অদ্ভুত লাগে।"

—"তোমাদের দেশে বুঝি চুমো খায় না ?"

—"খায় বই কী,—তবে যাকে তাকে যেখানে সেখানে নয়। ওটা আমরা reserve রাখি, গভীরতর উপলব্ধির জন্যে। প্রিয়তমের মুখের পরে ভালোবাসার ঐ চিহ্নটি দেবার জন্যে নিভৃত পরিবেশের প্রয়োজন।"

—"আচ্ছা, তাহলে আমার বাবা যে সেদিন যাবার সময়ে তোমাকে চুমো খেয়ে গেলেন,—তোমার খারাপ লেগেছিল ?"

—"তা সত্যি কথা বলতে কী, একটু অস্বস্তি হয়েছিল বই কী ?"

—"কিন্তু যদি জন খেতো ?" জন জোনের দাদা। কিন্তু জোনের মত হুড়েও নয়, পাগলও নয়, পালিস করা ভদ্র চেহারা,—তেমনি চোস্ত সাজ। স্যুটের কোথাও একটু ক্রীজ নেই, চুল এবং জুতো সমান পালিস চকচকে। এত কম বয়সের ছেলের এত নিখুঁত পোশাক আর ভদ্র ব্যবহার,—কৃষ্ণা আগে কখনো দেখেনি। জোন যত সহজ, ওর দাদা তত কৃত্রিম,—একেবারে খাঁটি ইংরেজ বড়লোকের ছেলে। কৃষ্ণার সম্বন্ধে তার মনে যে বিশেষ কোন ভাবই উদয় হয় নি,—তা কৃষ্ণা বেশ জানে। বলতে কি এ ধরনের সাধারণ ইংরেজ ছেলের মনে কোন সময়েই বিশেষ কোন ভাবাবেগের সঞ্চার হয় বলে মনে হয় না কৃষ্ণার। আসলে জোনই একথা কৃষ্ণাকে বলেছিল একদিন,—জনের মত ছেলেরা ভালোবাসার অনুপযুক্ত। ওরা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না। ও যখন বিয়ে করবে, জেনো, ও আর একটি ব্যবসাকে বিয়ে করছে, মেয়েকে নয়। ভালোবাসার জন্যে জন বিয়ে করবে না।"

—"না, কিন্তু জোন করবে", কৃষ্ণা হেসেছিল। জোন হাসে নি, গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—জোন যেদিন করবে, জেনো সেদিন তার ভালোবাসায় আকাশ-পাতাল উল্টে যাবে। পৃথিবী থরথর করে কাঁপবে।"

সেকথা কৃষ্ণা জানে, কিন্তু ওর হাসি পাচ্ছিল ভাবতে, প্রেমে পড়লে জোনের দাদার চেহারাটা কি রকম দাঁড়াবে। সেই কথা মনে করে এখন জোনের কথায় দারুণ হাসি পেল কৃষ্ণার। জন যদি এখন হঠাৎ কৃষ্ণাকে,—উঃ, কৃষ্ণা উচ্ছ্বসিতভাবে হাসতে লাগল।

"এত হাসির আর অন্য কোন মানে নেই।" জোন বললো।

"নিশ্চয়ই", কৃষ্ণা বললে, "কারণ সেই একোমেবাদ্বিতীয়ম্"

—"অবশ্যই, তোমারও নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে ভালো লাগে।"

—ভুরু টান করে কৃষ্ণা বললে,—"তা হয়ত লাগে।"

—"তবে ?"

—"তবেই তো ! সেইজন্যেই তো ভয়ে ও সবের ধার দিয়েও যাইনে। পাছে ভালো লেগে যায়,—পরে নিজের বরের চুমো আর মনে না ধরে।"

"হ্যাঙ্ ইট্", জোন রাগ করে বললে,—"যার চুমো পছন্দ হবে না, এমন বরকে বিয়ে করবেই বা কেন ?"

"বাঃ তা কি করে জানব আগে থেকে ?"—ওঃ, বিস্ময়ে উঠে বসল কৃষ্ণা,— "চুমো চেখে চেখে, তবে বর পছন্দ কর বুঝি তোমরা ? ওঃ হাউ ফানি,— কী দারুণ রকম মজার।"

কৃষ্ণার হাসিতে জোনের একটু রাগ হোল। কিন্তু বেশিক্ষণ রাগ রাখতে পারে না জোন,—হেসে ফেলে। তাছাড়া কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করতে ওর ভালো লাগে। দিনের মধ্যে থেকে থেকেই কিছুক্ষণ গল্প না হলে,—খাবার হজম হয় না ওদের। এই নীচু হয়ে নুয়ে পড়া উইলো গাছের ঝিরঝিরে পাতার ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে, দুজনে মিলে ভাসিয়ে দেয় তাদের এলোমেলো বকবকানি 'ক্যাম' নদীর স্রোতে। তাই যতই রাগ করুক, আর ঝগড়া করুক ওরা নিজেরাই আবার ভাব করতে উৎসুক হয়ে ওঠে।

কুমার লিখেছিলো,—"কৃষ্ণা পথে চলতে হলে, ভার কমাতে হবে। বোঝা হাল্কা হলেই মন উড়তে পারবে খুশীতে। কাজেই কৃষ্ণা দেবী, আপনার ও আপনার সখির প্রতি, আমাদের দুই পুরুষবন্ধুর সকাতর অনুনয়, যে, আপনারা ছোট দুটি স্যুটকেসের বেশি আর কিছু সঙ্গে নেবেন না।"

চিঠি পড়ে কৃষ্ণা মৃদু হেসে তার বিচিত্র শাড়িগুলি আলমারীর তাকে ভালো করে সাজিয়ে রাখল।

সঙ্গে ওদের ছোট দুটি স্যুটকেস আর খাবারের জন্যে একটা প্ল্যাস্টিকের বাক্স আর থার্মোসে চা। কৃষ্ণার ইচ্ছে ছিল এক বোতল জলও সঙ্গে নেয়। কিন্তু এরা কেউ জল খায় না, তার বদলে খায় চা কিংবা কফি,—নয়ত ফলের রসের সরবৎ। "আর এই যদি কন্টিনেন্টে যেতাম", জোন ফোড়ন কাটে,— "তাহলে জলের বদলে সরবৎও পেতে না মশায়, পেতে শুধু সুরা।" কিন্তু যাবার সময় দেখা গেল,—জোন ওর জন্যে একটা ছোট বোতলে একেবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল ভরে নিয়েছে। কথা ছিল, দুই বন্ধুতে রাতে এসে উঠবে

কেম্ব্রিজের কোন একটা হোটেলে। পরদিন ভোরবেলা দুই সখিকে তুলে নেবে 'ট্রিনিটি' কলেজ-গেটের সামনে থেকে। সেই প্ল্যান ঠিক মতই বাহিত হোল।

দুই সখিতে দাঁড়িয়েছিল কলেজ-গেটের বাইরে, পথের ধারে,—গাছের ছায়ায়। সবুজ রঙের ছোট্ট অস্টিনটা এসে ওদের কাছ ঘেঁসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে এসে কৃষ্ণার সামনে দাঁড়াল কুমার। সেলাম করার ভঙ্গীতে হাত তুলে, ওর চোখে চোখ রেখে হাসল। বহুদিন পরে আপনার লোকের দেখা পেলে, লোকে যেমন হাসে, তেমনি হাসি। সে হাসি দেখে কৃষ্ণার মুখে আলো জ্বলে উঠল। কৃষ্ণা বলল,—"ভালো তো ?"

—"ভীষণ রকম।" কুমার হাসল। কৃষ্ণা আলাপ করিয়ে দিল,—"জোন ডারলিং আর কুমার রায়।" কুমার বললে,—কৃষ্ণা বোস আর এডমণ্ড ফিন।

গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে কুমার বললে,—"ভদ্র মহিলারা কিন্তু এ যাত্রায় আমাদের কাছে ভদ্রতা ও ম্যানার্সের খুঁটিনাটি আশা কোর না, আর করলেও পাবে না।" কুমার চালকের আসনে টপ্ করে উঠে বসল। জোন উঠে কুমারের পাশে বসে পড়ে বলল,—"কৃষ্ণা তোমার বন্ধুকে আমি আজকের মত দখল করলাম,—আপত্তি নেই তো ?"

"বিন্দুমাত্রও নয়", কৃষ্ণা হাসল। ওরা দুজনে পিছনে বসল,—এডমণ্ড আর কৃষ্ণা। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে এডমণ্ড হাসল,—বলল, "তোমার কথা অনেক শুনেছি।" কৃষ্ণা অবাক হয়ে বললে,—"সত্যি ?" এডমণ্ড ঘাড় নাড়লে। কৃষ্ণা বললে,—"কিন্তু তোমার কথা আমি বেশি শোনার সুযোগ পাইনি। কুমার চিঠি লেখে কম,—যাও বা লেখে, তা শুধু একজনের কথাতেই ভরা থাকে।"

—"ওর সেই মেরীর কথায় তো ? হাঁ বোধ হয় ও এখনো তার দারুণ রকম প্রেমে পড়ে আছে।"

—"কিন্তু সে বোধহয় তেমন করে পড়ে নেই",—কৃষ্ণা হাসে,—"ভালোবাসার এই এক বিপদ,—এই ছোট্ট একটা ট্রাজেডি। এটুকু না থাকলে অবশ্য গল্প জমে না। ওরা দুজনেই যদি সমান রেটে প্রেমে পড়ত, তাহলে তো এতদিনে বিয়ে থা করে সুখে ঘরকন্না করত।"

"উঃ, তাহলে এতদিনে ওর একটা বেশ ছোট-খাট ভুঁড়ি গজাত", এড মন্তব্য করে। কৃষ্ণা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সামনের সীট থেকে কুমার চেঁচিয়ে বললে,—"তোমাদের হাসির খবরগুলো থেকে আমাদেরও কিছুমিছু পরিবেশন করো না।

—"এ আমাদের নিজস্ব কথা,—তোমার কানের জন্যে নয়।" পেছনের সীট থেকে উত্তর দিল এড।

হঠাৎ কৃষ্ণাকে দেখতে ইচ্ছে হল কুমারের। আগে যে দেখেছিল, সে যেন তেমন দেখা নয়। কৃষ্ণাকে দেখার চেয়ে, নিজেকে দেখানোর ইচ্ছেটাই বোধহয় ছিল বেশী। তাই কৃষ্ণার বেশভূষাটাও বোধহয় লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ কেন ওকে দেখতে ইচ্ছে হল কে জানে। কুমার নিজেও তার সে ইচ্ছাকে ভালো করে জানতে পারল না,—শুধু তাকিয়ে দেখল গাড়ীর সামনের ছোট আয়নার দিকে। সেই দর্পণে, কৃষ্ণার দক্ষিণী শাড়ির রেশমী আঁচল বার বার উড়ে উড়ে পড়ল কিন্তু ওর মুখ দেখা গেল না। ও এমনভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে যে ওর ভারী খোঁপার পাশ দিয়ে নেমে আসা পেলব ঘাড়ের সীমানা ও হলদে খদ্দরের ব্লাউসে ঢাকা ঘাড়ের একটু অংশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

নিরস্ত হয়ে কুমার চোখ ফিরিয়ে নিল। বললে,—"তোমাকে তোমার প্রথম নামে ডাকতে পারিতো? এখন যখন আমরা চারজনেই বন্ধু।"

—"নিশ্চয়ই,—আমি তো তোমায় কুমার ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতেই পারি না। এত শুনেছি তোমার কথা।"

—"তাই নাকি? শুনে গর্ব হচ্ছে। কিন্তু আমিও তোমার সব গল্পই শুনেছি। তোমার কথাতেই কৃষ্ণার চিঠির বেশীটা ভরা।"

কুমার বললে,—"আমাদের 'টুরের' প্রোগ্রামটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো? কৃষ্ণাকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি দেখেছ নিশ্চয়।"

—"হ্যাঁ," জোন বললে,—কিন্তু প্রথম আমরা থামছি কোথায়—অর্থাৎ আজ রাত্রে?"

—"ম্যাঞ্চেস্টারে থাকা যেতে পারে। প্রায় একশ আশি পঁচাশি হবে। নয়ত একেবারে সোজা 'কেণ্ডল' পর্যন্ত চলে যাওয়া যেতে পারে।"

—"না না ম্যাঞ্চেস্টার নয়",—পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল এডমণ্ড ফিন।

ছুটীর প্রথম রাতটাই যদি কালো শহরে কয়লার গুঁড়ো মেখে থাকি, তাহলে সারা ছুটিটাই কালো হয়ে উঠবে।”

—“তাহলে কেণ্ডলেই যাই চল”, কুমার বললে,—“শুনেছি ভারী সুন্দর জায়গা।”

সত্যিই ভারী সুন্দর জায়গা। উপরে নীল আকাশ, নীচে তৃণভূমি,—কত নাম-না-জানা গাছে কত সব নাম-না-জানা ফুলের সমারোহ। প্রকৃতি যেন সেজে বসেছে। কিম্বা তার চেয়েও ভালো উপমা সবটাই যেন কোন মধ্যযুগীয় বিখ্যাত শিল্পীর হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ। সরু খালটার ওপাশে একটা জঙ্গল জঙ্গল বাগান ঘেরা বাড়ী,—তাতে তরুণ-তরুণীর মেলা। “ঐখানে আশ্রয় নেব আজ রাতে”, এড বললে—“ওটা Youth Hostel,—যুব অতিথিশালা।” শুনে জোন লাফিয়ে উঠল। কৃষ্ণা কিন্তু দমে গেল একটু। এখনো বেশী লোকের মাঝখানে যেতে কৃষ্ণার কেমন সঙ্কোচ লাগে।

প্রকাণ্ড বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী। তাতে যেন যৌবনের হাট বসেছে। রঙীন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে যত তরুণ-তরুণী। ওরা এসেছে ইংলণ্ডের নানাদিক থেকে। কন্টিনেন্ট থেকেও এসেছে কেউ কেউ,—আমেরিকা থেকেও। সিঁড়িতে বসে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে পা। কেউ বসে সিগারেট ফুঁকছে। কোথাও দল বেঁধে জনাকয়েক জটলা পাকাচ্ছে। কোথাও বা একজোড়া তরুণ-তরুণী, কোথাও বা শুধুই জোড়া সখি মনের কথা কইতে কইতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনের আলো এখনো মিলায় নি,—তবু পঞ্চমীর চাঁদ এরি মধ্যে মধ্যগগন উত্তীর্ণ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে হলে ঢুকতেই খোলা দরজা দিয়ে নজরে পড়ে—ওপাশের বাগানে হৈ-হৈ করে টেনিস খেলা চলেছে আলো জ্বালিয়ে।

কৃষ্ণাদের এই বি-সম রঙের দুজোড়া তরুণ-তরুণীর দিকে প্রায় সকলেই একবার বিস্মিত দৃষ্টি হেনে আবার নিজের কাজে মন দিল। কৃষ্ণা ব্যথিত হয়ে দেখল,—সে দৃষ্টিতে শুধু বিস্ময় আছে, অভ্যর্থনা নেই।

কর্তৃপক্ষ বললেন,—“রাতের খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন তোমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কিছু খেয়ে নেওয়া। নইলে হয়ত রাতভোর

হরিমটরের ব্যবস্থাই করতে হবে। এখানে তো আর বাইরে কোথাও খাবারের দোকান নেই। শুনে ওরা তাড়াতাড়ি খেতে গেল। মস্ত খাবার ঘরে সারি সারি বেঞ্চি টেবিল পাতা।

—একপাশে সার্ভিং টেবিল। সেখান থেকে চারপ্লেট খাবার কিনে নিয়ে এল ওরা। বসতে গিয়ে দেখে জায়গা সব ভর্তি। ওরি মধ্যে অবশ্য ঠেসেঠুসে জায়গা করে দিল ওরা—পাশাপাশি হোল না চারজনের।

ভালো খাবার ছিল সেদিন,—ইংরেজ ছেলেমেয়ের প্রিয় খাদ্য—রোস্টমাটন আর মিণ্টসস্,—তার সঙ্গে আলু আর মটর সেদ্ধ। ইংরেজের রুচির সঙ্গে কৃষ্ণার রুচির বিশেষ মিল নেই,—অন্তত খাদ্য সম্বন্ধে। তবু কাটা দিয়ে তাই একটু একটু খেতে খেতে কৃষ্ণা দেখল,—ওর পাশে একটি ছেলে বসে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে খেয়ে চলেছে। তার পাশের ছেলেটি ওপাশের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে খাচ্ছে, আর সরু টেবিলে খাবার থাকায় টেবিল না চাপড়ে নিজের উরুতে চাপড় মেরে সশব্দে হেসে উঠছে। কৃষ্ণা তাকিয়ে দেখল ওর বাকি তিন বন্ধুই বেশ জমিয়ে তুলেছে। জোনের অবস্থা প্রায় টেবিল চাপড়াবার মতই। আর কুমারের দুপাশে দুজন মেয়ে। কুমারের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, কৃষ্ণা ভাবে। ও যেখানে যায়, কেমন করে না জানি দুপাশে মেয়ে জুটে যায়। তারা খেতে খেতে সমানে বকবক করছে। আর কুমার হাসছে। কুমারের পাশে অন্য মেয়ে দেখতে ভালো লাগে না কৃষ্ণার,—কিন্তু ওর বুদ্ধি কিছুতেই এই সোজা কথাটা বুঝতে চায় না। ভাবে এমনিতেই মন খারাপ লাগছে,—এমনি শুধু শুধু,—সমস্তটাই যেন কেমন বিরস। খাবারও যেমন বিস্বাদ, জীবনটাও যেন তেমনি।

পাশের ছেলেটির খাওয়া হয়ে গেল, সে ক্ষমা চেয়ে প্লেট হাতে করে বেঞ্চি টপকে উঠে গেল। পরের ছেলেটি অন্যদের সঙ্গে তেমনি হৈ-হৈ করে খেতে লাগল। পাশেই যে একটা বিজাতীয় বিদেশী মেয়ে বসে খাচ্ছে, তা যেন চেয়েও দেখল না। কৃষ্ণা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবে,—এদের ছেলেরা কেন ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে তেমন মিশতে চায় না। নিজেদের মেয়েদের প্রতি যত মনোযোগ, যত যত্ন, ভারতীয় মেয়ের কাছে এসে সে-সব একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশ্য অভদ্রতা করে না,—কিছু জিগ্যেস করলে ভদ্রভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু যেন ভদ্রভাবে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। কেন? কৃষ্ণা

ভাবে,—একী ভারতীয় মেয়ের বহুশ্রুত সতীত্বকাহিনীর ভয়ে,—নাকি কালো মেয়েকে যত্ন দেখাতে মানে বাঁধে! কে জানে? অবশ্য এদের মেয়েদের বিষয়ে সে দোষ দেয়া যায় না। ছেলে দেখলেই এরা চোখ জ্বালিয়ে গল্প শুরু করে,—হাসি আর ছোঁয়া দিয়ে প্রথম থেকেই অন্তরঙ্গতার সূচনা করে। সাদা কালো জাত বিচার করে না। বরং ভারতীয়দের প্রতিই যেন প্রীতি একটু বেশী। অবশ্য ভারতীয় ছেলেরাও মেম দেখলেই গলে যায়।

তা যাক্ কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণা বন্ধুদের কোথাও দেখতে পেল না ধারে কাছে। প্লেটটা জায়গায় রেখে দিয়ে গিস্‌গিসে হলের এক কোণে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কৃষ্ণা একেবারে একলা হয়ে যেতে চাইল,—একেবারে একলা। এই মুহূর্তে কারু সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না,—এমনকি কুমারের সঙ্গেও না। আশ্চর্য একলা থাকার ভয়েই মানুষ এই গৃহপরিবার, এই সমাজব্যবস্থা, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বড় বড় নামের মাধ্যমে পরস্পরকে বেঁধেছে। অথচ এই সমস্ত থেকে একান্তভাবে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে নিজের সঙ্গে নিজের একলা হওয়া যে মাঝে মাঝে মানুষের কত প্রয়োজন, ঠিক এই মুহূর্তে তার পরিমাণটা বুঝতে পারছে যেন কৃষ্ণা। কিন্তু সে সুযোগ ও কখন পাবে কে জানে?

এড এসে ওকে খুঁজে বার করলে,—বল্লে,—"চল বেড়াতে যাবে? খেয়ে দেয়ে একটু ঘুরে-ফিরে তবে শোয়া ভালো। এদিকে দুপা এগোলেই সেই বিখ্যাত হোটেলটা—যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সবগুলো ইংরেজ কবি কোন-না-কোন সময়ে এসে একবার থেকে গেছে। যদিও তাকে নূতন ভাবে সাজানো সারানো হয়েছে, তবু তার সেই পুরোনো আমলের মোহ রয়েছে অবিকৃত। মেঝেতে বিচিত্র কার্পেট,—চকচকে পালিশ করা কাঠের দেওয়ালের গায়ে শেলী, বায়রণ, কীটস্, ওয়ার্ডস্বার্থ ইত্যাদি কবিদের ছবি, এবং প্রত্যেকটা ছবির নীচে, তাঁদের প্রত্যেকের কতগুলি বিখ্যাত শ্লোক। এঁরা সবাই নাকি এখানে একবার করে এসে গেছেন।

এ হোটেলটা দেখবার ইচ্ছে আছে কৃষ্ণার, বলতে কি এই "রয়েল ওক্ হোটেলের" জন্যেই জায়গাটার মান বেড়েছিল, কৃষ্ণার কাছে।

শুধু কবিতা পড়াই যে কৃষ্ণার শখ তা নয়,—কবিদের সঙ্গে সে মনে মনে ভাব করে ফেলে, তাদের ছবি আঁকে মনের পটে কল্পনার তুলি দিয়ে।

তাই এ হোটেলটা না দেখে এখান থেকে নড়বে না কৃষ্ণা নিশ্চয়ই,—কিন্তু এখন নয়,—আজ সে ক্লান্ত।

"ওঃ আমি দুঃখিত," এড বললে, "সত্যিই তোমাকে বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না। আর মিছে দেরি করে লাভ কী? যাও শুয়ে পড় গিয়ে।"

"কিন্তু সবাই কি ভাববে"?

—"যা ভাবা উচিত, ঠিক তাই,—ভাববে, যে, তুমি ক্লান্ত তাই শুয়ে পড়েছ।"

—"কিন্তু,—"

—"কিন্তু টিন্তু নয়, স্রেফ লম্বা হয় পিঠকে বিশ্রাম দাও"।

—"কিন্তু এতক্ষণ তো পিঠকে বিশ্রাম দিয়েই স্রেফ গাড়ীতে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, তবে ক্লান্ত হলাম কেন"?

এড হাসল। "তোমার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তিনি ধারে কাছে কোথাও থেকে থাকেন। কিন্তু একটা কথা আমি লক্ষ্য করেছি,—বলব তোমায়"?

—"নিশ্চয়ই।"

—"তুমি এখনো 'কেন'-র Stage পার হও নি।"

কৃষ্ণা হাসল,—"সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

—"নিশ্চয়ই,—an added attraction—"একটা উপরি মোহ, যাকে বলে আর কি"?

—"খোসামোদ করে কথা বলা ছেলেদের স্বভাব, তাহলে যাই।"

—"তোমাদের রাত কাটাবার জায়গাটা কোথায় জানো তো?—নাকি আমি কাউকে জিগ্যেস করে দেখব?"—আশ্চর্য নরম মৃদু গলায় এড বললে। "ধন্যবাদ,"—কৃষ্ণা হাসল, "কোন দরকার নেই,—আমি খুঁজে নেব। আচ্ছা, শুভরাত্রি", মৃদু হেসে কৃষ্ণা চলে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এডমণ্ড ফিন কৃষ্ণা বোসকে শুভরাত্রি জানাল। বাইরে তখন পঞ্চমীর চন্দ্রলেখা একেবারে নির্বাসিত। নিয়নসাইনের নীলাভ বিদ্যুতের তীব্র প্রভায় ধূসর পাহাড়ের পটভূমির প্রায় সবটাই আচ্ছন্ন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এড ভাবল,—মানুষে মানুষে কেন এত ভেদ, কেন এত বাধা,—মিলনের পথ কেন এত কঠিন?

পিছন থেকে কুমার এসে ওকে আবিষ্কার করল। বলল,—"তুমি এখানে? কৃষ্ণা আর জোন কোথায়?"

—"কৃষ্ণা বিছানায়,—আর জোন বোধহয় বাইরে,—ঠিক জানিনে।"

—"ওঃ, কৃষ্ণা শুয়ে পড়েছে?"

—"হাঁ, ও বল্লে,—ও ক্লান্ত।"

—"ও, হাঁ, কৃষ্ণা একটু বেশী ডেলিকেট,—জোনের এনার্জি কিন্তু বেড়ে গেছে।"

—কুমারের দিকে তাকিয়ে এড উত্তর দিল—'হাঁ'।

বিন্দুমাত্র অবাক হয়ে কুমার ভাবল, 'এডের' দৃষ্টির কি বিশেষ কোন মানে ছিল,—কোন অন্য অর্থ? কি এত ভাবছিল ও একা দাঁড়িয়ে—আশ্চর্য!

কুমারের প্রশ্নে এড হাসল,—"তেমন বিশেষ কিছু নয়,—এলোমেলো, কতগুলি টুকরো ভাবনা যাচ্ছিল আর আসছিল।

—"কৃষ্ণাকে তোমার কেমন লাগল?" কুমার প্রশ্ন করল।

—"এত শীগ্‌গিরই কি করে বলব—কেমন লাগল,—এইটুকু সময়ে কি কোন মানুষকে চেনা যায়?"

—"চেনা হয়ত যায় না,—সারাজীবন ধরেও। কিন্তু ভালো লাগার পক্ষে একমুহূর্তই যথেষ্ট।"

—"যে-কোন সাধারণ ভালো মেয়েকে, যে-কোন সাধারণ ভালো ছেলের ভালো লাগেই।"

—"মোটেই না,—আমি বিশ্বাস করি না,—ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ,—এ একেবারে মহাকবি মুখনিঃসৃত বাণী।"

—"ওর মানে?"

—"মানুষের রুচি আলাদা,—আর সেইজন্যেই আমার মনে হয়,—কাউকে কারু ভালো লাগতে গেলে প্রথমেই দরকার ওইটি। অর্থাৎ মনের মিলের জন্যে রুচির মিলের প্রয়োজন।"

—"তাই নাকি? আমার তো মনে হয় রুচিটা বাইরের। তাকে সৃষ্টি করেছে—সমাজ সংস্কার, পরিবেশ। কিন্তু ভালোবাসার পক্ষে এ সমস্তই গৌণ। কোন মেয়েকে পুরুষের অথবা পুরুষকে নারীর ভালোলাগার জন্যে আসল যা প্রয়োজন, তা প্রকৃতি আপন হাতে যোগাচ্ছে তাদের দেহে এবং

মনে। এইসব কথাই বোধ হয় ভাবছিলাম এতক্ষণ যে, নরনারী যদিও পরস্পরকে কাছে টানতে চায়, তবু নিজেদের চারিদিকে এতরকম নীতি আর বিধির দেয়াল গেঁথে নিজেদের কেবলি সরিয়ে রাখে কেন ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"অর্থাৎ, ধর যদি কোন নির্জন দ্বীপে শুধু তুমি আর জোন কোন দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎ একেবারে অজানা ভবিষ্যতের মুখোমুখি পড়ে যাও, তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি,—তোমাদের সম্পূর্ণ মিলতে দিন দুয়েকের বেশী দেরি লাগবে না। অথচ সেই তোমরাই চিরজীবন শহরে পাশাপাশি বাস করেও ভদ্রতার কৃত্রিম বেড়াটুকু ডিঙোতে পারবে কি পারবে না!"

—"অর্থাৎ বলতে চাও, তুমি যদি কোন দ্বীপে কৃষ্ণার সঙ্গেই ওই রকম শুধু দুজনে একাকী দাঁড়াও, তাহলে তোমাদেরও ওই দশাই হবে ?"

—"নিশ্চয়ই। কেন তোমার সন্দেহ আছে ?"

—"কে জানে ?—তবে অনেক মেয়ে আছে,—যাদের উপরে প্রকৃতির দাবীর চেয়ে মানুষের অর্থাৎ মানুষের তৈরী সভ্যতা ও সংস্কারের দাবী বেশী। অর্থাৎ এসব মেয়ের পক্ষে মানুষের জান্তব দিকটার চেয়ে তার বুদ্ধি ও চিন্তার দিকটার আবেদন বেশী। প্রাণের চেয়ে চিত্তের দাবী এদের কাছে বড়।"

"ও, এধরনের মেয়েকেই তোমরা বুঝি তাহলে দেবী বল ?—কারণ এরা তো প্রকৃতির হাতে গড়া প্রকৃত মানবী নয়। মানবের হাতে গড়া দেবী মাত্র।"

—"হতে পারে," কুমার হাসল, "সব দেবতাই তো মানুষের সৃষ্টি।"

—"অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাইছ ?"

—"আমি বলতে চাই,—বাধা আছে বলেই প্রেম সুন্দর। মুক্তির জন্যেই বন্ধনের প্রয়োজন। এইখানেই জন্তুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ। মানুষের মিলন সহজ নয়। আর যেখানে যত বাধা, সে মিলন তত মধুর। তাইত অবৈধ প্রেম নিয়ে যত গান, যত কাব্য,—যত কাহিনী,—আর বৈধ প্রণয়ের সোজা সড়কের একটি মাত্র সাহিত্যিক বর্ণনা—" 'তারপরে তারা সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল।' "

—"তোমার কথাটা হয়ত খানিকটা সত্যি, তবু মানতে ইচ্ছে করছে না। মানুষ কি চিরজীবন ধরে শুধু লুকোচুরি খেলবে, নতুন নতুন বন্ধন গলায় পরে?—আর মিথ্যে চীৎকার করবে মুক্তির জন্যে তার প্রাণ কাঁদছে?"

—"দুটোই সত্যি এড,—আমার মনে হয়, দুটোরই প্রয়োজন আছে,—বন্ধন এবং মুক্তি। তাই সে একহাতে শেকলের বোঝা যত বাড়াচ্ছে,—অন্যহাতে হাতুড়ী ধরেছে সেই শিকল পিটিয়ে ভাঙবে বলে।—ঘোড়দৌড়ের মত সামনে বেড়া রেখে টপ্‌কে টপ্‌কে যাবার খেলা।"

—কিন্তু মানুষের মধ্যে ক'জনই বা বেড়া টপ্‌কতে পারে কুমার,—কজনের হাতুড়ীতে শিকল ভাঙে?"

—"কি সব হাতুড়ী শিকল, লোহা-লক্কড়ের কথা হচ্ছে দু'বন্ধুতে মিলে?" জোন ছুটতে ছুটতে এসে নাক ঢোকালে ওদের কথার মাঝখানে। বললে,—"কৃষ্ণা কোথায়?"

—"সে বোধ হয় এতক্ষণে স্বপ্নের দেশে পরী হয়ে উড়ছে,"—এড বললে,—"অনেকক্ষণ সে শুতে গেছে।"

কুমার বললে,—"তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? অনেকক্ষণ নজরের সীমানায় ছিলে, হঠাৎ কখন হারিয়ে গেলে টের পেলাম না।"

—"আমি? আমি জলে ঝাঁপাচ্ছিলাম।"

"জলে?"

—"হ্যা জলেই তো,—ওপাশে একটা ছোট পুল আছে,—সেখানে অনেকে সাঁতার কাটছিল,—আমি একজনের সাঁতারের পোশাক ধার করে নেমে পড়লাম। খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে কৃষ্ণার কথা মনে পড়ে গেল,—ভাবলাম ওকেও টেনে নামাই,—কিন্তু আজ অবধি ওর জলের ভয় কাটে নি।"

কুমার বললে,—"এতক্ষণ সাঁতার কেটেও তুমি শ্রান্ত হলে না?"

—"না, এখনি আমি ওই দূর পাহাড়টা পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারি,—যদি তোমরা কেউ সঙ্গী হও।" "কিন্তু জোন," এড বললে,—"সারাপথ আমরা দুজনে গাড়ী চালিয়ে এলাম, আর তোমরা দুজনে এলে বসে। কাজেই তোমাদের এনার্জি থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাও দেখ, তোমাদের মধ্যে একজন দিব্যি ঘুম দিচ্ছেন—তা সেটা একরকম বুদ্ধিরই কাজ, আমাদেরও বোধহয় তাঁকে অনুসরণ করাই এখন উচিত হবে।"

—"সেটা মন্দ প্রস্তাব নয়," কুমারও সায় দিয়ে হাসল।

—"বেশ, তবে গুড নাইট,—ঘুমাও গিয়ে খোকারা, আমি আর একটু এই খোলা আকাশ ভোগ করে যাব।" সেই নরম সবুজ আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঈষৎ ভিজে ভিজে ঘাসের গালিচার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জোন। গানের সুরে বল্লে, Under the greenwood tree, who loves to lie with me? স্বল্প একটু লাল সর্টসের আবরণের ভিতর থেকে ওর দুই রামরম্ভা উরু ঘাসের উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে রইল। সেদিকে চেয়ে হেসে উঠল এড,—বললে—"আমার ইচ্ছে করছে, তোমার দুই পা ধরে ডিগবাজী খাইয়ে দিই।"

—দাও না, দাও, লক্ষীটি,"—স্রেফ ছেলেমানুষের মত পা ছুঁড়লে জোন। এড ওর দুই পায়ের গোড়ালী ধরে উঁচু করে তোলা মাত্র জোন খিলখিল করে হাসতে হাসতে নিজেই একটা নিপুণ ডিগবাজী খেয়ে নিল।

একটু সঙ্কুচিত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল কুমার। ওর রুচি এই ধরনের জিনিস বরদাস্ত করতে পারে না। অবশ্য এটা কিছু খারাপ কাজ নয়,—হাসি খেলা কৌতুক—এতো স্বাস্থ্যের লক্ষণ! তবু কেমন যেন লাগে,—ওর ভারতীয় দৃষ্টিতে বাধে। মেয়েদের শ্রীহীনতাও সহ্য করা যায়, কিন্তু হ্রু-হীনতা নয়। অবশ্য জোনকে বোধ হয় ঠিক মেয়ে বলা চলে না। অন্তত ওযে মেয়েলী মেয়ে নয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু, আশ্চর্য, এই মেয়ে নাকি মা হতে চায়। কৃষ্ণা তো তাই লিখেছিলো, জোন নাকি বলে যে, ও পুরুষকে যেটুকু সহ্য করে সে কেবল ওর ভাবী সন্তানের পিতার জাত বলে,—নইলে নাকি পুরুষের সঙ্গ ও কিছুতে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু ওর সঙ্গে সারাদিন একসঙ্গে ঘুরে কুমারের তো তা মনে হোল না। সেরকম টম্‌বয় অবশ্য এদেশে আছে—যারা পুরুষকে একেবারেই কেয়ার করে না, প্রেমের কোন ছলা-কলা ঢং-ঢাংও যারা জানে না। কিন্তু জোন তো ঠিক সে জাতীয় নয়। ওর ডিগ্‌বাজী খাওয়া দেখে এডমণ্ড হা হা করে হেসে উঠল। কুমারও চেষ্টা করল হাসতে,—কিন্তু পারল না।

জোন গাইলে—Under the greenwood tree,

Who loves to lie with me?

চন্দ্রাবলী রজনীর হারিয়ে যাওয়া সমস্ত মৃদুতা এডের চোখের মধ্যে দুরন্ত হয়ে উঠল,—ও সুর করে উত্তর দিল,—Come hither, come hither, come hither.

কুমার বললে,—"আমার এবার সত্যি ঘুম পেয়েছে তাই গুডনাইট চিলড্রেন", ও লম্বা পা ফেলে ভিতরে চলে গেল।

লম্বা একটা ঘরে মেয়েদের ডরমেটারী। সারি সারি সরু সরু খাট,—কোনটা লোহার কোনটা কাঠের। স্প্রীং-এর গদি, সাদা ধবধবে নরম বিছানা। অনেক রাতে ঘরে ফিরে জোন দেখলে কৃষ্ণা ঘুমে নিথর। ওর অলিভ রঙের সুপ্ত মুখে নিবিড় শান্তির ছায়া।

মসৃণ সুন্দর কালো পথ, কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড়ে পাহাড়ে চড়াই উৎরাই। এখানে একদিন, ওখানে একদিন,—কোথাও কোন ফার্মে অর্থাৎ চাষীগৃহস্থের বাড়ীতে, কোথাও যুবনিবাসে, কোথাও কোন সস্তার হোটেলে, অল্প অল্প করে কাটিয়ে কাটিয়ে ওদের ছুটির দিন কটা প্রায় ফুরিয়ে এল।

যেমন মনোরম পথ, বিশ্রামও তেমনি সুন্দর। এই পথ ওরা চারজনে নিজের মত করে ভোগ করতে করতে এসেছে। কিসিরা বলে একটা জায়গায় এসে কৃষ্ণা শেষে বেঁকে বসল,—ও আর যাবে না ফিরে কোথাও। কেম্ব্রিজে ট্রাইপসের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এখানেই থেকে যাবে। জায়গাটা সত্যিই এত সুন্দর যে, ওদের সকলেরই মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গেছে।

—এ দিকে পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝরণা নামছে সাদা ফেনা ছিটকে ছিট্‌কে। এখানে ওখানে পড়ে আছে, নানা মাপের নুড়ি ও পাথর। আর তার মাঝে মাঝে ঘাসের রং একেবারে জলে ধোয়া কচি শ্যামল। তার উপরে তারার মত ডেইজি ফুল ছড়ানো। —এক এক জায়গায় ঘাস দেখা যায় না, শুধু ফুল। ওপাশের নীচু জমিতে 'ড্যাফোডিল্‌সে'র বাসন্তী আঁচল হাওয়ায় দুলছে। আর কি সব বড় বড় সাদা সাদা আর বেগুনি ফুলের ঝুরি। তার মধ্যে দিয়ে কাঁচা রোদ সোনা ঢালে সকালে, আর চাঁদ উঠলেই সব রূপো! তখন পরীর দেশে রূপোর গাছে রূপোর পাতা ঝিকমিক করে। আর ঘাসের শিশিরে বিন্দু বিন্দু রূপো জলে জলে

ওঠে, আর রূপোর জল ঝরণা হয়ে নামে, তাতে হাজার চাঁদ ঝলমল করে।

সেদিন সারা দুপুর ওরা চারজনে এই যাকে বলে—একেবারে পুষ্পকাননে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। বাতাসে ছিল বসন্তের মৃদু উত্তাপ ; আর ওদের কণ্ঠে ছিল কখনো গুনগুন সুর, কখনো কবিতার দুচার লাইন।—সারাদিন ধরে 'ডেইজি' তুলে তুলে ফুলের শিকল বানাল ওরা। সেই ফুল, মাথায়, হাতে, বুকে পরে, কৃষ্ণা আর জোন, এই রূপোর চাঁদের মায়ারাজ্যে আবার বেড়াতে এল। এডমণ্ড আর জোন ডুয়েট গাইলে যতসব চাঁদের আর প্রেমের গান—ওদের দেশের সব বিখ্যাত সুরকারদের তৈরি। ওদের দুজনেরই গলা ভালো,— সমস্ত জায়গাটা যেন সুরে রম্ রম্ করতে লাগল। কৃষ্ণা ও কুমারের খুবই ভালো লাগছিল। তবু ভিতরে ভিতরে ওরা দুজনেই তৃষিত হয়ে উঠেছিল,—বাংলা-গানের জন্যে। কিন্তু এখন এদের মাঝখানে সে গান যে ঠিক জমবে না,—তা ওরা বেশ বুঝতে পারছিল। এড আর জোনের হয়ত ভালো লাগবে না। হয়ত ভদ্রতা করে কিছু বলবে না। কিন্তু তৃপ্ত যে হয় নি, তা বেশ বোঝা যাবে। "কিন্তু মার্কাস শুনতে ভালোবাসে", কৃষ্ণা বললে,—"ওরিয়েণ্ট ওকে মুগ্ধ করেছে। ভারতকে ও জানতে চায়। আর সেই স্প্যানিশ ছেলেটি—পিয়েত্রো।"

—"ও তো চাইবেই,—পূবদেশের প্রভাব শুধু ওর, শিক্ষায় আর সুরে নয়,—রক্তেও বোধহয় কিছু আছে,"—কুমার উত্তর দিল। —"কিন্তু এদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই কেন আমাদের কিছু জানতে চায় না,"—ফিস-ফিস করে কৃষ্ণা বললে,—"না চায় আমাদের সাহিত্য পড়তে, না চায় শুনতে গান। অথচ আমাদের তো বেশ লাগে ওদের গান, ওদের সাহিত্য, ওদের শিল্প।"

—"কারণ আমাদের রক্তে আছে সহিষ্ণুতা,—আর এরা একেবারে অসহিষ্ণু। বিদেশী কিছু নিয়ে এরা বেশী মাথা ঘামাতে রাজী নয়,—এরা জানে যে, ইংরেজ ছাড়া আরো অনেক জাতেরই হয়ত খানিকটা সংস্কৃতি আছে। কিন্তু তা জানবার এদের প্রয়োজন নেই। আমরা আবার উল্টো,—পরকে জানা, পরকে চেনার মধ্যেই আমাদের চিত্তের কবিত্ব। তোমাদের কবিই তো লিখে গেছেন,—

"দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

কৃষ্ণা রেগে বললে,—"ঐ করেই তো মাটি করেছেন। চাই না দূরকে করিতে নিকট বন্ধু,—ওরা যদি আমাদের বুঝতে না চায়,—আমরাই বা চাইব কেন?"

"এটা রাগের কথা,"—ফিসফিস করে মৃদু হেসে কুমার বললে।

—"হাঁ, আমার আজকাল রাগ হয়,"—স্বীকার করল কৃষ্ণা।

—"কিন্তু আজ নয়,—ওটা তুলে রেখে দাও অন্য কোন দিনের জন্যে। আজ কোন বিরুদ্ধতায় মন সায় দেবে না,—হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কুমার বললে,—দেখ দেখ, কী আশ্চর্য কী অদ্ভুত সৌন্দর্য আমাদের চারিদিকে কুয়াসার মত ঘন হয়ে জমে উঠছে। চকিত হয়ে চেয়ে দেখল কৃষ্ণা। চাঁদের আলোর অনুপরমাণুগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন শুধু আলো নয়, নয় শুধু ঈথারের তরঙ্গ, ওরা যেন প্রত্যক্ষ বস্তুর কোন সূক্ষ্ম স্বপ্নরূপ। এই অদ্ভুত মায়ারূপের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রাণ যেন আনচান করে উঠল কৃষ্ণার। মনে হোল,—কোথায় যেন এসে পড়েছে, জানে না,—কি যেন ছেড়ে এসেছে, মনে পড়ছে না,—হঠাৎ যেন কার জন্যে মন কেমন করে উঠছে, তার নাম মনে আসছে না।

একটা 'সিলভার বার্চ' গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কুমার দাঁড়িয়ে ছিল। কৃষ্ণা দেখল,—তার তীক্ষ্ন নাক আর চিবুকের সীমানায় রূপোর তুলির টান। আর চওড়া কপালের সবটা জুড়ে রেণু রেণু চাঁদ পরীদের নাচ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুমার চোখ চাইল, বলল,—

"কৃষ্ণা, রূপ লাগি আঁখি ঝুরে,
গুণে মন ভোর,—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

একি কোন মানুষ বলেছিল মানুষকে,—নাকি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি মানব আত্মার এই চিরন্তন আত্মনিবেদন?" কৃষ্ণার ডান হাতটা কুমার নিজের মুঠির মধ্যে অতি সহজে টেনে নিল। সেই অসতর্ক মৃদু একটু টানেই কিন্তু কৃষ্ণার শরীর অবশ হয়ে এল। এমন তো কখনো করে না কুমার। ও যেন কিসের নেশায় বিভোর হয়ে আছে। আর সেই নেশা ধীরে ধীরে যেন

কৃষ্ণাকেও আচ্ছন্ন করে আনছে। কুমার বললে,—"কৃষ্ণা, মানুষ কি মানুষের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে? না, কোন ভাবের সঙ্গে?" কৃষ্ণা উত্তর দিল না। শুধু ওর প্রাণের মধ্যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির চক্রান্তের সঙ্গে মিলবার জন্যে যেন দুহাত বাড়িয়ে ছুটে আসতে চাইল।

কুমার বললে,—"কৃষ্ণা, তোমার কাছে ভিক্ষা আছে,—দেবে?" কৃষ্ণা কথা বলতে পারল না, শুধু ঘাড় নাড়ল,—"হ্যাঁ।" কুমার বললে,—"আজ এখান থেকে যাবার আগে আমাকে দু-একটা গান শুনিয়ে যাবে?" কুমারের প্রগাঢ় অনুনয় কৃষ্ণার চোখের মধ্যে সত্যি সত্যি যেন ভিক্ষার মত অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল। কৃষ্ণা ঘাড় নাড়ল,—"হ্যাঁ।" ওর মন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—শুধু এই? শুধু এইটুকু? আরো অনেক অনেক বেশী দিতে পারত কৃষ্ণা। কুমার নিল না কেন? চাইল না কেন? এত কমে ওর কি হবে! ওর মন যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে,—ও যে ভালোবাসতে চায়! কাকে? সে কি কুমারকে? মানুষ কি অন্য মানুষকে ভালোবাসে? না নিজেকে? নিজেকে পূর্ণ করার জন্যেই অন্যের উপলক্ষ্য খোঁজে। নাকি মানুষ বলে কোথাও কিছু নেই,—শুধু প্রেমই আছে? প্রেমই নিজের সার্থকতার জন্যে সৃষ্টি করেছে নরনারীর এই বিচিত্র বিরুদ্ধতা। কৃষ্ণার চোখ ভরে এল, কিন্তু পাছে নিচু করলেই টপ্ করে ঝরে পড়ে তাই তাকে আর নামালো না কৃষ্ণা। কুমার নিঃশ্বাস ফেলে হাত ছেড়ে দিল।

—"কি এত ফিসফিস করছ তুই একজাতের পাখী?" হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল,—তালভঙ্গ হোল অপ্সরীদের। কৃষ্ণা দেখল জোন এদিকে ছুটে আসছে। তার পেছনে এডও আছে নিশ্চয়। কুমার চাপা স্বরে ফিসফিস করলে,—"কৃষ্ণা, আমার এখন একটু একলা না থাকলে চলবে না,—হৈ হৈ করতে আমার প্রাণ এখন কিছুতেই সায় দেবে না। Please কৃষ্ণা, আমাকে এখানে রেখে দিয়ে তুমি ওদের সঙ্গে ঘুরে এস। কিন্তু আমায় গান শোনাতে ভুলে যেও না। সেই আশায় আমি এখানে বসে থাকব।" না কৃষ্ণা ভুলবে না,—ভুলবে না। কিন্তু আপাতত সে ছুটে গেল জোনের বাহুবন্ধনের মধ্যে। জোন বললে—"হাপাচ্ছ কেন? প্রেম করছিলে নাকি এতক্ষণ?" "ধ্যাৎ চুপ", কৃষ্ণা হাসল। এড বললে,—"কুমার কোথায়?" কৃষ্ণা বললে, "সে এখন একলা বসে মেরীর ধ্যান করছে।" ওরা এগিয়ে চলল। জোন

বললে,—“কিন্তু এতক্ষণ তো খুব কথা বলছিল দেখলাম ফিসফিস করে।” হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেল না কৃষ্ণা। পরক্ষণেই বললে,—“ওটা বাংলাভাষার চর্চা হচ্ছিল, তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে তো ওটা প্রায় ভুলতে বসেছি দুজনেই।”

“ভাষা জানিনে বলে যা খুশী বলতে পারো, দিতে পারো যত খুশী গালা-গাল, আমাদের সে সুবিধে নেই”, এড হাসলে।

“ভাষাটা শিখে নিলেই তো গোল চুকে যায়”, কৃষ্ণা বলল।

“তুমি যদি শেখাও তো শিখতে রাজী একশবার।”

“বেশ তো এবার ফিরতি পথেই অনেক শেখা হয়ে যাবে। অবশ্য তুমি যদি মন দাও।”

—“নিশ্চয়ই।” এড হাসল ওর চোখে চোখ রেখে, “বিনিময়ে যদি তুমি কিছু শেখ।”

—“কী শেখাবে?” সরল ভাবে জিগ্যেস করল কৃষ্ণা, কিন্তু তখনি মনের মধ্যে কি যেন একটা চমকে কেঁপে উঠল। আর ওর প্রশ্নটা চকিত হয়ে ঈষৎ থেমে থেমে যেন থমকে দাঁড়াল।

এড বললে,—“শেখাব নাচ।”

কৃষ্ণা বললে। “কিন্তু নেচে আমি তত সুখ পাইনে।”

“কি করে জানলে?—কখনো তো নাচ নি?”

—“বাঃ নেচেছি বই কী? কলেজের পার্টিতে অনেক নেচেছি।” জোন বললে,—“অনেক নয়,—একবার, কি দুবার। একবার হার্বাট এসে জোর করে নামিয়েছিল। আর একবার কার সঙ্গে যেন মনে নেই। কিন্তু কৃষ্ণা এত স্টিফ হয়ে ছিল যে, নিজেও সুখ পায়নি, ওর পার্টনারকেও দেয়নি।”

—“কিন্তু এ পার্টনার সুখ পাবেই,—একেবারে বদ্ধপরিকর। এস না কৃষ্ণা একবার অন্ততঃ দেখতে দাও তুমি কেমন নাচ জান?” কৃষ্ণার আধখানা ইতস্ততঃ করতে লাগল, বাকী আধখানা একটু এগিয়ে এল। হাল্কা কথা আর হাল্কা হাসি ওকে আবার ওর সেই পুরোনো চেনা জায়গায় ফিরিয়ে এনেছে। এতক্ষণ যেন কোন একটা অজানা রহস্যের দেশে চলে গিয়েছিল, যে দেশের পথঘাট জানা ছিল না। আবার এই চেনাশোনা পৃথিবীটাতে ফিরে আসতে পেরে,—ওর প্রাণ যেন হাঁপ ছেড়ে

বাঁচল। নিজের অজান্তেই দ্বিধা করতে করতে এগিয়ে এল সে। হাতে হাত নিয়ে এড বললে, "দেখি কুমারী। তুমি কেমন নাচ?—ওয়ান, টু, থ্রী। ওয়ান, টু, থ্রী,—হাঁ, এমনি করে আমার অনুসরণ কর নারী। এই একটা জায়গায় অন্তত মেয়েকে পুরুষের অনুসরণ করতে হয়, যদিও অন্য সর্বত্র নারীই নেত্রী। তাহলে এই,—এক, দুই, তিন,—এক, দুই, তিন। জোনও এসে যোগ দিল। ওরা সত্যিই ওয়ান, টু, থ্রী হয়ে উঠল। এড হাত ছেড়ে দিল। ওরা তিনজনে একজুড়ি হয়ে হাতে হাতে তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। "এক, দুই, তিন্, এক দুই তিন। একটু আগের উদাস হাওয়ায় ভেসে যাওয়া মনটা কৃষ্ণার আবার যেন ফিরে পেল পায়ের তলার মাটি। কৃষ্ণা নাচল,—ওয়ান, টু, থ্রী, ওয়ান, টু, থ্রী। কৃষ্ণা হাসল,—ভরা মন, খুশীর হাসি,—ফুলঝুরির মত ঝরে ঝরে পড়ল। ওর হাসিঝরা মুখের দিকে চেয়ে এড বলে উঠল—"অলিভ রঙের কোমল মুখের স্বাদ চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে।" হাততালি দিয়ে হেসে উঠল জোন বললে, "চেষ্টা করে দেখ না?"

কৃষ্ণাও হাসল, বলল, "অলিভগুলো নেহাৎ কষা টক। ও খেয়ে লাভ নেই।"

এসব কথার ইঙ্গিত কৃষ্ণা জানে,—বন্ধুদের এ ধরনের কথায় চিরকাল ওর গা শিরশির করে উঠেছে। আজ নিজের সম্বন্ধে সে-সব কথা শুধু সহ্য করল না,—নিজেও যেন চেখে চেখে বললে,—বলতে বলতে চাখ্‌ল। খিল্ খিল্ করে নুয়ে নুয়ে হাসল। ও হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলো, কথাগুলো ভালো নয়,—অন্তত ওর চিরকালের নীতিবোধের সঙ্গে মেলে না। নীতির সেই শেখাবুলি-গুলো সেই মুহূর্তে একেবারে ভুলে গিয়েছিল কৃষ্ণা,—যেন তারা ওর বহুকালের মরে যাওয়া পুরোনো আত্মীয়ের দল,—যাদের কথা কদাচিৎ কখনো মনে পড়ে। আর ওর বর্তমানকে ঘিরে ঘিরে যারা নাচছিল,—তারা যেন ওর নতুন পাওয়া বন্ধু; হঠাৎ জেগে উঠে কলরব করতে করতে তারা ওকে তুলে নিয়ে যেন একটা merry-go-round-এ তুলে দিয়েছে। হঠাৎ যেন আজব দেশের একটা আয়না হাতে পেয়ে কৃষ্ণা দেখছে—ওর চেহারাটা গেছে বদলে। ও যেন আর কৃষ্ণা নয়,—ও যেন একটা মূর্তিমতী আকাঙ্ক্ষা। ওর সমস্ত অস্তিত্ব নিঙড়ে মুচড়ে, একটা প্রবল বাসনা জ্বলতে জ্বলতে বলতে লাগল—চাই,

চাই, চাই। কি চায়, কাকে চায়,—তা কে জানে। শুধু চাওয়া, দেহহীন আকারহীন একটা বিপুল তৃষ্ণা হাতে হাতে ছুঁয়ে জ্বলচে। ও যেন এডমণ্ড বলে কোন বিশেষ মানুষের হাত নয়,—নয় কোন বন্ধুর হাত। ও শুধু পুরুষের হাত। আর কৃষ্ণা যেন নয় সেই আজন্ম পরিচিত ভালোমানুষ মেয়ে। ওর মধ্যে মত্ত হয়ে উঠেছে যে মেয়ে,—তার সঙ্গে ওর কোন কালেই পরিচয় নেই। কৃষ্ণার বিশাল চোখ নতুন তারার মত ঝিকমিক করে উঠল। আর নেশার মত একটা ছন্দ ওর মাথার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বাজতে লাগল,—ওয়ান, টু, থ্রী,—ওয়ান, টু, থ্রী,—ওরা তিনজনে গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে নাচতে লাগল। সেই তীব্র অনুভূতির নাগর দোলায় ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণার আবার চকিতের মত আর একটা কথা মনে হোল,—জগতে যেন মানুষ বলে কিছু নেই, শুধু আকাঙ্ক্ষারাই আছে। আকাঙ্ক্ষাই প্রধান,—মানুষ যেন তার হাতের পুতুল। নিজের খেয়ালতৃপ্তির জন্যেই যেন সে তাদের গড়ছে আপন ইচ্ছেমত। আকাঙ্ক্ষাই সব, মানুষ তার ধারক মাত্র। মহার্ঘ্য পানীয়ের মহার্ঘ্য পাত্র। সেই রকম তিনটে পাত্র যেন নাচছে আর তালে তালে উছলে পড়ছে সুবর্ণ মদিরা।

এদিকে 'সিলভারবার্চ' গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, কুমার অপেক্ষা করে বসে আছে। কৃষ্ণার মত পেলব একটি সুন্দর মেয়ে তার পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে গান গাইবে,—একটার পর একটা,—মৃদু মৃদু উদাস করা,—প্রাণ উতলা করা,—সুরে সুরে অনেকদূরে ভেসে যাওয়া গান। চারিদিকে রিম্ রিম্ করবে জ্যোৎস্না,—ডুবে যাবে অনুভূতির গভীরে।

কৃষ্ণা গাইবে,—"তুমি রবে নীরবে,
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশিথিনী সম।"
কৃষ্ণা গাইবে,—"মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে।"

কিন্তু কৃষ্ণা আসছে না কেন? এত দেরি করছে কেন? আড়াল থেকে ওর হাসি শোনা যাচ্ছে। উচ্ছ্বসিত অস্বাভাবিক ভুতেপাওয়া নেশার মত হাসি,—কৃষ্ণা কি তাহলে আসবে না? গানে গানে ওর শূন্য প্রাণ পূর্ণ করে দেবে না কোন নারী? ওর নিজের দেশের কোন সহজ মেয়ে? কিন্তু এদেশে সহজ মানুষও যেন কেমন হয়ে যায়, এখানকার হাওয়া বড় চঞ্চল, মানুষকে

ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী? কুমারের নিজের আজ চুপ করে থাকতে ভালো লাগছিল। কিন্তু তাই বলে যদি কেউ এর মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে চায় তো দোষ দেবে কাকে? চাঁদের আলো তো এত মধুর এত স্নিগ্ধ, তবু তার টানে সাগর উতল হয়ে ওঠে। সেই চাঁদ হয়ত আজ কৃষ্ণার মৃদুতা ধীরতার বাঁধনগুলির আলগা ফাঁস ধরে উল্টো টান দিয়েছে। কুমার উঠে দাঁড়াল, একটু ভাবতে ভাবতে এগিয়ে এল। ওদিকে বনের মধ্যে কৃষ্ণার হাসি যেন থমকে থেমে গেল। দ্বিধাভরে কুমার ভাবলে, কোন্ দিকে যাবে। না, ঐ তো কৃষ্ণা আবার হাসছে।

ওর স্বাভাবিক জলতরঙ্গের মত হাসি নয়,—থেমে থেমে গুমরে গুমরে বেধে যাওয়া হাসি। একটু এগোতেই কুমার দেখলে,—একটা ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো তীব্র চাঁদ ভায়লেট গাছকে প্লাবিত করে বন্যার মতো বয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক তারই নিচে, দুহাতে মুখ ঢেকে বসে কৃষ্ণা কাঁদছে। নাচতে নাচতে ওর খোঁপার আধখানা খুলে গেছে,—আঁচল লুটাচ্ছে এক পাশে। ডেজী ফুলের মালা কখন ছিঁড়ে খুঁড়ে পড়ে গেছে। শুধু দুচারটে ঝরা ফুল এখানে ওখানে লেগে আছে। সমস্তটা মিলিয়ে একেবারে যেন একটা ছবি,—কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুমার,—ওর মধ্যে যে শিল্পরসিক আছে, সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের সামনে কৃষ্ণার মর্মান্তিক বেদনা কান্না হয়ে ঝরে পড়ছে,—দেখতে পেল কুমার, তবু তাকে উপেক্ষা করে এই শিল্পরস ভোগ করতে পলকের জন্যে থমকে দাঁড়াল। এই ছবির জন্যে ঐ মেয়ের ঐ ক্রন্দনের প্রয়োজন আছে। তাহলে ওই থেমে থেমে গুমরে-ওঠা হাসিটা হাসি নয়, কান্না! কৃষ্ণা কি এতক্ষণ শুধু কাঁদছিল নাকি? না না, এই তো একটু আগে ওর হাসির বাঁশি কুমার নিজে শুনেছে কানে? তবু কুমারের হঠাৎ কেমন মনে হোল,—সেগুলোও হাসি নয়,—কান্নারই নামান্তর,—এতক্ষণ ধরে কৃষ্ণা তাহলে শুধু কেঁদেছে, নাচতে নাচতে কেঁদেছে, হাসতে হাসতে কেঁদেছে। অদূরে এড দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মত। আর জোন একেবারে বিমূঢ়। কুমারকে দেখে এড বললে,—"কুমার ওকে থামতে বল প্লীজ,—আমি অপরাধী। কিন্তু ওকে ক্ষমা করতে বল, ওকে থামতে বল।"

"ব্যাপার কী?" কুমার অবাক হয়ে বললে, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না"। তখন জোন এল এগিয়ে, বললে, "যত বোকামো তত ন্যাকামো,—ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, এডমণ্ড কৃষ্ণাকে একটা চুমো খেয়েছে মাত্র।"

—"ও না, আমি ভীষণ অন্যায় করেছি, আমি জানতাম, ভারতে এসব চলে না।"

—"কিন্তু কৃষ্ণা তো বাধা দেয় নি আমি নিজের চোখে দেখেছি।" না কৃষ্ণা তো বাধা দেয়নি, বরং যেন একটু একটু ডেকেছে। এড সে কথা জানে। কৃষ্ণার চোখের ঝিকিমিকি তারায় প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত ছিল। এডের আলিঙ্গনের মধ্যে কৃষ্ণার থরথর দেহের, অধরের মধ্যে কম্পিত অধরের নীরব স্বীকৃতি নিশ্চয়ই ছিল, নইলে এড সাহস করত না। তবু নিশ্চয়ই এডমণ্ডেরই অপরাধ। সে যে পুরুষ, সে কি কখনো মেয়ের কাঁধে তুলে দিতে পারে? অপরাধের বোঝা, দোষ তারই একশবার! ক্ষমা কর কৃষ্ণা, ক্ষমা কর প্লীজ।" তবু কৃষ্ণা মুখ তুলল না, কথা বলল না। এরকম করে কাঁদবার লজ্জা আরো তাকে মুখ তুলতে দিল না।

কুমার বল্লে, ব্যাপার কী? হঠাৎ চুমোই বা খেতে গেল কেন এড?"

জোন বললে, "ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, আমরা নাচতে নাচতে ছুটোছুটি খেলতে শুরু করে দিয়েছিলাম; কৃষ্ণাকে ছুটতে দেখে এড গিয়ে তাকে ধরে ফেল্লে, আমার কিন্তু মনে হোল, কৃষ্ণা বড় শীগ্‌গির ধরা দিল। ছুটে গিয়ে কোন মেয়েকে ধরা মানেই যে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়া, এ বিষয়ে এডের কোন সন্দেহ নেই, আমার উপরে এ কৌশল অনেকদিন প্র্যাকটিস করেছে। আজ কৃষ্ণার উপরে করতে গিয়েই এই বিপত্তি। সিলি, আমি নিশ্চয়ই বলব, এ একেবারে অদ্ভুত বোকামি, কান্নাকাটি করে সমস্ত মজা মাটি করে দিল।"

সেদিন অনেকক্ষণ কুমার চুপ করে বসে রইল কৃষ্ণার পাশে। এড আর জোন ফিরে গেল ফার্মে। কুমার চুপি চুপি বললে,—"তোমরা এগোও, আমি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখুনি ঠিক নিয়ে যাব। শুনে এড হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল। কুমার বললে—"কী"? এড বললে—"কিছু না।"

কৃষ্ণার কান্না ততক্ষণে থেমে এসেছে। ও বুঝল, কুমার পাশে এসে বসেছে। তবু মুখ তুলল না, হাত খুলল না, কুমার একবার ভাবলো, ওকে ডাকে,—কৃষ্ণা হাত খোলো, মুখ তুলে চাও, আবার ভাবলো থাক। মনে হলো, পিঠে হাত রেখে, চুলগুলো একটু সরিয়ে দেয়, কিন্তু সাহস হোল না। ওর সমস্ত ভঙ্গীতে কি যেন কি একটা ছিল, কুমারের ইচ্ছে হোল ওকে জড়িয়ে ধরে, মৃদু মৃদু আদরে ডুবিয়ে দেয়, ছোট ছোট চুমায় ওর সমস্ত কান্না মুছিয়ে দেয়, কিন্তু ভয় হোল, তাহলে আবার ও কাঁদতে শুরু করবে। কান্না দিয়ে পুরুষের ব্যগ্র বাহুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কী? এডমণ্ডকে মনে মনে একটুও দোষ দিতে পারল না কুমার। দোষ এই মায়াবিনী চাঁদনী রাতের। এই জন্যেই যোগীরা চাঁদের আলোকে বিশ্বাস করেন না, আর বিশ্বাস করেন না কামিনীকে। আস্তে ওর মাথায় হাত দিয়েই তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিল কুমার।

—"অন্যায় করলাম কী?"

—"বাঃ না," চোখ তুলে, হাসির আভাসে কৃষ্ণা একটু রঞ্জিত করল তার মুখ। তখন তার চোখে চোখ রেখে হাসল কুমার, বললে,—'এডের উপরে রাগ কোর না ভাই লক্ষ্মীটি, ওর দোষ নেই।"

—"আমি জানি," কৃষ্ণা বলল, ওর দোষ নেই, এটা ওদের পক্ষে অনেকখানি স্বাভাবিক।"

"তবে?"

—"তবে কী?" কৃষ্ণা বললে,—"আমি তো ওর উপরে রাগ করিনি।"

—"তবে?"

"তবে," কৃষ্ণা একটু হাসল, ভিজে চোখের পাতা একটু কুঞ্চিত করে হাসল,—"আমি নিজের উপরে রাগ করেছিলাম। ওর উপরে রাগ করলে তো ওকে বকতাম। নিজের উপরে রেগেছি বলে কাঁদলাম। তাছাড়া আর কি করব?" হতাশ চোখ মেলে কৃষ্ণা কুমারের মুখের দিকে তাকাল।

—"কেন এত রাগলে নিজের উপরে? বলবে কৃষ্ণা? না, এ আমার অন্যায় কৌতূহল।"

"না না," কৃষ্ণা হাঁপিয়ে উঠল,—"আমি বলব তোমাকে, বলব, কুমার, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, যা করতে নেই, যা অন্যায়, আমি

তাতে শুধু সায় দিই নি, তা আমার বেশ ভালোই লেগেছিল বোধ হয় আচ্ছা, কেন ভালো লাগল বল তো ?”

—“হা হা হা, কেন ভালো লাগল ?—হা হা,” কুমার হেসে উঠল। আর সেই হাসির হাওয়ার ধাক্কায় এতক্ষণের জমে-ওঠা মেঘের মত ঘন বিষাদ যেন সরে সরে গেল, কুমার বললে,—“ভালো লাগাটা যদি অপরাধ হয়, তবে দোষ তো তোমার নয় কৃষ্ণা, দোষ তোমার সেই বিধাতার, যিনি ভালো লাগান।”

—“সত্যি কুমার, আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে, অন্যায়কে মানুষের ভালো লাগে কেন ? সে তো অন্যায়।”

—“ন্যায় অন্যায় তো আর বিধাতার সৃষ্টি নয়। ও দুটোই মানুষের সৃষ্টি। তাই মানুষ ওদের নিয়ে এত মত্ত হয়ে ওঠে।”

—“তা বটে,” কৃষ্ণা সায় দিল, “বিধাতার সৃষ্টি তবে কী” ?

—“ভালো লাগা, শুধু বেঁচে থাকা,—শুধু জীবন, শুধু আনন্দ”।

—“কিন্তু,” কৃষ্ণা বললে, “অন্যায়ের মধ্যে, পাপের মধ্যে আনন্দ তো বাঁচে না, দমবন্ধ হয়ে মরে যায়, এই দেখ না, অন্যায়ের একটু ছোঁয়াতেই কত কাঁদলাম”।

গম্ভীর হবার ভাণ করে কুমার বলে, “তোমার কান্নায় কি ক্লেদ ছিল ?”

—কৃষ্ণা বললে, “তা একটু ছিল বই কী ?

—“তবে তুমি পাপিনী”, হেসে উঠল কুমার। “সত্যি” ? কৃষ্ণা বললে ধীর ভাবে।

—“বাজে কথা” কুমার অধীর হয়ে বললে,—“তুমি কেন একে অন্যায় ভাবছ কৃষ্ণা ? তুমি ও এডমণ্ড একজোড়া তরুণ তরুণী মাত্র। তোমাদের বিশেষ সত্তাকে তোমার বিশেষ অহঙ্কারকে ভুলে গিয়ে একটু সেদিক দিয়ে, যদি দেখ, তাহলে বুঝবে, এই চাঁদের আলো, এই বনভূমি, ওই মধুমাসের মতই তোমরা দুজনেও প্রকৃতির একটা অঙ্গ মাত্র। তার হাতের বাইরে যাবার ক্ষমতা তোমার ছিল না। আর আমার তো মনে হয়, মানুষের তৈরী কতগুলি বানানো তত্ত্বের চেয়ে, প্রকৃতির সত্য অনেক বড়।”

—“বড় মানে কী ? কিসে বড় ?”

—“মানে, সে তার দাম চুকিয়ে নেয়, হাতে হাতে শোধবোধ।

মানুষের তত্ত্বগুলি বসে বসে সুদ কষে। এই দেখনা, প্রকৃতি তোমাদের ঠেলে ঠুলে কাছে এনে, এক মুহূর্তে মুখে মুখে মিলিয়ে দিল, আর মানুষ বসে বসে তত্ত্বকথা আর নীতিকথার জাল বুনে তোমার মনে জমিয়ে তুলল ক্লেদ"।

—"ইস্, বোল না, বোল না," দুহাতে কান ঢেকে কৃষ্ণা বললে।

—"কী" ?

—"ওইসব বড় বড় কথা, প্রকৃতির সত্য আর মানুষের তত্ত্ব"।

—"তবে তুমি কাঁদলে কেন ?"

—"তুমি কিছুই বোঝ না কুমার, সেজন্যে আমি কাঁদিনি মোটেই।"

—"তবে ?" মূঢ়ের মত কুমার ওর দিকে প্রশ্ন মেলে তাকাল।

তখন দুই কালো চোখে ভরা অভিমান ছলছলিয়ে কৃষ্ণা কুমারের দিকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে রইল, কথা বলল না।

কুমার বললে,—"কী" ?

কৃষ্ণা বললে,—"তুমি এলে না কেন ? আমাদের খেলায় যোগ দিলে না কেন ? কত জোরে জোরে হাসলাম, তুমি শোননি কেন ? বেশ তুমি একা বসে বসে শুধু তার ধ্যান করলে যে তোমাকে ফেলে চলে গেছে,—আর যে তোমাকে চায় তুমি কেন কিছুতেই তার দিকে ফিরে চাইলে না ?"

অভিমানে গলা কৃষ্ণার প্রশ্নগুলি যেন আলিঙ্গনের মত কুমারের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরল। ওরা যেন কথা নয়, কৃষ্ণার ছোট হাতের ছোট ছোট আদর। কুমারের বুকের মধ্যে কোথা থেকে চাঁদের টানে টানে, অকূল সমুদ্র ফেনিয়ে উঠল। ওর ইচ্ছে কৃষ্ণার মুখে চোখে চুমোর মত ছুঁয়ে রইল, তবু কুমার ওকে ছুঁতে পারল না। কৃষ্ণা বললে, "ও কেন আমাকে প্রথম ছুঁল, তুমি কেন ছুঁলে না,—তোমার জন্যে যা ভরে রেখেছিলাম ও কেন তার প্রথম স্বাদ নিল ? আমি বুঝিনি, জানিনি, চিনিনি নিজেকে, তাই ভালো লেগেছিল। আমার মধ্যে যে নারী আছে, পুরুষের ছোঁয়ায় সে জেগে উঠেছিল, ভেবেছিলাম, সে তুমিই ; যেই মনে হল, সে পুরুষ তুমি নও, তবু আমার আকাঙ্ক্ষা আমাকে থামতে দিচ্ছে না, তখনি আমার বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠল,—আমি কাঁদলাম, তুমি এলে না কেন ? এত দেরি করলে কেন ?" কৃষ্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কুমার বললে—"কৃষ্ণা !"

—"কী" ?

—"চল পালাই" ।

—"কেন ?"

—"ভয় হচ্ছে, যদি ফস্ করে এডমণ্ডের মত কিছু বোকামো করে বসি ?"

কৃষ্ণা তাকিয়ে দেখল, কুমারের মুখের উপরে চাঁদের সাদা আলো লাল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা বলল, "চল !" কিন্তু উঠল না।

কুমার বললে, "কৃষ্ণা, আজ বড় ইচ্ছে ছিল, তুমি আমায় গান শোনাবে, এতক্ষণ ধরে সেই বাসনা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। মনে মনে তোমার হয়ে কতবার সেই গানটা গাইলাম, ভাঙা স্বরে, তুমি রবে নীরবে, কিন্তু তুমি গাইলে না। ভাবলাম তোমার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে গানটাকে সত্যি করে তুলব। এসে দেখি তুমি কাঁদছ। তুমি কাঁদলে, তুমি কথা কইলে, তুমি নীরব রইলে না, কৃষ্ণা, তবু তুমি আমায় ভরিলে গৌরবে। আশ্চর্য, সারা সন্ধ্যে যা চাইছিলাম, তা পেলাম না, কিন্তু যা পেলাম, তা বোধহয় অনেকদিন ধরেই চাইছি।"

"সত্যি ?" কৃষ্ণা হাসল, "আমি বুঝতে পারি নি।"

"আর তুমি ?" কৃষ্ণার মুখে চেয়ে হাসল কুমার। দেখে মনে হোল না, একটু আগেই সব বড় বড় তত্ত্বকথা বলছিল। ও যেন কৃষ্ণারই বয়সী আর একটি ছেলেমানুষ। কৃষ্ণার উঁচু করে রাখা হাঁটুর উপরে চিবুক রেখে ওর চোখের মধ্যে চোখ মেলে, কুমার বললে,—"আর তুমি ? তুমি আমায় কবে ভালোবেসেছ ?" কৃষ্ণা হাসল, "আমি ? আমি তোমায় চিরদিন ভালো-বেসেছি। যখন তোমাকে ভালো করে দেখিইনি, শুধু শুনেছিলাম যে, তুমি আছ। তারপরে যখন তোমাকে দেখলাম তখন, যেদিন তুমি আমায় স্কুলে পৌঁছে দিলে। যেদিন তুমি বললে,—তুমি আমাকে ভালোবাসো না, অন্যকে বাসো, সেদিনো। আর এই যে রোজ তুমি আমার পাশে বসে এলে, তবু একবার ফিরেও চাইলে না,—তখনো, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমি তোমাকেই ভালোবেসেছি ! কিন্তু, এই মুহূর্তের আগে তা বুঝতে পারিনি ভালো করে।

"কিন্তু",—

মৃদুস্বরে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল কৃষ্ণা। "কিন্তু," মনে মনে উচ্চারণ

করল কুমার। ভালোবাসার নতুন রঙে পুরোনো রঙের ছায়া কালো হয়ে পড়ল। সাত হাজার মাইল দূর থেকে মেরী ডিকসনের ছবি ওদের দুজনের মনে একসঙ্গে ভেসে উঠল। মেরী হঠাৎ ভারতযাত্রী স্বামী বেছে নিল কেন ?

পরদিন ওরা ভেবেছিল, সকলেরই ঘুম থেকে উঠতে দেরি হবে, কিন্তু সকলেই উঠে দেখল, অন্য সবাই উঠেছে খুব ভোরে। তিনতলার একটিমাত্র ছোট ঘর। যাকে এরা বলে 'এটিক', সেইখানে জোন আর কৃষ্ণার শোবার ব্যবস্থা হোল। রাতে ফিরে এসে, আলো না জেলে শুয়ে পড়ল কৃষ্ণা। জোন বোধহয় ঘুমিয়েছিল, কিংবা ঘুমের ভান করে পড়েছিল। কথা বলেনি। ভোরে উঠে কৃষ্ণা জোনকে দেখতে পেল না। সে আগেই উঠে গেছে। কৃষ্ণার মনে হোল, অনেকক্ষণ ভোর হয়েছে। ফার্মে সবাই উঠে পড়েছে নিশ্চয়। ওর ঘরের পুবদিকের ছোট জানালার লেসের পর্দা প্লাবিত করে নতুন রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরে। কৃষ্ণা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিচে নেমে দেখে, চারদিক জুড়ে একটা অখণ্ড প্রসন্নতা নীলাকাশের শান্ত আলোর মত ঝরে পড়ছে। অদূরে অর্চর্ডের আপেল গাছগুলির ফুলের গোড়ায় ফল গোল হয়ে উঠেছে। আর সুগন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। আর তার উপরে সোনার আলো ঝলমল করছে। এদিকে একটা চেস্টনাট গাছের গুঁড়িতে পাটলী গাই 'ডেলায়া' বাঁধা আছে। তার নধর বাছুর 'ডিক' স্তনে গুঁতো মেরে দুধ খাচ্ছে। সেই আঘাতে, সেই টানে, পাটলীর প্রাণের মধ্যে মাতৃত্বের আবেগ ফুলে ফুলে তার মুখ দিয়ে সুখের মত একটা মৃদু ঘর্ঘর ধ্বনি হয়ে বাজছিল। খড়ের গাদার কাছে কাঠের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কুমার অবাক হয়ে দেখছিল। মুরগীদের ঘরে সকাল হয়েচে অনেকক্ষণ। তারা কলরব করতে করতে তাদের জাল ঘেরা উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগারো বছরের কলিন স্কট তাদের খেতে দিচ্ছিল। হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্তটা মিলিয়ে অদ্ভুত একটা শান্ত সৌন্দর্য যেন তুলি দিয়ে আঁকা, যেন ছবি।

কৃষ্ণাকে দেখে কুমারের চোখ হেসে উঠল অভ্যর্থনা জানিয়ে,—মুখে বললে,—"সুপ্রভাত।"

কৃষ্ণা হাসল, ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—"কী সুন্দর!" কুমার মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড় মুরগী, গরু, এদিকে স্ট্রবেরী ও কচি আপেলের মিষ্টিগন্ধ সব একসঙ্গে মিলে ওদের ঘ্রাণে একটা মিশ্র অনুভূতির আস্বাদ পৌঁছে দিচ্ছিল। কৃষ্ণা অবাক হয়ে ভাবল, কাল সন্ধ্যাটা হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে কি কাণ্ডই করে গেল। সব যেন ওলোট পালট হয়ে গেল। অবশ্য আজ সকালে এইটেই কেমন সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এমন কি কাল যে একটা বিশেষ কিছু ঘটে গেছে তাও যেন মনে আসছে না। শুধু কুমারকে একটু বেশী আপনার মনে হচ্ছে। ওর পাশে এসে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মাত্র মনে মনে কোথা থেকে একটা স্থির বিশ্বাস এসে দাঁড়াল। মনে হোল যেন বহুদিনের চেনা জায়গায় বহুদিন পরে ফিরে এল।

চাষীর কিশোরীর মেয়ে শীলা এসে একটা ছোট টুলে বসে, দুই হাঁটুতে বালতী গুঁজে দুধ দুইছে। শুভ্র সফেন দুগ্ধে বালতী ভরে ভরে উঠছে। এক হাতে বালতী নিয়ে অন্য হাতে গরুর পিঠে আর পেটে অল্প একটু আদরের হাত বুলিয়ে, শীলা ঘরের দিকে চলে গেল।

কুমার বললে,—"কি সুন্দর!"

কৃষ্ণা বললে,—"এরই নাম দুহিতা। দুগ্ধ দোহন করে যে,—সেকালে বাড়ীর কিশোরী মেয়েদের ঐটেই ছিল ভোর বেলাকার প্রথম কাজ। তাই তাদের নাম দুহিতা।"

কুমার অবাক হয়ে বললে,—"সত্যি?" তাহলে শহরের মেয়েদের দুহিতা বলা চলে না?"

কৃষ্ণা হেসে উঠল। "ওর মামার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ,—মামা বলতেন, 'মেয়েরা শুধু দুগ্ধ দুহিতা নয়, পিতৃরক্ত দুহিতা।' শুনে মামী রাগ করে বলতেন, ভালগার। যা কিছু মামীর খারাপ লাগত তাই একেবারে ভালগার হয়ে যেত,—বিশেষ করে মামার কাছে।"

সেই মুহূর্তে কুমারের মনে পড়ে গেল রমলার কথা। রমলার কথা মানেই দুঃখের কথা, সুখের সময়ে ওর কথা মনে হলেই মনটা চুপসে যায়। রমলা মানেই দুঃখ, আর দুঃখ মানেই ভারতবর্ষ। দুঃখ মানেই বাংলা দেশ, আর বাংলা দেশ মানেই মা।

কে জানে এই মুহূর্তে মায়ের দিন কেমন কাটছে। বাবার হার্টের অসুখ কেমন আছে। হঠাৎ কেমন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা ঘটে গেছে, কিম্বা শীগ্‌গিরই ঘটবে। যেন কি একটা মস্ত দুঃখ ওৎ পেতে বসে আছে। এখনই এই সুখের জালের উপরে লাফিয়ে পড়বে। সুখে আর ওদের কারুই বোধ হয় অধিকার নেই। যে দেশে আজো মানুষ না খেয়ে মরে, সে দেশের প্রতি মানুষের প্রতিটি সুখ কালো হয়ে গেছে। দুঃখের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে সুখগুলি আজ কালো। ভারতবর্ষে এমন কি কেউ আছে, যার সুখও আছে, হৃদয়ও আছে। যার হৃদয় আছে, সুখ তার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়।

নাগালে আসে না, তার দিকে হাত বাড়াতে গেলেই, চারিপাশের দুঃখী মানুষের ব্যথিত মুখগুলি ভিড় করে দাঁড়ায়। তারা বাধা দেয় না, পথ আটকে ধরে না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—তুমি সুখে থাক, আর সেই বলার দ্বারাই জানিয়ে দেয়, তোমার পথে আমার পথ আর কখনো মিলবে না, তোমার সঙ্গে এই আমার চিরবিচ্ছেদের সূচনা। তাই আশীর্বাদের বাণী দুঃখের অভিশাপে তপ্ত হয়ে শুকিয়ে যায়। যার হৃদয় আছে, সুখে তার অধিকার নেই। তবু সুখ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণার মতো মেয়েকে ভালোবাসায় সুখ আছে। মেরীও ভালোবাসা আদায় করত, কিন্তু সে অন্যরকম। মেরীর মত মেয়েরা পুরুষের আশ্রয়, ওদের কাছে সব ভার ফেলে দিয়ে পুরুষ নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু এ মেয়েকে দেখলে ভার মাথায় তুলে নিতে সাধ হয়। এদের রক্ষা করার জন্যেই পুরুষের বাহুতে বল, এদের প্রেরণায় পুরুষের শক্তি। এমন একটি মেয়ে সব কিছু জেনেশুনে স্বেচ্ছায় কুমারকে ভালোবেসেছে। তবে কেন কুমার তার হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারবে না সুখের পথে ?

—হাসতে হাসতে চুপ করে গেল কৃষ্ণা। দেখলে কুমার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কেন ? কুমার কি তবে সুখী নয় ? কৃষ্ণা যে অভিমান ভুলে নিজে সেধে প্রেম উচ্চারণ করল, তবু কি তার সব ব্যথা মুছে নিতে পারল না। তবে কৃষ্ণা এমন বোকামি করে নিজের চিত্ত উদ্ঘাটিত করল কেন ? নারীত্বের গর্ব ওর বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে চোখের মধ্যে ছলছল করতে লাগল।

চারিদিকে প্রভাতের নির্মল প্রসন্নতা আর তার মাঝখানে কুমারী মেয়ের

মনের মধ্যে ক্ষুব্ধ অভিমান, ঠিক ছন্দ মিলছে না, কুমার বুঝতে পারল। ও জানত, ওর একটা কথায় সব মেঘ এখুনি কেটে যাবে, ওর একটু ইঙ্গিতে প্রকৃতির সঙ্গে নারীমনের ছন্দ এক সুরে মিলে যেতে পারে। কিন্তু সেই কথাটা ও কিছুতেই বলে উঠতে পারল না। ওর পক্ষে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। ওর সঙ্গে এই সকালের এখন আর যেন কোন অমিল নেই। ওর মন বহুদিন ধরে নিজের অজ্ঞাতেই কৃষ্ণার অর্ঘ্য গ্রহণ করে, ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল,—হঠাৎ কাল তার আবরণ ঘুচে গেল। আর অমনি কুমারের সমস্ত দেহমন ভরে সেই পূর্ণতা টলটল করে উঠল। তার মধ্যে কোন অভাব কোন দৈন্যের লেশ নেই। কৃষ্ণা কেন মিছিমিছি অভিমান করছে, কেন ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছে না, যে এ কত মিথ্যে।

হঠাৎ মুখ তুলে কৃষ্ণা বললে,—"কুমার, তুমি সুখী হওনি ?" বলতে বলতে গলা বেধে এল।

কুমার হাসল। বলল,—"সেই কথাই ভাবছিলাম, সুখে আমার অধিকার আছে কিনা ?" ওকে রাগাতে ভালো লাগছিল কুমারের—

কৃষ্ণা অবাক হয়ে বললে—"কেন ?"

কুমার বললে—চারিদিকে এত দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ দুজনে মিলে সুখী হয়ে যাওয়াটা কেমন যেন স্বার্থপরের মত দেখায় না ?"

"সত্যি ?" কৃষ্ণা বড় চোখে বিস্ময় ভরে তাকাল, আর সেই মুহূর্তে নিজেকে সত্যিই বড় ছোট মনে হোল,—বড় স্বার্থপর। কুমারের বুকের মধ্যে স্নেহ এবং কৌতুক একসঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণার হাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কুমার বললে, "কৃষ্ণা ভুল বুঝো না, Please, রাগ কোরনা,—কিছুতেই নয় কৃষ্ণা, তোমার বিশ্বাস হারিও না,—হারিও না সরলতা। তোমার বিশ্বাসেই আমার আশ্রয়, কৃষ্ণা, তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর আমি বাঁচতে পারব না।

কুমারের হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরে মুখ লুকালো কৃষ্ণা। তবু কুমার কামনার আবেগ খুঁজে পেল না নিজের মধ্যে, কামনা যেন পূর্ণ হয়েই আছে, না খেয়েই মিটে গেছে ক্ষিদে, তৃপ্ত হয়েছে তৃষ্ণা বিপুল একটা শান্তির মধ্যে।

এই তো কদিন ও কৃষ্ণার কাছাকাছি এসেছে মাত্র, সবে ওকে একটু

একটু চিনবার সুযোগ পেয়েছে। তবে কি করে এই মুহূর্তে কৃষ্ণার মধ্যে দিয়ে একটা পরিপূর্ণতা ওকে যেন ঘিরে ধরল। কিন্তু এ আলিঙ্গনে উত্তেজনা নেই, শুধু শান্তি শুধু বিশ্রাম, মাতৃগর্ভের মত। কুমারের মনে হোল, ও যখন ভ্রূণ হয়ে নিজেকে সৃষ্টি করে তুলছিল,—তখন ওর চারিদিকে এই রকম বিশ্রামের আলিঙ্গন ঘিরে ছিল। বিরাট সৃষ্টির আগের বিরাট শান্তি। সেই শান্তি ওর প্রাণের প্রথম বীজকোষের মত ওর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। তবু এতদিন তাকে মনে পড়েনি,—যেন তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আজ সকালে এই মেয়েটির সাহচর্যে কি করে তার আবরণ ঘুচে গেল, সেকথা ভাবতে চেষ্টা করছিল কুমারের জাগ্রত মন। কিন্তু ওর চেতনার গভীরে ভাব এত পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে ও কথা কইতে পারল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কৃষ্ণার হাসি কখন থেমে গেছে। কুমার বুঝতে পারল, এই শান্তির অংশ কৃষ্ণা ভোগ করছে না হয়ত তেমন করে। ওর মধ্যে থেকে শান্তির জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে পূর্ণিমার মতই কুমারকে প্লাবিত করে দিয়েছে। কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে না, ও এখনো চাইছে দিতে। দেয়া ওর হয়ে গেছে, আর কুমার গ্রহণ করছে সেই দান।

যে ওকে এই শান্তি, এই সুখ, এই বিশ্রাম এনে দিয়েছে,—অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও ফিরে কিছু দেওয়া উচিত কুমার ভাবে, মনকে এই বিশ্রাম সুখের মধ্যে থেকে তুলে জাগিয়ে দিতে চায় কুমার। ইচ্ছে করে সত্যি সত্যি একটু আদর করে, ওর সত্তার উপরে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে দেয়, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন লজ্জা করে ওঠে। মনে হয় এটা যেন ইংলণ্ডের একটা অজানা গ্রাম নয়। যেন কলকাতায় দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাকে পাশে নিয়ে, পাশের ঘরেই সবাই আছেন, মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন। যেন কৃষ্ণার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে, আর সবাই চারিদিকে আড়ি পেতে আছে।

কুমার বললে,—"কৃষ্ণা, আজ তোমায় নিয়ে আমি উধাও হয়ে যাব। আজ রাতে, যখন সবাই ঘুমাবে, যত রাতই হোক, তুমি উঠে এস চুপি চুপি।" কৃষ্ণা অবাক হয়ে হাত ছেড়ে তাকাল। কুমার বললে, "যে

ঝরণার ধারে চাঁদের দেশে তোমাকে প্রথম পেলাম, আজ আবার সেইখানে গিয়ে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা করব। সাক্ষী থাকবে সমস্ত বনভূমি।" উল্লাস নেচে উঠল কৃষ্ণার চোখ, ও বললে,—"যাব।"

কৃষককদুহিতা শীলা হাসিমুখে দু গেলাস সফেন দুধ নিয়ে এসে দাঁড়াল।

"ও, দুঃখিত।" কৃষ্ণা বললে,—"কেন কষ্ট করে নিয়ে এলে। আমরা এখুনি যেতাম।

—"জানি তোমরা যেতে না", শীলা হাসল, "তাই আমি মাকে বললাম, দু গেলাস দুধ ওদের দিয়ে আসি দাও। ভারতীয় পায়রা দুটো এমন প্রেমের পাঠ নিচ্ছে, আসবে না।" কৃষ্ণা লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কুমার হাসল, খুশীর হাসি। বললে, "তোমার মা কি বল্লেন শুনে,—"

শীলা তার ফ্যাকাশে নীল চোখে কৌতুক জ্বালিয়ে বললে, "মা বললেন, ভারতীয়েরা এখানে শুধু সায়ান্স শিখতেই আসে না, আর্ট শিখতেও আসে। প্রেমে পড়ার আর্ট।"

এড এসে দাঁড়াল পিছন থেকে, বললে,—"আমার দুধ?"

শীলা হাসল,—"এনে দেব এখানে?"

—"দাও না লক্ষীটি অনুগ্রহ করে?"

কুমার বললে,—"জোনকে দেখছি না সকাল থেকে?"

শীলা বললে,—"সে এখন আমার বাবার সঙ্গে ডিমে তা দেয়া শিখছে। সকালে উঠে ইনকিউবেটারের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।"

"ভারি মজা তো", কৃষ্ণা বললে,—"চল আমরাও যাই।" ওর চোখে চোখ না ফেলে এড বললে, "আমি ইতিমধ্যে ঘুমন্ত গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। মনে হচ্ছিল যেন স্লিপিং বিউটির দেশে চলে এসেছি,—" কৃষ্ণা দেখল এডমণ্ড অপ্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ওর মায়া হোল; ওর মন এখন কানায় কানায় ভরা, বিন্দুমাত্র অভাবের শূন্যতা সেখানে সয় না। কৃষ্ণা বললে,—"এডমণ্ড ফিন্।"

এড মুখ তুলে তাকাল, দেখল কৃষ্ণা হাসছে। সে হাসিতে গতকালকার গ্লানির কোন চিহ্ন নেই।

কৃষ্ণা বললে —"আমাকে ক্ষমা করবে এড?"

এড কি বলবে ভেবে পেল না। আমতা আমতা করে বললে,—"আমি কেন, তোমারই তো ক্ষমা করার কথা। দোষ তো আমার।"

কৃষ্ণা হাসল,—"কার দোষ কার গুণ যদি ভুলে যেতে পার তবে আবার আমরা বন্ধু হতে পারি।"

এডমণ্ড তেমনি চুপ করে রইল।

কৃষ্ণা বললে,—"তুমিও কিছু বোকামো করেছিলে, আমিও কিছু বোকামো করে তার উত্তর দিয়েছিলাম। ব্যস্ হয়ে গেল তার শোধবোধ।"

তখন ওর দিকে খোলা চোখে চেয়ে এডমণ্ড আবার আগের মত পুরোপুরি হাসল। মাথা নুইয়ে বিলিতী নমস্কারের ভঙ্গীতে বললে,—"তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম।" কৃষ্ণা এগিয়ে এসে নিজে থেকে ওর হাত ধরে। বিলিতী কায়দায় নেড়ে দিয়ে বলে,—ধন্যবাদ এড।

ছোট একটা চৌকো ঘরে একটিমাত্র ছোট দরজা; মুরগীমায়ের কোলের মত। সারি সারি কাঁচের বাক্স থরে থরে সাজানো। ঘরের মাঝখানে উনুন জ্বলছিল। আর সেই উনুন থেকে সরু সরু নল চলে গিয়ে কাঁচের বাক্সগুলি বেষ্টন করে মিলেছে একটা বড় নলে যেটা বাইরে থেকে ভরে আনছে নতুন বাতাসের নিঃশ্বাস। বাইরের হাওয়া সেই নলে ঘরে ঢুকে উনুনে গরম হয়ে বাক্সগুলি গরম করছে, মুরগী মায়ের নরম পালকে ঘেরা গরম দেহের মত। কাঁচের বাক্সে তুলোর উপরে মানুষের বুদ্ধি হাজার ডিমে একসঙ্গে তা দেয়। স্কট উনুনের তাপ পরীক্ষা করছিল, ঘরের বাতাসটা বদ্ধ হয়ে গুমট্ হয়ে উঠেছে, আর জোনের প্রশ্নের শেষ নেই। কিন্তু জোনকে বোঝাতে স্কটের তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। ও কথা বলতে ভালোবাসে না, কথা শুনতেও না, গোঁজ হয়ে চুপ করে বসে থেকে নিজের মনে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বকতে ভালোবাসে। মেয়েদের সঙ্গে একটিমাত্র সম্বন্ধের কথাই ওর ভালো করে জানা আছে, সেজন্যে একটু-আধটু কথা বলতে ও রাজী। কিন্তু অকারণ বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা ও পছন্দ করে না। তাছাড়া এইসব বড়লোকের মেয়েরা শখ করে গ্রামে বেড়াতে এসে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে, "তুমি কি আগে কখনো ইনকিউবেটার দেখনি"? স্কট জিগ্যেস করে। "গ্রামেও কি আসোনি এর আগে? আমি তো জানি বড়লোকের ছেলে-মেয়েদের এ একটা ফ্যাশান"।

"গ্রামে এসেছি বটে, তবে চাষবাড়ীতে আসিনি কখনো। আগে তো বাবামায়ের সঙ্গে ঘুরতাম,—যে গ্রামে ভালো হোটেল আছে, শুধু সেইখানে

থামতাম।" জোনের মনে পড়ল ভালো হোটেলের প্রতি ওর মায়ের দুর্বলতার কথা,—যেখানে সেখানে রাত কাটানো অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেই স্বভাব পেয়েছে ওর ভাই 'জন'। জন্ এলে এমন হৈ হৈ করে যেখানে সেখানে থাকতে, রান্নার গন্ধ-মাখা ঘরে, পালিস্-উঠে-যাওয়া কাঁটা চামচে দিয়ে খেতে পারত না, শুতে পারত না যেমন তেমন ঘরে পাঁচজনের সঙ্গে। ওর বাবা কিন্তু ওরই মত, আমোদ করতে কোথাও তাঁর বাধে না। বাবা বলেন—স্ত্রী না হতে পারলে কখনো ভোগ করতে পারবে না। অভ্যেসগুলোকে বেশী উপরে উঠতে দিলে, ওরা মাথায় চড়ে বসে তখন আর ওদের না মেনে উপায় থাকে না,—তাই উচিত হচ্ছে ওদের পদানত করে রাখা। তাহলে কোন আমোদের কোথাও বাধা নেই"। মা বলতেন,—"আমার ভোগের জন্যে অনেক আয়োজন চাই, অনেক প্রস্তুতি,—অনেক সজ্জা। নইলে দরকার নেই। আমার পানীয় যেমন তেমন করে পান করতে পারব না,—দামী কাঁচের পাত্র চাই,—স্যুপ যদি খারাপও হয়, ক্ষতি নেই,—চামচটা রূপোর হওয়া চাই,—আর বাবার স্বভাব উল্টো,—চামচ যেমনই হোক,—স্যুপটা ভালো হলেই হোল।"

স্কটের গলা শোনা গেল খুব কাছে,—"ডিম থেকে বাচ্চা বেরুনো দেখতে চাও"? স্কটের স্বরটা গুমগুমে,—তার উপরে উচ্চারণ স্কটিশ,—অর্ধেক কথাই আন্দাজে বুঝে নিতে হয়। জোন উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছিল,—স্কটের কথা শুনে ঘাড় ফেরাতেই মুখে মুখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল,—স্কট এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে কাছে।—ঘোৎ করে একবার 'দুঃখিত' বলে, স্কট সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল,—নড়ল না,—জোনের ঘাড়ে আর গলায় ওর নিঃশ্বাস জোরে বইতে লাগল,—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জোন অবাক হয়ে গেল,—ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল,—ওঃ এরও সখ আছে। মনে মনে হেসে উঠল জোন,—মন্দ কী? নতুন অভিজ্ঞতা,—গাঁয়ের চাষীর সঙ্গে,—ফিরে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবার নতুন কাহিনী পাবে,—চামচটা রূপোর নয় বটে, কিন্তু স্যুপটা হয়ত ভালোই হবে। স্কটের চেহারা লম্বা, চওড়া কপাল আর চওড়া কাঁধ,—আর রোদে পোড়া তামাটে রং। আর একজোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ।

জোনের ঘাড়ের উপরে কঠিন একটা থাবার মত হাত রেখে স্কট

বললে,—"তোমার ফিগারটা "মদে"র মত উত্তেজক।" খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতে গেল জোন,—পারল না। সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ওর ইচ্ছের অন্যদিকটা কেমন যেন কৌতূহলী হয়ে উঠল,—নড়তে চাইল না। স্কট বললে,—"তোমার পাগুলি চমৎকার।"

শুনে কি করবে ভাববার আগেই স্কটের দুটো শক্ত হাত ওকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল। সেই মুহূর্তে ঈশ্বর বলে একটা বিস্মৃত নাম শৈশবের কুয়াশা ভেদ করে হঠাৎ ওর মনের সামনে ঝলসে উঠল। কিন্তু শৈশবের প্রার্থনাগুলো মনে পড়ল না,—যেগুলো মায়ের কাছে শিখেছিল ছোটবেলায়, বড় হয়ে যেগুলো নিয়ে করেছে শুধু ঠাট্টা,—দরকারের সময় তারা হারিয়ে গেল। শুধু ঐ একটি নাম মনের মধ্যে বারবার জ্বলতে লাগল,—"উদ্ধার কর, উদ্ধার কর,—হে ঈশ্বর! এত সস্তা হয়ে যেতে দিও না আমাকে। এই মুহূর্তে পাঠাও তোমার কোন এঞ্জেলকে,—আমার লুব্ধসত্তার আক্রমণ থেকে বাঁচাক এসে আমাকে।"

সেই মুহূর্তে দেবদূত এসে গেল। "টক টক টক। দরজায় 'নক' করছে দেবদূত। 'আঃ' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে জোন,—"দেখ কে এসেছে?"

"কেউ না" জোনের ঘাড়ের উপরে মুখ নামিয়ে একটা জান্তব আওয়াজ বার করলে স্কট—"কেউ না"—এক ধাক্কায় স্কটকে ঠেলে দিল জোন। "নিশ্চয়ই কেউ,—দেখ্ শিগ্‌গির। টক টক টক টক। "আঃ এঞ্জেল।" একটা অভদ্র গালাগাল উচ্চারণ করে স্কট কুকুরের মত হাঁপাতে লাগল। "ইউপ্রিগিস পিগ.—এদিকে লোভ দেখাবে, ওদিকে খেতে দেবে না? কেন এসেছিলে সকাল বেলা এই ইনকিউবিটারের মধ্যে?"

"দরজা খোল।" আদেশ করল জোন, ও ফিরে পেয়েছে নিজের শক্তি। টক টক এঞ্জেল নক করে চলেছে। "দরজা খোল!" বললে জোন। "কেন এসেছিলে আমাকে লোভ দেখাতে? জান না আমি ক্ষুধার্ত? দেখতে পাও না আমার স্ত্রী আমার কাছে আসে না? পাঁচটা সন্তানের মা না হলে, ও হয়ত এখনি আর কারো সঙ্গে চলে যেত।

টক টক টক টক। এবারের আওয়াজ আরো জোরে। "আঃ এঞ্জেল,—" দুহাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে জোন বাক্সগুলির কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

খুট করে দরজা খুলে গেল,—একহাতে একটা ডিম ভরা বাক্স নিয়ে অন্য বগলে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এঞ্জেল।

—"এতক্ষণ ধরে দরজা বন্ধ করে কি প্রেম করছিলে নাকি? মনের মানুষ পেলে কোথায়?" বাইরে থেকেই বললে ফিলিপ,—"তোমার এখানে নাকি দুজোড়া শহুরে মানুষ এসেছে? তাদের মধ্যে নাকি একজোড়া ভারতীয়? গলার স্বরটা হঠাৎ একটা বিস্মৃত মনের তারে গিয়ে বেজে উঠল জোনের। চমকে ফিরে তাকিয়ে জোন দেখলে—ফিলিপ সিডনী। এমন জায়গায় কেমন করে এল সে। আর একী রূপান্তর তার! জোনের ব্রাউন চোখ তীব্র হয়ে জ্বলতে লাগল।

ফিসফিস করে আপন মনে ও বললে,—"ফিলিপ সিডনী।" ফিলিপ চোখ সরিয়ে নিল। স্কটকে বললে,—"আজকের মধ্যেই বাচ্চাদের বেরুবার কথা ছিল?"

স্কট বললে,—"তারা বেরিয়েছে। আর ঐ দেখ শহুরে চিকেনদের একটা।"

ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসে বাচ্চাগুলো সরু উলের পম্‌পম্‌ বলের মত খুট খুট করে খেলে বেড়াচ্ছিল খোলাগুলোর মধ্যে। কিন্তু তাদের দিকে চোখ ছিল না জোনের, ওর মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে।

ছোটবেলার খেলার সাথী ফিলিপ পড়ত ওর দাদার সঙ্গে এক স্কুলে। 'সিড্‌নি'র বাপ ছিল বড়লোক। আর ও নিজে ছিল কবি। ছোটবেলা থেকে কবিতা লিখত, আর জোনের সঙ্গে প্রেম করত। আর ওর আশা ছিল একদিন বড় সায়ান্টিস্ট হবে, ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করবে, আর কবিতা লিখবে "কোলরিজে"র মত। জোনের ওকে ভালো লাগত। সঙ্গী হিসেবে ও চমৎকার, ওকে ভালোবাসা যায়, ওকে নিয়ে কল্পনা করা যায়, খেলা করাও যায়। কিন্তু! জোন যখন বড় হোল তখন ঐ 'কিন্তু'টাও সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠল। তারপরে হঠাৎ একদিন ফিলিপের বাবা বিনা নোটিশে মারা গেলেন—দেখা গেল ওদের সমস্ত সম্পত্তি ধার করা, ফাঁকা ফানুষের মত। তারা উড়ে গেল বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। তারপরে এল যুদ্ধ। তখন আর কার কথা কেই বা কাণে রাখে, তবু মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ত জোনের। সে কি বেঁচে আছে, নাকি যুদ্ধ করতে করতে মরে গেছে, পৃথিবীর কোন দূরতম প্রান্তে।

সেই ফিলিপকে হঠাৎ এই স্কটল্যাণ্ডের গণ্ডগ্রামে ডিমে 'তা' দিতে দেখবে কে জানত? ওর বগলে ক্রাচ্ দেখে হঠাৎ জোনের মনের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। যুদ্ধ করা ফিলিপ পছন্দ করত না। বলত, ওটা দেশভক্তির দোহাই দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ। তাই কি যুদ্ধ ওর উপরে প্রতিশোধ নিয়েছে।

নিজের ডিম ভরা বাক্সটা নামিয়ে রেখে, বাচ্চা ভরা অন্য বাক্সটা এক হাতে তুলে নিল ফিলিপ,—ক্রাচ বগলে করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। একটা কথা বলল না,—একবার তাকিয়েও দেখল না, জোনের দিকে। ইনকিউবিটার ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জোন দেখল, ফিলিপ বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে। ও চেঁচিয়ে ডাকল—ফিলিপ, ফিলিপ, 'ফিলিপ সিড্নী।'

ফিলিপ উত্তর দিল না, ধীরে ওর দীর্ঘ দেহ রাস্তার দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জোন বুঝতে পারল না ফিলিপ ওকে ভুলে গেছে কিনা। ফিলিপের হঠাৎ দারিদ্র্যের খবর শুনে জোন যেদিন অকারণ রূঢ়তায় তার দিকে ফিরে চায় নি, আজ কি সেদিনের শোধ দিয়ে গেল ফিলিপ।

না, সেদিন জোনের ব্যবহারে যে যন্ত্রণা ফিলিপকে অভিভূত করেছিল, আজ তার কথা আর বোধহয় ওর ভালো করে মনেও নেই। ওর সমস্ত জীবন জুড়ে যুদ্ধের প্রভাব চাপ বেঁধে রয়েছে। জীবন জিজ্ঞাসা বলে যদি কিছু থাকে, তার চরম উত্তরটা যেন ওর জানা। তাই জীবন সম্বন্ধে আর কোন ঔৎসুক্য বোধহয় বাকী নেই। কিন্তু সেদিন ছিল, যেদিন যুদ্ধের ডাক এসেছিল মুক্তির ডাকের মত। এই চেনাশোনা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে পড়বার ডাক। চিরকাল যুদ্ধের নিন্দা করত ফিলিপ, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল সব খারাপ জিনিসই হয়ত পুরোপুরি খারাপ নয়, হয়ত এরও একটা ভালো দিক আছে। ফিলিপ সেইদিনই তার কবিবন্ধু প্যাট্রিক পীয়ারসনের কাছে ছুটে গিয়েছিল,—তার সেই ভারতীয় বইটা ধার করে আনতে, বইটার কি অদ্ভুত নাম,—Song of God.

কিন্তু বইটা আগাগোড়া পড়েও কিছু বোঝেনি ফিলিপ। **non attachment** মানে কী? আর তাই হলেই সব হোল,—না হলে কিছু নয়, বড় মজা তো, নিরাসক্ত হলেই আর হত্যায় পাপ নেই, শুধু মাত্র আসক্তিই অপরাধ, কাজটা নয়, একী অদ্ভুত অন্যায়। যে ঈশ্বর বলেছেন প্রতিবেশীকে ভালোবাসো,—তিনিই কি বলতে পারেন, প্রতিবেশীকে মারো।—কিছু

বুঝে উঠতে পারেনি সেদিন ফিলিপ, প্যাট্রিকও যে বুঝেছে তা ওর মনে হয় নি, তবু প্যাট্রিক তার কবিতায় গীতা উদ্ধৃত করে এলিয়েটের মত। কবিতার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের উল্লেখ আজকাল একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু ফিলিপ জানতে চায়, আসক্তি মানেটা ঠিক কী? 'অর্থাৎ', প্যাট্রিক বলেছিল,—"কাজের মধ্যে তোমার মনটা ঢুকিয়ো না।"

—"কিন্তু মন না থাকলে, ন্যায়ই বা কী আর অন্যায়ই বা কোথায়? পাপপুণ্য সবেরই তো জন্ম এই মনে। ফিলিপ সেদিন বলেছিল,—আজো বলে,—তাহলে পশুও তো নিরাসক্ত। পশুরও তো মনের বালাই প্রায় নেই বললেও চলে।"

"কে জানে মনের কত স্তর কত ভেদ,—কে জানে পশুরা কে কতটুকু মনের অধিকারী। তবে তাদের আসক্তি নেই এটা বোল না। তাদের তো শুধু আসক্তিই আছে। ক্ষুধার আসক্তি,—কামের আসক্তি। আসক্তির অন্ধ আকর্ষণেই তো তারা খায় দায় প্রজনন করে। এ জগতে টিকে থাকবার ঐ একটিমাত্র উপায়ই তাদের জানা আছে।"

'বটে'! ফিলিপ বলেছিল,—"কিন্তু মানুষেরও কি তাই নয়? মানুষও কি আসক্তির টানেই বাঁচছে না? আমার বাড়ী,—আমার ধনসম্পত্তি। আমার আত্মীয়-স্বজন,—এই আমার আমিত্বই তো সবচেয়ে বড় আসক্তি। এরই টানে তো বেঁচে থাকা।"

—"কিন্তু আজকের দিনে কি এই ব্যাপার নিয়েই পরীক্ষা চলছে না। কম্যুনিজম্ কি সেই কথাই বলছে না,—যে,—না, তোমার বাড়ী নয় ঘর নয়,—ধনসম্পত্তি কিছুই তোমার নেই, সমস্তই সকলের। সেই সমস্তেরই তুমিও একটা অংশমাত্র,—a part of the whole। এ বইটা আরো বেশী দূর যাচ্ছে—বলছে শুধু ধন জন নয়,—শুধু বাড়ীঘর নয়। তোমার প্রিয় পরিজন। তোমার সুখ, দুখ, ভালো মন্দ, তোমার পুণ্য, পাপ, স্নেহ ভালোবাসা, কিছুই তোমার নয়,—সমস্তই আমার। সমস্তই আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কাজেই মিথ্যা তোমার অভিমান! মিথ্যা সংশয়ে তোমার এই আত্মগ্লানি।

—"তার মানে? সবই ঈশ্বরের?—এমন কি পাপও?" তাহলে তিনি all perfect নন? "কি জানি দোষশূন্য বলতে কি বোঝায়? তবে তিনি

পূর্ণতম, সবই তাঁর মধ্যে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর একাদশ অধ্যায়ে নাকি তার অদ্ভুত বর্ণনা আছে। আর তার original সংস্কৃত সুর নাকি শুনতে অদ্ভুত। যদি যুদ্ধে ভারতে যাবার সুযোগ পাই তো, শুনে আসব। আশ্চর্য না? ঈশ্বর বলছেন,—সবই তাঁর মধ্যে একসঙ্গে রয়েছে,—সব দেশ, সব কাল, সব জ্ঞান, সব কর্ম। অর্থাৎ এই যে তুমি ফিলিপ সিড্‌নী। আজ জোন ডারলিং-এর নাক ফেরানোর ধাক্কায় পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে পালাতে চাইছ—আর যে তুমি এই সেদিনো তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে। যে তুমি শিশুকালে একদিন মায়ের কোলে জন্মেছিলে,—যে তুমি একদিন জন্মাও নি,—আর যে তুমি হয়ত আবার কারো প্রেমে পড়বে শীগ্‌গিরই—কিম্বা হয়ত যুদ্ধে আহত হবে,—আর যে তুমি একদিন মরে যাবে,—কবরের মধ্যে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাবে যে তোমার দেহ,—সেই সমস্ত বিশেষ অস্তিত্বের জ্ঞান একটা পূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। মানুষের জ্ঞান নেহাৎই সীমাবদ্ধ বলে এ বিশ্বের সেই পূর্ণরূপ সে দেখতে পায় না। তাকে দেশে কালে বিচ্ছিন্ন করে, মুহূর্তে মুহূর্তে খণ্ডিত করে দেখে,—ত্রিকালের ধাপে ধাপে ভাগ করে দেখে।"

—"এ কী, এ যে আইনস্টাইনের কথা বলছ? ফিলিপ হেসেছিল—দেশ কালের আপেক্ষিকতা। গীতার সঙ্গে এর কোন যোগ আছে কী?"

—"কে জানে,—যদি আপেক্ষিকতা সত্য হয়, যোগ থাকতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের থিয়োরী, আইনস্টাইন প্রমাণ করছেন মাত্র।" শুনে ফিলিপ হেসেছিলো। কিন্তু আজ আর হাসে না। মৃত্যুও তো জীবনের মতই সত্য, তবে কোনটা ফাঁকি আর কোনটা খাঁটি কে বলবে?—প্যাট্রিকের কথা আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে। কি আশ্চর্য সত্য ছিলো ওর মন। আর কি অজস্র বান্ধবী ছিল তার; আর কি প্রচণ্ডভাবেই না ও তাদের ভালোবাসত। আর কবিতা লিখত তাদের প্রত্যেকের অনুভবের বৈচিত্র নিয়ে। তবু তেমন নাম করতে পারল না প্যাট্রিক। সুরুতেই যে মরে গেল। যে ভারতের প্রতি তার এত টান,—তারই সমুদ্রে সে মরেছে। সৈন্যভরা জাহাজে সে ডুবে গেছে ভারত সমুদ্রে,—জাপানী সাবমেরিনের আক্রমণে। সে নেই,—নাকি কোথাও আছে, কোন পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে, অন্তত এই মুহূর্তে সে আছে। তার সেই কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি সমেত তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব এই মুহূর্তে ওর

মনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মানস থাকা আর ওই বাস্তব না থাকার মধ্যে কোনটা সত্যি কে জানে, ভাবতে পারে না ফিলিপ। আজও পারে না, সেদিনো পারে নি। তবু ও ভারতেই গিয়েছিল। যখন ওকে ওরা choice দিয়েছিল, কোথায় তুমি প্রথম যেতে চাও? ভেবে দেখার আগেই ওর মুখ থেকে বেরিয়েছিল,—East, পূর্বদিকে। যুদ্ধ করতে ফ্রান্সে যাবার কোন মানে হয় না, যেখানে লোকে আমোদ করতেই যায়। যেতে হয় তো East,—East মানেই পৃথিবী। অজানা, অচেনা অরণ্যের মত রহস্যময় পৃথিবী। সেই পৃথিবীর ডাক শুনেছিল ফিলিপ। গিয়েছিলো তার কাছে, অবশ্য দাম দিতে হয়েছে, একখানা পা। কিন্তু যা পেয়েছে সে অভিজ্ঞতার মূল্য হিসেবে এ দামটাও যেন তেমন কিছু নয়।

সেদিন দুপুরটা ওরা যেমন তেমন করে কাটিয়ে দিল, কখনো তাস খেলে, কখনো গল্প করে। কখনো ঘাসের উপরে বিছানো কম্বলের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে, বয়ে গেল দিন। সন্ধ্যে হতেই শ্রীমতী স্কট ওদের ধরল 'পাবে' নিয়ে যাবে। গাঁয়ের 'পাব' দেখবার সখ কৃষ্ণার ছিল। চলতে চলতে, কুমার বললে, আমি কিন্তু পাঁচ মিনিট থেকেই চলে আসব। কৃষ্ণা কটাক্ষে কুমারের দিকে চেয়ে বললে,—'আমিও'। এডমণ্ড বললে,—"আমি কিন্তু বেশ কিছুটা পান করে আসব। অনেকদিন ধরে তরলতার অভাবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।" জোন বললে,—"তোমার প্রতিবেশী ফিলিপ সিড্‌নীকেও নিয়ে চল না, ওর কাছে নানা দেশের গল্প শোনা যাবে।" বিলি স্কট বললে, —"আমারও তাই ইচ্ছে আছে। কিন্তু কে জানে ও আসবে কিনা। ওর স্বভাবটা কেমন যেন পাগলাটে। বড় লোকের ছেলে, পাব্লিক স্কুলে পড়ে মানুষ হয়েছে। এখন সর্বস্ব খুইয়ে পিসীর জমিদারী দেখাশোনা করছে। একজন লোক নিয়ে নিজেই সব করে। পিসী তো থাকে লণ্ডনে, মেয়ে জামাইয়ের কাছে। সেখানে জামাই খুব বড় ডাক্তার, মেয়েও নার্সিং পাশ। তা পিসী কতবার ওকে জমির খানিকটা দান করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ফিলিপ নেয়নি, আমি জানি। ওর কিছু দরকার নেই, টাকা পয়সাতো নয়ই, এমন কি স্নেহ ভালোবাসাও নয়।"

অবাক হয়ে জোন ভাবে কেন এমন হয়েছে ওর। ততক্ষণে ফিলিপের বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ওদের দলটার

দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে ফিলিপ বললে,—"আমি যাব না, তোমরা যাও। গিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।" বলতে বলতে হঠাৎ কৃষ্ণার বড় বড় চোখের কৌতূহলী দৃষ্টির সঙ্গে আটকে গেল ওর দৃষ্টি। হঠাৎ যেন চমকে উঠল,—তারপরে ধীরে ধীরে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "তুমি ভারতীয় মেয়ে?" "অবশ্যই", ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল কৃষ্ণা। "তুমি লণ্ডনে গিয়েছ?" "হ্যাঁ", আবার মাথা নাড়ল কৃষ্ণা। "সেখানে একটি ছোট্ট ছেলেকে দেখেছি, ঠিক তোমার মত দেখতে।" "ছোট ছেলে—ও পার্থ। তাকে চেন তুমি। কি আশ্চর্য! কেমন করে?" কুমার বললে,—"পৃথিবীটা ছোট বলে।" ফিলিপ বললে,—"সে একদিন পড়ে গিয়ে হাতে চোট লাগিয়েছিল, তাই তার মা তাকে নিয়ে এসেছিল আমার ডাক্তার কাজিনের বাড়ীতে—তার পরে প্রায়ই বাড়ীতে আসত এটা-ওটা দেখাতে। একদিন ওয়েটিংরুমে ওর সঙ্গে দেখা হোল, দশমিনিটের মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। লণ্ডনে যে ক'দিন ছিলাম, ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা না বলে এসে থাকতে পারতাম না। অদ্ভুত ছেলে, সত্যি।" ফিলিপ মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে,—"অদ্ভুত ছেলে!" জোন দেখল,—ফিলিপ ওর সঙ্গে একটা কথাও বললে না। অথচ চিনতে যে পেরেছে সে বিষয়ে ওর সন্দেহ নেই। ওকি এই আট বছর ধরে ওর উপরে রেগে আছে নাকি। হঠাৎ জোন হেসে উঠল ড্র্যামাটিক ভাবে,—বিদ্রূপের হাসি। ওর এ হাসি কৃষ্ণার ভালো লাগে না,—বড় মেকি মেলোড্র্যামাটিক মনে হয়। ও কেন সিনেমার নকল করে হাসে? নিজের আনন্দে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে হাসে না কেন? জোনের হাসি শুনে ফিরে তাকাল ফিলিপ। সেই সুযোগে বিলি স্কট ওকে ডাকলে,—"যেতে যেতে গল্প হবে, এখন চল ফিলিপ, আমাদের সঙ্গে পাবে চল।"

—"আমি যাব না", ফিলিপ রেগে বললে,—তোমার ঐ প্রকাণ্ড স্বামীটিকে ধরে নিয়ে যাও, তোমার মাতলামীর সঙ্গী হতে। কিম্বা আরো অনেককেই পাবে, কিছু পয়সা দিলে, যে তোমার সঙ্গে ফুর্তি করবে। আমি নয়।"

বিলি বললে,—"ওঃ ফিলিপ"!

ফিলিপ বললে—"ওঃ সাটআপ্। কচ্ কচ্ কোর না।" ফিলিপ ঘরের মধ্যে চলে গেল,—ছোট্ট দলটা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। বিলি

বললে,—"ও যাবে না আমাদের সঙ্গে। এখন ঘরে বসে বসে সাইডার খাবে,—আর বোধহয় লিখবে।"

সেদিনো রাতে মাতাল-করা চাঁদ উঠলো,—ফুলের বনে গান জাগিয়ে বাতাস ছুটলো মর্মর করে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়,—দেখতে দেখতে কুয়াসা আর পাতলা মেঘ চাঁদকে ঢেকে ঢেকে ভেসে চলল,—ঝিরঝিরে বৃষ্টি বার বার মুছে দিল মোহাবেশ। 'পাবে' ওরা যেন টিঁকতে পারছিল না,—মদ, আর অনেক মানুষের ঘাম ও নিঃশ্বাসের গন্ধে ওদের নাকে প্রাণ যেন রুদ্ধ হয়ে এল।

শুধু বিলি বসে রইল দুইহাতের মধ্যে মাথা দিয়ে,—পাবের অনেকেই ওকে চেনে,—তারা বললে,—"বিলি রোজ আসে না বটে,—যেদিন আসে, সেদিন মাতাল না হয়ে যায় না। যদি ওর কর্ত্তা ওকে নিতে না আসে, আমরাই কেউ পৌছে দেব এখন,—নয়ত এইখানে বসে বসেই ও আনায়াসে রাত কাটিয়ে দিতে পারে। তবু কুমার বললে,—"ওকে নিয়ে যাওয়াই উচিত। একসঙ্গে এসে, এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না"। তখন 'মিসেস স্কট্, মিসেস স্কট্' বলে এড ওর কাণের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে লাগল। জোন উঠে দাঁড়িয়েছিল,—বললে, "আমি আর একমিনিটও এখানে থাকতে পারব না। এখানের বিষাক্ত বাতাস আমাকে নরকের মত ঘিরে ধরেছে। কিছুক্ষণ স্বর্গে ঘুরে না এলে আমার চলবে না।" কৃষ্ণার মনে হোল,—ওরও বোধহয় জোনের সঙ্গেই যাওয়া উচিত ছিল,—কিন্তু কুমারকে একটু ক্ষণের জন্যেও ছেড়ে যেতে ওর মন সরছে না। হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে, ওকে ছাড়া কোন কিছুরই কোন অর্থ নেই। হঠাৎ এমন হোল কেন, কৃষ্ণা ভাবে। অনেকদিন ধরেই তো কুমারকে মনে মনে ভালোবাসে ও,—আজ শুধু একটু খানি মুখের কথায়, কোথায় কি এমন অদল বদল হয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, বিশ্বজোড়া একটা প্রচণ্ড টান প্রতি বস্তুকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করছে। সেই মুহূর্তে জোনের অস্তিত্বের মূলে অদৃশ্য বস্তুসংঘাতের বিপুল আকর্ষণ অনুভব করল সে। সেই টানের বেগে, ও হাঁটতে পারল না,—ছুটে চলল।

এদিকে এরা দুজনে শ্রীমতী স্কটকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিল। দুজনের দু কাঁধে তার দুহাত ঝুলিয়ে দিয়ে, প্রায় ওকে টেনে নিয়ে চলল। পিছন

পিছন একা চলল কৃষ্ণা। এড আর কুমার দুজনেই ওকে এগিয়ে যেতে বললো,—কিন্তু কৃষ্ণা শুনল না। চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে চলল। চাঁদে আর ছায়ায় মেঘে আর কুয়াশায় আবছা আলোয় তিনটি মানবমূর্তি একসঙ্গে জড়াজড়ি করে চলেছে। পথের ধারের বিদ্যুৎদীপের আলোয় তাদের অন্ধকার ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। শ্রীমতী স্কটের পুতুল পুতুল চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না। ও চলতে চলতে জড়িত কণ্ঠে অনুনয় করছে,—"বাড়ী নিও না আমাকে। নিয়ে যেও না সেই অর্ধউন্মাদ মানুষটার কাছে,—শুনবে না?—শুনবে না?—you pigs—

অথচ এই মেয়েই সকালবেলা কেমন হেসে খেলে সংসার করছিল,—কৃষ্ণা ভাবে,—ছেলেমেয়েরাও বাধ্য সুন্দর। কেমন চমৎকার ঘর বাড়ী বাগান। এত ক্ষেত, এত পশু, গরু শুয়োর, কুকুর; এত পাখী,—হাঁস মুর্গী টার্কি,—প্রকৃতির এত রূপ চারিদিকে। তবু কেন এত অভাব অন্তরে? এত তৃষ্ণা? হঠাৎ বিলি চেঁচিয়ে ওঠে। "এই থামো, এইদিকে চল,—ফিলিপের বাড়ী,—ও কোন সাহসে আমায় অপমান করে। আমি ওকে চাকর রাখতে পারি; জানো,—চাকর রাখতে পারি। ওর কি আছে?—আমার স্বামী ওর চেয়ে ঢের ঢের বড়লোক।" কৃষ্ণার শরীরে শির শির করে ওঠে সাপের মত অনুভূতি। সমস্ত দৃশ্যটা অত্যন্ত অশ্লীল মনে হয়। কালকের সঙ্গে আজকের কি অদ্ভুত তফাৎ। আজকের এরা ত কখনোই আর কালকের সে রাতে ফিরে যেতে পারবে না। সেই আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্নভরা রাত; সে রাতেও বেদনা ছিল, কান্না ছিল,—কিন্তু সে ভরামনের কান্না। আজ যদি কৃষ্ণা কাঁদে, তবে ক্ষোভে আর শোকে কাঁদবে,—বিকৃত বাসনার ক্ষোভ। আর সৌন্দর্যের মৃত্যুর শোক।

—"কৃষ্ণা, এস, এস, একটু হাত লাগাও!" কুমারের গলায় প্রার্থীর আকিঞ্চন। ওরা ততক্ষণে খোলা গেট দিয়ে উঠোনের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কৃষ্ণা তাকিয়ে দেখল বিলি স্কট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে,—কুমারের কাঁধের উপরে ঢলে পড়েছে তার মাথা; রীতিমতো নাক ডাকছে তার। এমন দৃশ্য কৃষ্ণা কখনো কল্পনাতেও দেখেনি। ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। অনভ্যস্ত হাতে টানাটানি করতে করতে চেঁচিয়ে ডাকল,—"মিসেস স্কট, মিসেস স্কট।"

দরজার বাইরে মুখ বার করে স্কট বললে,—"ব্যাপার কী?" "শীগ্‌গির এস", এড গর্জে উঠল,—"তোমার বউয়ের ভার নাও।"

"ওঃ নরক!" বলে স্কট ভিতরে মুখ সরিয়ে নেবার আগেই এড কুমারের উপরে শ্রীমতী স্কটকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে স্কটকে টেনে আনল। বিড়বিড় করে শপথ করতে করতে স্কট এগিয়ে এল, এড আর স্কট ওকে চ্যাংদোলা করে ভিতরে নিয়ে চলল।

কুমার হাঁপ ছেড়ে বললে—"বাঁচলাম!" তারপরে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে নেহাত আপন জনের মতো কৃষ্ণার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল,— "উঃ কি বিপদেই পড়া গিয়েছিলো!" এক মুহূর্তে কৃষ্ণার মন থেকে স্তূপীকৃত অবসাদ হাল্কা হাওয়ার মত উড়ে গেল,—ও হেসে বলল,—"ঈস, ভারী বিপদ! তাই সেধে ঘাড়ে নিয়েছিলে?"

'উঃ হো হো', কুমার হাসলো,—"ঘাড়ে নেয়াই বটে, দেখ তো ঘাড়টা কিরকম লাল হয়ে উঠেছে।" ও নীচু হয়ে কৃষ্ণার মুখের কাছে ওর কাঁধটা নামিয়ে আনল,—"সত্যি, কিরকম অস্বস্তি হচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও লক্ষীটি।"

"পাগল নাকি!" কৃষ্ণা নিজেও লাল হয়ে হাসতে লাগল, "কিছু হয়নি বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

"হয়েছে, হয়েছে,—তোমার চোখ নেই, তুমি নেহাত কানা! দাও সত্যি!" কৃষ্ণার দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা একটু উঠতে না উঠতেই, কুমার সেটা ধরে নিজের গলার পাশে কোটের প্রান্তে বুলিয়ে নিল। আঃ এতক্ষণে একটু কমল টনটনে ব্যথাটা।" কৃষ্ণা বলল,—"আহা, সব বাজে কথা,—বেশ তো enjoy করছিলে—"

—"আর যাই কর রুচিহীনতার দোষ দিতে পারবে না।" কুমারের চোখ থেকে নূতন প্রণয়ের হাসি কৃষ্ণার চোখের তারায় ঝিকমিক করে উঠল। কৃষ্ণা বুঝল কুমার ওকে ভালোবেসেছে। "রুচিহীনতার দোষ দিতে পারবে না, তোমায় যখন পছন্দ করেছি।"

—"ওকি, তুমি আবার কখন আমায় পছন্দ করলে? তুমি তো আমায় নাকচ করে দিয়েছিলে। আমি তো তোমায় পছন্দ করে কিনে নিলাম।"

—"কি দিয়ে কিনলে কৃষ্ণা?"

"With frailty & pride. চপলতা আর অভিমান। এমন কিছু ভাল জিনিস দিয়ে কিনিনি,—সস্তায় সেরেছি।"

—"অত সস্তায় হবে না, দাম দিতে হবে!" কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে এল কুমার।

—"এখন ভিতরে চল,—অভদ্রতা হচ্ছে!" ব্যস্ততার ভান করল কৃষ্ণা,—"এডকে সাহায্য করা উচিত।"

—"না", কুমার বললে,—"দামের কথা যখন উঠেছে, হাতে হাতে আদায় না করে যাব না।"

—"না, না", কৃষ্ণা মুখে হাত চাপা দিল।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ", কুমার ওর হাত খুলে নিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুখের মত শিউরে শিউরে ওদের মাথার উপরে ঝরে পড়ল। সেই ফুলের বনে আর যাওয়া হোল না। সেই ঝরণা দূর থেকে ওদের প্রতীক্ষায় বয়ে গেল। প্রতিজ্ঞার কথা মুখে আর বলা হোল না। তার ভাষা মনে মনে রং ছড়ালো।

বিলি স্কটকে বিছানায় শুইয়ে দিতে রীতিমতো বেগ পেতে হোল। তারপরে ওকে তার স্বামী কন্যার হাতে ছেড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এডমণ্ড। ঝিরঝিরে কুয়াশার ভিতর দিয়ে স্তিমিত হয়ে আসা চাঁদের আলোয় কৃষ্ণা কুমারের মিলন দৃশ্য দেখল সে।

—"কই, এবেলা তো কৃষ্ণা কাঁদল না, সব মেয়েই সমান,—" মনে মনে শপথ করল এডমণ্ড,—"শুধু ভারতীয় মেয়েরা একটু বেশী ন্যাকা।"

ফিসফিস করে কৃষ্ণা বললে 'চল'। ধীরে মুখ সরিয়ে নিয়ে কুমার বললে,—'চল'। মুখ তুলতেই এডমণ্ডের ঘৃণা ও ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টি দেখতে পেল কৃষ্ণা। সঙ্গে সঙ্গে যেন মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল।

—"ওঃ, এবেলা তো কৃষ্ণার আপত্তি নেই! একফোঁটা চোখের জলও তো দেখলাম না,—প্রেমেরও জাতবিচার! একেবারে বিশুদ্ধ ভারতীয় হওয়া চাই!"

"সত্যি এড", কুমার তাড়াতাড়ি বলল,—"আমরা নেহাত সেকেলে। আমাদের দেশে জাতগোত্র মিলিয়ে শুধু বিয়ে হয় মাত্র,—আমরা প্রেমও করেছি জাত মিলিয়ে", কুমার হেসে উঠল,—"সত্যি এড, জানো, কৃষ্ণা আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।" "বাজে কথা," কৃষ্ণা হেসে ওঠে,

"বিশ্বাস কোর না এডমণ্ড, আমি বরাবরই ওকে বিয়ে করতে রাজী ছিলাম, আজ ও আমার স্বামীর post-টা নিতে রাজী হয়েছে মাত্র।"

—"ওঃ তুমিই প্রপোজ করলে তবে? ভারতে বুঝি মেয়েরাই প্রপোজ করে?"

কৃষ্ণা বললে, "প্রস্তাব যেই করুক, মেয়েরাই সব দেশে প্রথম আহ্বান-কারিণী।"

থ্যাবড়া পাহাড়ের বাঁকটা পেরিয়েই ফিলিপ সিডনির বাড়ী। গেটের কাছে এসে জোন একটু দাঁড়াল,—একবার ভাবলো, ফিরে যাই চলে, কিন্তু যাওয়া হোল না। ফিলিপ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিলিপ বললে, "ও জোন! ভিতরে এস!" ফিলিপ এগিয়ে এল,—যেন এতক্ষণ জোনের অপেক্ষায় ও দাঁড়িয়ে ছিল। জোন ভেবেছিল, ফিলিপ হয়ত ওকে গেট থেকেই বিদায় করে দেবে। তার বদলে এমন শান্ত গলার আহ্বান। ওর হঠাৎ যেন মন কেমন করে উঠল। যেন বহুদিনের কি একটা ভুলে-যাওয়া জিনিসের কথা মনে পড়ে গেল। ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফিলিপ বললে, "একটু সাইডার খাবে?"

"না ধন্যবাদ,"—জোন হাসল।

"আচ্ছা তাহলে, এককাপ কফি কি একটু অন্য কিছু?" "না না,"—জোন বললে,—"দিতেই যদি চাও তো আমাকে এক গেলাস জল দাও।" জল এনে দিল ফিলিপ, জোন তাকিয়ে দেখল, ফিলিপের ঘরটা কি অদ্ভুত! ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড সেকেলে উনুন। তার ভিতর দিয়ে চিমনী উঠে গেছে। মেঝেতে কার্পেটের উপরে একটা বাঘছাল পাতা। বাঘছালটা দেখে চিনতে পারল জোন, ওটা ফিলিপের বাবার। আর দেয়াল-জোড়া লম্বা তাকে অজস্র ভারতীয় জিনিস। টিবেটান কিউরিও, কাশ্মীরি আর নেপালী মূর্তি, একপাশে একটা ছোট রাইটিং টেবিল। তার উপরে খোলা খাতার পাশে বন্ধ কলম দেখে মনে হয়, এখুনি কেউ লিখতে লিখতে উঠে গেছে। "এত কম আলোয় লেখ কি করে?" বলতে বলতে মুখ তুলে জোন দেখল, ফিলিপ চিমনীর অল্প অল্প আগুনের জ্বলন্ত কয়লার

দিকে তাকিয়ে আছে। তাক জোড়া অদ্ভুত সব মূর্তির লম্বা ছায়া, আর বাঘছালের উপরে দাঁড়ানো ঐ মানুষ, সবটা মিলিয়ে জায়গাটা যেন রহস্যময় করে তুলেছে।

জোন বললে, "ফিলিপ, এ ঘর কি তোমাদের ভারতের replica নাকি?" ফিলিপ হাসল, উদাস মতন কিরকম যেন হাসি, ফিলিপ বললে, "ভারতের প্রায় সবপ্রদেশেরই কিছু-না-কিছু জিনিস আছে। তবু একে ঠিক ভারতের replica বলা চলে না। কারণ ভারতে ঠিক এধরনের আবহাওয়া প্রায় কখনোই হয় না। ওদেশে যেটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ওদের উজ্জ্বলতা। প্রখর সূর্যের আলোয় সমস্তই যেন সর্বক্ষণ ঝলমল করছে। আবার যখন বর্ষা হয় তখন সে আর এক রূপ। কালো আলো যার নাম! আমি দেখেছি সে বর্ষা! দীর্ঘ গ্রীষ্মের পরে নরম নরম কালো মেঘে আকাশ ঘিরে ধরে, তারপরে নেমে পড়ে, ঝর্ঝর ঝর্ঝর!

—খুব সুন্দর বুঝি?

—সুন্দর? কি জানি। হয়ত, হয়ত নয়, শুধু এটুকু বলতে পারি যে, বিপুল তার বিস্তার, গভীর তার অনুভব। আর যখন দারুণ গ্রীষ্মে কাঠ ফাটে, পীচ গলে যায় রাস্তায়, আর দর দর করে ঘাম বইতে বইতে প্রায় উলঙ্গ মানুষগুলি গরুর গাড়ী চালায়, কিংবা রিক্‌শা টানে, কিম্বা ঠেলা বয়। আর ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে পথের দুধারে বাড়ীগুলি ঝামরে থাকে,—গাছগুলির পাতা পড়ে ঝুলে,—কুকুরের ঝুলে পড়া জিভের মত। ওঃ—সে একটা দৃশ্য বটে, ছবি আঁকার বিষয়, একেবারে আধুনিক যুগের ছবি, যাকে অনেক সময় কুৎসিত বলে ভ্রম হয়।"

—জোন চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ মনে হোল,—ফিলিপকে ও বোধহয় ভালোই বাসত এককালে। আর তাকে পায়নি বলেই জীবনটা ওর হয়ত এত অশান্ত হয়ে উঠেছে।

ফিলিপ বললে,—"তাছাড়া আমি দেখেছি, ওদের বিয়াল্লিশ সনের দুর্ভিক্ষ। সে দুর্দশার কাছে যুদ্ধ কিছু নয়। যুদ্ধে তো জ্যান্ত মানুষ মারা পড়ে। আর সেখানে দেখেছিলুম মরা মানুষরা হাটছে। চোখের সামনে দিয়ে চলেছে যত মৃত মানুষের মিছিল। কোন্ অতল গহ্বর থেকে মানুষের অন্তরাত্মা কাঁদছে মুক্তির জন্যে নয়,—ভাত সেদ্ধ করে যে জলটা ওরা ফেলে দেয় সেই

জলটুকুর জন্যে। প্যাট্রিক বলেছিল,—ওদেশে নাকি এককালে ঈশ্বরের বাস ছিল। আমি তো দেখলুম, ঈশ্বরের অভিশাপে ওদেশে আজ মানুষও বেশী বেঁচে নেই।"

জোনের মনে হোল, ফিলিপ বড় বেশী সিনিক্যাল হয়ে গেছে, এমন তো ও আগে ছিল না, এ সেই পুব দেশের যাদু। মৃদুস্বরে জোন ডাকলে—"ফিলিপ"!

—"কী ?"

—কী ? তাতো জানে না, কেন ডাকল কি বলতে,—কে জানে। কিন্তু কিছুতো জানতে হবে,—কিছুতো বলতে হবে। তাই জোন বললে—"আমাকে একটু পৌছে দেবে ?"

"নিশ্চয়,—চল।" জোনের ইচ্ছে হোল কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলে আচ্ছা, থাক, আর একটু বসি। কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারল না। হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মনে হোল বলে,—"কাল ভোরেই তো চলে যাচ্ছি,—আবার কি দেখা হবে!" কিন্তু সেকথা উচ্চারণ করতে কেমন যেন লজ্জা করল হঠাৎ। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ফিলিপ,—"দুঃখিত জোন, পৌছুতে পারব না।"

"পারবে না ?" বিস্মিত গলায় জোন বললে,—"কেন ?"

—"এই মুহূর্তে, আমার অসংখ্য কাজ আছে, ভুলে গিয়েছিলাম।"

—"কি কাজ ?"

—"আমার একটা চ্যাপ্টার প্রায় হয়ে এসেছে, সেটা আজ রাতেই শেষ করতে হবে।"

—"আজকেই শেষ করতে হবে, এমন কোন কথা আছে কী ?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকেই। নইলে হবে না। আজকের কথা আর কালকে মনে থাকবে না,—আবার নতুন করে ভাবতে হবে।"

—"কি লিখেছ তুমি ? উপন্যাস ?"

—"হ্যাঁ, উপন্যাস নইলে মনের কথা তেমন করে বলা যায় না, প্রবন্ধ বড় ভারী হয়ে ওঠে।"

—"ভিতরের গল্পটা কি শুনি ? মানে এই মোটা কাঠামোটা।"

—"গল্প কিছু নেই।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ, এই যা দেখছ তাই, শুধু ভেসে যাওয়া, শুধু চলে যাওয়া, শুধু প্রবাহ। মাঝে মাঝে যদিও ঘাট বাঁধা আছে, কিন্তু আমার গল্প সে ঘাটের চারপাশে চক্রাকারে ঘোরে না। সে বয়ে চলে জীবনের স্রোতের মত, নদীর ধারার মত।"

"ফিলিপ, তুমি বড় বেশী দার্শনিক হয়ে উঠেছ। সত্যি, East তোমাকে গ্রাস করেছে।"

"ক্ষতি কি," ফিলিপ হেসে ওঠে, "করুক না গ্রাস। West যে এতকাল ধরে East-কে চিবিয়ে খাচ্ছে?"

—"উপমাটা কি ঠিক হোল?" জোন হাসল, West যদি East-কে গ্রাস করে থাকে সে তো শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে।

—"মোটেই না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রিক সব দিক থেকেই। আত্মাটাও বাকি আছে কিনা কে জানে।"

তখন চাঁদ মুছে দিয়ে মেঘেরা বৃষ্টি ঝরাচ্ছিল। আর থেকে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস শিউরে উঠছিল। দরজার এদিকে ঘরের মধ্যে চাপা হাওয়া অসংখ্য অপরিচিত জিনিসের মধ্যে বন্দী হয়ে গুমট হয়ে উঠেছে। তার উপরে টেবিলে রাখা ফিলিপের পাইপ থেকে কড়া তামাকের চড়া গন্ধ আসছে। দরজার ওদিকে মেদুর আকাশে স্বাধীন বাতাসের করুণ সুর। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিলিপ বললে,—"আমি ভারতবর্ষকে দেখেছি। অবশ্য দাম দিতে হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে দুঃখ করি না। তার বহু বিচিত্ররূপের অনেকখানিই ভাগ্যক্রমে আমার দেখা হয়ে গেছে।"

—"দেখে কি বুঝলে?"

—"সেই কথাই তো এই বইতে লিখবার চেষ্টা করছি। এ পর্যন্ত ভারতের বিষয়ে যত বই লেখা হয়েছে, প্রায় সবেতেই ভারতের উপরে একটা অবজ্ঞার কটাক্ষপাত আছে। অবশ্য তার কারণও ভারত নিজেই দিয়েছে। ভারতে ঢুকেই সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে তার ত্রুটিগুলো। ওগুলো যেন ওরা একেবারে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।"

—"ইচ্ছে করে যে সাজিয়েছে, তা নাও হতে পারে। সবটাই হয়ত ত্রুটিতে ভরে গেছে। তা বাছবে কী?"

—"তা হতে পারে। সবটাই এলো-মেলো, অযত্নে আগাছায় ভরা। সেই জঞ্জালের ভিতর থেকে সত্যি ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। হিমালয়ের গভীর অরণ্যের অজস্র গাছ-গাছড়ার মধ্যে থেকে ক্বচিৎ কখনো, যেমন দু একটি দুর্লভ তরুলতার সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি আমিও দু একটি এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের মধ্যে, মনে হয় যেন প্রতিফলিত হচ্ছে ভারতের অন্তরাত্মা।"

জোন অবাক হয়ে দু' চোখ বিস্ফারিত করে ফিলিপের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে ফিলিপের মুখ এতক্ষণ পরে কেমন যেন কোমল হয়ে এল। বললে—"কী দেখছ?"

—"তোমাকে—"

—"কেন?"

—"তুমি বদলে গেছ। তুমি একেবারে নতুন হয়ে গেছ। তোমাকে যেন প্রায় চেনা যাচ্ছে না।"

—"নাই বা চিনলে।" ফিলিপ হাসল। "মানুষকে চেনা কি এতই সহজ।"

—"তবু।"

—"তবু কি?"

—"তবু বল।"

—"কি?"

—"বল তুমি ভারতে কি দেখেছ?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, ফিলিপ বললে, "সে গল্প আমার বই থেকে পোড়ো,—" আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলিপের চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েক বছর আগেকার একটা ছবি। একদিন রাতে ওরা একদল সৈন্য ছুটি নিয়েছিলো দেশী আমোদে যোগ দেবে বলে। দালালরা সর্বদাই খবর রাখত কোন্ রেজিমেণ্টের কবে ছুটি পাওনা। সেদিন ওদের নিয়ে যাবে বলেছিলো বিখ্যাত এক বাইজীর আসরে। সেখানে শুধু গান নয়, খোলের সঙ্গে ঘুঙুর পায়ে নাচনেওয়ালীরা নাচবে। এমনি এক নাচনেওয়ালীর কিশোরী মেয়ে সতরো বছরের চুনীয়াকে ভালোবেসেছিলো কিনা, মাঝে মাঝে আজো ভাবতে চেষ্টা করে ফিলিপ। কিন্তু এখন তার কথা মনে পড়ল না ওর। এই মুহূর্তে ওর

চোখের সামনে ভেসে উঠল গঙ্গা। নৌকো ভাড়া করে দালালরা ওদের নিয়ে যাচ্ছিল নাচের আসরে। অমনি এই সুযোগে গঙ্গাতীরবর্তিনী দীপ-সজ্জিতা বারাণসীকেও দেখান হবে। নৌকা করে ধীরে ধীরে ভেসে যেতে যেতে সেই পাষাণগাঁথা নগরীর দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ফিলিপকে ঘিরে ধরেছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। সারাদিন অসহ্য গরমের পরে সন্ধ্যেবেলা গুমটটা যেন একটু কমেছিল। যদিও তখনো হাওয়া ওঠে নি, তবু একটু যেন নরম পড়েছিল।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সোনার চূড়ো আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। গাইড বললে,--এইসব বিশাল পাষাণ প্রাসাদ একেবারে জলের ভিতর থেকে উঠে এসেছে। এরা প্রাসাদ নয়, দুর্গ। ভারতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজা রাণী এখানে এক একটা দুর্গ বানিয়ে গেছে। তাদের ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথের আলো বাইরের অন্ধকারের বুকের উপরে তারার মত জ্বল জ্বল করছিল। ঘাটে ঘাটে সাধুদের ধুনী আর শ্মশানের চিতার আগুনে তীরভূমি রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। কাশীতে যত সন্ন্যাসী, তত শ্মশান। এখানে মরলে সাক্ষাৎ স্বর্গবাস। কাশীতে মৃত্যু মানেই মুক্তি—তাই লোকে বুড়ো হলে মরতে আসে এখানে। এখানে যত বুড়োবুড়ীর ভিড় এমন আর কোথাও নেই। বেঁচে থাকাটাই যাদের কাছে অভিশাপ, মৃত্যু তো তাদের পক্ষে মুক্তিই বটে।

সেদিন রাতে নৌকোর উপরে ব্রিটীশ সৈন্যের দল ভারত রক্ষার ফাঁকা আদর্শ নিজেদের স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে, যে বিকট উল্লাসে মেতে উঠে অশ্লীল চীৎকার জুড়েছিল, তাতে শ্মশানচারী ভারতের অন্তরাত্মা মর্মে মর্মে পীড়িত হচ্ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা তার জানা ছিল না। নৌকো বইছিল অতি ধীরে,—হাওয়ার উল্টোমুখে। দালাল বললে,—এই বিখ্যাত মণিকর্ণিকা ঘাট! 'মণিকর্ণিকা', মনে মনে উচ্চারণ করেছিল ফিলিপ। নামটা ভালো লেগেছিলো, তাকিয়ে দেখেছিলো ঘাটের কিনারায় চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর সেই আলো এসে পড়েছে পাশে বসে থাকা মেয়েটির মুখের উপরে। অদূরে বসে জটলা করছে কয়েকটি লোক। এখানে ঘাটের কাছে মেয়েটি বসে আছে,—একেবারে চিতার পাশে। তার মুখের আধখানায় আলো পড়েছে। তার কোন প্রিয়জনের দগ্ধদেহের আলো। মেয়েটির চোখে জল ছিল কিনা দেখতে পায়নি ফিলিপ। সে জোড়াসন করে স্তব্ধ হয়ে বসে

ছিল,—হাত দুটো কোলের উপরে জড়ো করে। মাথার কাপড় শুধু মুখের আধখানাকে ছায়া করেছিল, অন্যদিকে তার খোলা চুল। ফিলিপ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। এমন সময়ে নিজেদের মধ্যে কি একটা রসিকতায় ব্রিটীশবাহিনী প্রচণ্ড উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। সেই সমবেত উল্লাসের কুৎসিত ধ্বনিতে মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। ফিলিপ দেখল সেই অদ্ভুত চোখে জল নেই, জ্বালাও নেই, আছে একটা সুদূর উদাসীনতা। এমন নিরুত্তাপ নির্বিকার দৃষ্টির যে এত মর্মভেদী প্রভাব হতে পারে, তা ফিলিপ আগে কখনো ভাবে নি। ফিলিপের মনে হোল যেন মূর্তিমতী ভারতবর্ষ; যুগ যুগ ধরে, হাজার রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমনি নির্বিকার উদাসীন ভাবে চেয়ে বসে আছে।

বেনারসের গঙ্গাতীরের সেই দৃশ্যটা হঠাৎ এই মুহূর্তে কেন ফিলিপের মনের সামনে ভেসে উঠল কে জানে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিলিপ বললে,—"আচ্ছা চল, তোমায় পৌঁছেই দিই।"

—"না থাক," বললে জোন।

ফিলিপ কথা না বলে দরজা বন্ধ করে জোনের সঙ্গে এগিয়ে এল।

পথে বিশেষ কথা হোল না ওদের। ফিলিপ ধীরে ধীরে অন্যমনে ডুবে গেল তার ভাবনার গভীরে। আর জোন ভেবে পেল না কি বলে শুরু করবে কথা।

স্কটের বাড়ীর কাছাকাছি এসে জোন বললে, "ঐ শোন চাপা গুঞ্জন! আমার বন্ধুরা নিশ্চয় তর্কে মেতেছে। তুমিও যোগ দেবে এস না। এই সুযোগে তোমাকে আর এক কাপ কফি দেব।"

—"না না," ফিলিপ বললে,—"না না," আর সেই মুহূর্তে নিজের সেই কঠিন রুক্ষতার মুখোসটা আবার তুলে নিল।

"যেওনা, যেওনা ফিলিপ, আর একটু থাক!" ওর হাত চেপে ধরেছিল জোন। "কেন?" এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল ফিলিপ। সে চোখে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বহ্নিজ্বালা দেখে শিউরে উঠল জোন। "ফি—লি—প!" জোনের মুখে ওর নামের বানান সম্পূর্ণ হবার আগেই ফিলিপ পিছন ফিরল। আর সেই মুহূর্তে জোনের হঠাৎ মনে হোল,—আর দেখা হবে না। ও কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীর এ-প্রান্ত-থেকে ও-প্রান্তে। হয়ত ভারতবর্ষেও আবার চলে যেতে পারে, ওর

বইতে নতুন কথা ভরে দেবার জন্যে। কিন্তু কখনোই হয়ত আর জোনের চোখের সামনে আসবে না। হঠাৎ আজ সকালে একটা অবাঞ্ছিত মুহূর্তে কালের গর্ভ থেকে যেন দেবদূতের মত উদিত হয়েছিল। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই তাকে কালের গর্ভে মিলিয়ে যেতে দেখল জোন। বুঝল একটা পালার শেষ হোল ওর জীবনে—কোথায় যেন কোন অদেখা রঙ্গমঞ্চে আজো যেন সে পালার খেলা চলছিল। হঠাৎ তার উপরে যবনিকা পতন হয়ে গেল। হঠাৎ একটা অতল শূন্যতা জোনের চারিদিক ঘিরে সেই চাঁদ-মোছা কুয়াশাকে গভীর বিষাদের মত আচ্ছন্ন করে রইল। গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকতেও হাত উঠল না জোনের অনেকক্ষণ। কিন্তু তবু একটা ছোট্ট আশা মনের কোণ থেকে বার বার উঁকি দিতে লাগল। 'আর দেখা হবে না,' এই নিশ্চিত বিশ্বাসের কালো জালটাকে একটু একটু ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটু একটু আশার আলো আশ্বাস দিতে লাগল,—হয়ত এমনি ভাবেই আবার কখনো দেখা হবে,—কে বলতে পারে।

জোনের আশারা ঠিক কথাই বলেছিল,- পরদিন সকালে খুঁটিনাটি জিনিসপত্র হাতে গাড়ীর কাছে এসে জোন দেখল ফিলিপ সিড্‌নী আগে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কুমার, এডমণ্ড, কৃষ্ণা—সবাই একে একে এল কিছু কিছু জিনিসপত্র হাতে নিয়ে। কুমার বললে, সুপ্রভাত! এড বাক্সগুলো কেরিয়ারে রাখতে রাখতে বললে,—কৃষ্ণা, এবারে, সেই দড়িগুলো কোথায় আছে আবিষ্কার করতে হবে।" কাল রাতেই আবার ওদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণা বলেছিলো,—"রাগ কোর না, এড, তুমি তো আর আমাকে বিয়ে করতে না। যে আমাকে বিয়ে করবে, আমি তাকেই ভালোবেসেছি। এ ব্যাপারে মেয়েরা ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল।" শুনে এড হেসে ফেলেছিলো,—অদ্ভুত সোজাসুজি কথা বলে মেয়েটা। হাসি ছাড়া উপায় থাকে না। হাসতে হাসতেই এড বলেছিলো,—"কি করে জানলে?"

—কি?"

—"যে বিয়ে করতাম না? তুমি চান্সই দিলে না।" কৃষ্ণা কুমার দুজনেই খুব হেসেছিল এবং এডমণ্ডও যোগ দিয়েছিল। কুমার বললে,—

"দেখ এড, আমি ভাবছি কি? এসেছিলাম চারজনে, দুজোড়া হয়ে ফিরে গেলে মজা মন্দ হয় না। তাই আমি বলি কি—শুভস্য শীঘ্রং—এই নীতি অনুসারে তুমিও কাল জোনের কাছে প্রপোজ করে ফেল।"

—"বেশ!" এড বললে,—"কিন্তু জোন কোথায়?"

—"নিশ্চয়ই ভিতরে আছে", কুমার বললে।

কৃষ্ণা তার বড় চোখ কুমারের দিকে তুলে বললে,—"আমার মনে হয়, সে ফিলিপের কাছে গেছে।" এডমণ্ড বললে,—"রাইট! নারী তুমি, তাই নারীর মন ঠিক বুঝেছ। আমিও অবশ্য বুঝেছি নারী না হয়েই।"

কুমার খুব চিন্তিত হবার ভান করে বলেছিলো,—"তাহলে এড, তাড়াতাড়ি কর। নাহলে তুমি ভাবতে ভাবতে আবার কৃষ্ণার ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করে হয়ত জোনই ফিলিপকে প্রপোজ করে বসবে।"

—"তাই ভোর বেলায় জোন আর ফিলিপকে একসঙ্গে দেখে ওদের তিনজনেরই গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। ওরা চোখে চোখে চেয়ে একটু একটু হাসল।

কৃষ্ণা বললে,—"তোমরা কি নিশ্চত জানো যে, দড়িগুলো আমিই কোথাও রেখেছি? কিন্তু তাহলে আমি কেন জানি না সেই কথা। কেন কিছুতেই মনে পড়ছে না।"

জোন পিছন ফিরে ওদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললে,—"না, দড়িগুলো আমিই রেখেছি। পরস্পরের গলায় দিতে লাগবে বলে। কেরিয়ারের কোণের দিকে যে ঢাকা দেওয়া বাক্স মতন আছে, তার মধ্যে দেখ।"

ফিলিপ বললে,—"লণ্ডনে তোমার কাজিনের আর তার ছেলের ঠিকানা আমায় দেবে? আমি হারিয়ে ফেলেছি।" "নিশ্চয়ই", কুমার ফিলিপের নোটবইয়ে ঠিকানা লিখে হাতে দিয়ে বললে,—"শুনলাম, তুমি কবি এবং ঔপন্যাসিক। হাতে সময় থাকলে, তোমার লেখা কিছু শুনতে চাইতাম। আর হয়ত কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতাম।"

এডের সঙ্গে জিনিস গোছাতে গোছাতে মুখ তুলে কৃষ্ণা বললে,—"উপন্যাস লিখছ, শুনেছি, গল্পটা কি?"—"মেয়েরা দেখছি, সব দেশেই জন্ম-কুতূহলী। গল্প শোনার বাতিক তাদের কখনো কমে না।. জোনও কাল এই প্রশ্নই করছিল।"

—"ঠিক বলেছ!" কুমার হাসল, আড়চোখে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে বাংলায় বললে,—"অর্থাৎ মেয়েমানুষ মানেই ছেলেমানুষ।" কৃষ্ণা হেসে উঠল। এড বললে,—"এদিকে মন দাও কৃষ্ণা। তোমাদের রহস্যালাপ পরে কোর। নইলে আজও হয়ত এখানে থাকতে হবে।" কৃষ্ণা ওকে সাহায্য করতে এল। এড বললে,—"দেখ, দেখ, জোন কিরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছে?" কৃষ্ণা তাকিয়ে দেখল, ফিলিপ আর কুমার কথা বলছে,—আর জোন চুপ করে চেয়ে আছে। জোনকে এত চুপচাপ দেখেনি কখনো কৃষ্ণা। ওর বুকের মধ্যে হঠাৎ টন্‌টন্‌ করে উঠল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা বললে,—"জোন বেচারা প্রেমে পড়েছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে," এড বললে! তারপরে বাঁধাছাঁদা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার চোখে চোখ রেখে হাসল,—"তাহলে, এবারও আমার হার হোল।" কৃষ্ণা চমকে উঠে দেখল,—এডের জন্যে ছোট্ট একটু মন-কেমন-করা অস্বস্তি ওর মনের মধ্যে কাঁটা বেঁধাচ্ছে। কিন্তু সে অস্বস্তিকে আমল দিল না কৃষ্ণা। মানুষের হৃদয়টা যে কি বিচিত্র এবং বিশাল তার মধ্যে যে কত জায়গায় কত জনের জন্যে কতরকম আসন পাতা আছে, সে কথাও ভাবলো না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—"ব্যাপার কি? এরা কি আজ আর বেরুবে না? কি এত আলোচনা হচ্ছে?"

"কি জানি বোধহয় সাহিত্য, যোগ দিতে চাও?

—"না বিয়োগ দিতে,—এবারে বিয়োগাঙ্কে না এসে পৌছালে আজ রাতে আর কার্লাইল পৌছানো যাবে না।" ওরা এগিয়ে গেল, এড বললে, "কুমার, কবিতার ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখে, আপাতত গাড়ীতে উঠে এক্‌সিলেটারকে পদানত কর, নাহলে কাজে যেগে দিতে একদিন দেরি হয়ে যাবে।" মুখের কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কুমার বললে, "রাইট ইউআর!" ও গাড়ীতে উঠে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যন্ত্রচালিতের মত পিছনের সীটে উঠতে যাচ্ছিল জোন, সেই মুহূর্তে যেন ফিলিপের কথাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ফিলিপ ভোলেনি, ও এগিয়ে এসে বললে,—আরিভোয়া!

হঠাৎ ফিলিপের গলার মধ্যে সেই মৃদু কোমল কবি ফিলিপের গলা শুনতে পেল জোন, দশ বছর আগে যে জোনের কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল ঐ কথাদুটোই বলে। জোন চমকে ফিরে তাকালো, দেখলো

বহুদূর থেকে ঝরে-পড়া শিশু সূর্যের একটা কোমল আলো ফিলিপের মুখে রং ছড়িয়েছে, আর তাতে যেন ওকে চেনা যাচ্ছে সেই আগের ফিলিপ বলে। ওর দিকে মুখ তুলে চাইতে গিয়ে হাঁসের খোঁয়াড়ের পাশে টুলে বসে-থাকা স্কটের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বুঝল, এতক্ষণ এরই দৃষ্টির অস্বস্তি ওকে পিছন থেকে হুল ফোটাচ্ছিল। জোন দেখল,—লোকটা টুলের উপরে বসে কাস্তে ঘসতে ঘসতে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ জোনের হাসি পেল। একমুহূর্তের জন্যেও কেন সে ঐ লোকটাকে ভয় পেয়েছিল অথবা প্রশ্রয় দিয়েছিল বুঝতে পারল না। ওর মধ্যে খানিকটা গায়ের জোর ছাড়া আর কি আছে? আছে হয়ত খানিকটা অতৃপ্তি আর অনেকখানি ক্ষুধা আর অনেক মূঢ় বাসনার অন্ধ বিকৃতি। "আরিভোয়া," ফিলিপ দুহাতে ওর ডানহাতটা ধরে, আস্তে ছেড়ে দিল। আর জোন অনুভব করল ফিলিপের হাতের মধ্যে থেকে ওর হাতে সংক্রামিত হয়েছে একটা কোন কিছু। হাত মুঠো করে জোন হাসলে,—ওদের ছেলেবেলার খেলা ছিল এটা। হ্যাণ্ডসেকের ছলে, হাতে হাতে বিনিময় করা কোন অবান্তর চিঠি,—তুচ্ছ কোন টুকিটাকি। জোন হাসল। কাগজটা মুঠো করে ফিলিপের মুখে চেয়ে শিশুর মত হেসে উঠল।—সে হাসির সাক্ষী রইল তিন বন্ধু। কুমারের পায়ের নীচে এক্‌সিলেটার কাঁপতে কাঁপতে নীচু হয়ে গেল,—ছুটে চলল গাড়ী।

বার্কহিল স্ট্রীটের সেই ছোট হলটায় মার্কাসের "শকুন্তলা" পর পর তিন সন্ধ্যা অভিনীত হোল।—টাকার দিক থেকে লাভ তেমন না হলেও নাম হোল খুব। পূবদেশের প্রতি যাদের ঔৎসুক্য আছে তারাই অবশ্য এসেছিল বেশী। মার্কাস নিজেও তাই চেয়েছিল। যাদের এবিষয়ে খানিকটা কৌতূহল এবং কিছুটা জ্ঞান না আছে, তাদের কাছে এ জিনিস পরিবেশন করতে ওর মন চায়নি। খবরের কাগজে সমালোচনাও বেশ ভালোই হবে, আশা করা যাচ্ছে, কারণ রিপোর্টারদের প্রায় সকলের সঙ্গেই মার্কাসের জানাশোনা ছিল। তারা রমলার কথাও উল্লেখ করবে বলেছে। কারণ

অনুবাদটা ওরই করা। কিন্তু রমলার নিজের জিনিসটা ভালো লাগেনি তেমন। সমস্তটা যেন একটু কেমন কৌতুকাবহ মনে হচ্ছিল। আধুনিক ভাষায় আধুনিক ঢঙে শকুন্তলাকে যেন মানাচ্ছিল না। রমলা বলেছিলো, সেক্সপীয়ারের স্টাইলে পুরোনো ইংরেজীতে অনুবাদ করা হোক। দেশে দেশে যতই অমিল হোক, কালে কালে কিছুটা অন্তত মিল থাকত। যদিও কালিদাসের সঙ্গে সেক্সপীয়ারের অন্ততঃ হাজার বছরের ব্যবধান। তবু সেক্সপীয়ারের সময় পর্যন্ত ভাষার খানিকটা পৌরাণিক ঢং ছিল,—আধুনিক ইংরেজী আধুনিক জীবনযাত্রার ইঙ্গিতবহনকারী।—এ ভাষায়, এ ঢঙে, সে যুগের ভাবকে প্রাণ দেয়া যায় না। কেমন যেন কৃত্রিম লাগে। কিন্তু মার্কাস রাজী হয় নি। বলেছিল আধুনিক ভাষা না হলে, আজকের লোক কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। এবারে এরকমই হোক। পরে যদি আবার কখনো করা যায়, তখন অন্যরকম এক্সপেরিমেণ্ট দেখা যাবে। রমলা আর বাধা দেয় নি। মার্কাসের ইচ্ছেমতই অনুবাদ করেছে। লেখা পড়ে মার্কাস বলেছিল,—তুমি সত্যি জিনিয়াস। বইটা যদি উৎরোয় তো তোমার জন্যেই উৎরোবে। শুনে রমলা অল্প একটু খুশীর হাসি হেসেছিল।

সেদিন থিয়েটারের পরে ওরা দল বেঁধে হৈ হৈ করে খেতে চলল। রাতের যেটুকু অবশিষ্ট আছে কোন pubএ গিয়ে নৃত্য-গীত ও পানোৎসবে কাটিয়ে আসবে। ওদের এই অভিনেতা দলের প্রায় সকলেই ছিল এমেচার। নাটক করার শখ,—তাই করে। রোজগারের জন্যে কাজ করে সকলেই নানা জায়গায়। আর থিয়েটারের সময় রাত জেগে নাটকটা দাঁড় করায়। রমলা কোনদিনই এদের নৃত্যোৎসবে যোগ দেয় না। সেদিন মনটা খুশী ছিল। সবাই ওর প্রশংসা করেছে। সেই খুশীর রং-লাগা মনে রমলা রাজী হয়ে গেল ওদের সঙ্গে যেতে।

আসর জমলো অভিজাত পাড়ার একটা বিশিষ্ট ঘরে। অভিনয়ের সফলতা পকেটের দীনতার কথা ভুলিয়ে দিল। খাবারের তালিকায় অভিজাততম মৎস্য 'স্যামনের' দেখা পাওয়া গেল। পানীয় অবশ্য সকলেরই সেই সনাতন হুইস্কী। শুধু মেয়েদের জন্যে কিছু বিচিত্র বর্ণের মদিরা। রমলা কথা দিয়েছিল আজ সকলের সঙ্গে বসে ওদের থ্রী চীয়ার্স ক্লাবকে থ্রী চীয়ার্স জানিয়ে পান করবে। বেঁটে, মোটা, তেকোণা, চার কোণা, পলকাটা

নানারকম বোতলে নানা রঙের সুরা এল। রমলা বললে,—ওরা ওর জন্যে যা ইচ্ছে পছন্দ করে দিক। যদি ভালো লাগে, রমলা একপাত্র পুরো খাবে। আর যদি ভালো না লাগে, তবে কিন্তু সে পাত্র নষ্ট হবে এই সর্তে। "বাঃ নষ্ট হবে কেন?" সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—"নষ্ট হবার ভয় নেই—আমরা আছি কি করতে?" এদের এই স্বভাবটা রমলাকে অবাক করে দেয়। এই কাড়াকাড়ি করে এঁটো খাওয়া।

সে যাই হোক, এখন কোন্‌টা পছন্দ করবে রমলা? নানা রঙের বিচিত্র তরলতা বোতলে বোতলে ভরা। রমলা বললে,—"পছন্দ করার কথা তো আর আমার নয়। রুচি তোমাদের, খুশী আমার।" "তাহলে এইটে নাও।"—একজন বলে,—এই ক্রীম দেমেন্থ রংটা পছন্দ হোল রমলার, টলটলে সবুজ। বাঃ যেন গলিত পান্না। "না না এইটে নয়, এই যে চেরী ব্র্যাণ্ডী। এর স্বাদ আরো মিষ্টি। রমলা তাকিয়ে দেখল,—গলিত পদ্মরাগের মত লাল। এখন কোন্‌টা নেবে রমলা,—পান্না না চুনী? দুটোই একটু একটু পরখ করে দেখুক না,—একজন মন্তব্য করে,—যেটা ভালো লাগবে সেটা খাবে।" "কিম্বা," মার্কাস মন্তব্য করে, "যেটা বেশী খারাপ লাগবে সেটা খাবে না।" হো হো করে সবাই হেসে উঠল। সেই হাসি দিয়ে শুরু হোল আসর জমে ওঠা। ধীরে ধীরে কখন যে সত্যি সত্যি জমে উঠল, যেন ভালো করে টের পাওয়া গেল না,—অর্কেস্ট্রা দ্রুত লয়ে বাজতে বাজতে মাঝে মাঝে চরম মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে যেতে নবতম সুর ঝঙ্কার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। আর সেই সঙ্গে নাচতে লাগল নাচনী মেয়েরা। আর এরই মাঝে মাঝে খাওয়া ও পানের ফাঁকে ফাঁকে গ্রীচীয়ার্সের ছেলে-মেয়েরাও উঠে নেচে নিচ্ছে কয়েক পাক। কতরকম সুরের সঙ্গে কতরকম ভঙ্গী। নাচের তালে, আর সুরের ঝঙ্কারে, কখনো মৃদু, কখনো তীব্র ছন্দে মত্ত হয়ে উঠতে চাইছে যা, কি নাম তার দেওয়া যেতে পারে। একটা উদ্দাম খুশী? দুরন্ত আবেগ? না বন্য কামনা? ভাবতে চেষ্টা করে রমলা। যাই হোক, তা যে ভুলিয়ে দিচ্ছে, এই তাপদগ্ধ দুনিয়ার জ্বালা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য শান্তিবারি ঢেলে নয়, বরং ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বলা যেতে পারে।

রমলা দেখল, যেমন ঘূর্ণি বাতাসে কাগজের টুকরোরা নাচে তেমনি একটা

মত্ত আবেগের ঘূর্ণিতে কতগুলো মানুষের মূর্তি ঘুরতে ঘুরতে নাচছে। নাচতে নাচতে ঘুরছে। ওদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্তকণিকার ঘূর্ণিমাতন যেন অনুভব করতে পারল রমলার কল্পনা। যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল কাকে বলে নেশা। নেশার মধ্যে মানুষ পালিয়ে বাঁচে। মানুষের যা কিছু শখ, তাই তার নেশা। সবচেয়ে বড় নেশা অবশ্য দুটি, ধর্মের আর মদের। রমলা জাতীয় লোক—যাদের কোন নেশাই নেই, জীবন তাদের কাছে অনেক সময়েই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। হঠাৎ রমলার মনে পড়ে গেল বছর চৌদ্দ পনর আগের কথা। রমলার জীবনেও তখন নেশা ছিল। তেরো থেকে সতরো। এই চার বছর সময় কি মত্ততার মধ্যে যে ডুবে ছিল,—কোথায় ছিল পড়াশুনো। স্কুল কলেজ, সেও একরকম নেশা বই কি? দেশের কাজের নেশা। কোন্ সে দেশ, কি তার নাম? ভারতবর্ষ? সে কোথায়? কোন্ সাগরের সুদূর তীরে নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটায় মুখ ঢেকে কাঁদছে। অবশ্য আজ তার কাঁদবার দিন নয়। খুশীর দিন। আজ সে স্বাধীন। স্বাধীনতার পূজায় এতদিন বলি দিয়েছিল নিজের বীর সন্তানদের। আজ বলি দিয়েছে নিজের অঙ্গ। সেই ছিন্ন দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। তবু হাসিও তো ফুটছে। দেখে এসেছে রমলা। আলোয় মালায় উৎসবে সজ্জায় জাতীয় পতাকার তিনরঙ হাওয়ায় উড়ছে। সেই তিনরঙা হাসিকে কিন্তু ব্যঙ্গ করেছিল রিফিউজি বুড়ীটা,—সেই যে সপ্তাহে সপ্তাহে চাল নিতে আসত রমলার কাছে। আর সেই ছুতোয় বেশ খানিকক্ষণ কান্না-কান্না টানা সুরে নিজের দুঃখের কথা বলে যেত,—কেমন করে তার মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে, আর ছেলেটাকে কেটে ফেলেছে, আর বাকী ছোট ছেলেটা যার বসন্তে কাণা হয়ে গেছে। সেই তো বলেছিল,—"এ হাসি ভারতমাতার হাসি নয়, তার সতীনের হাসি! দেখছ না হাসির কি ধার!"

সত্যিই এ ভারতমাতার সতীনের কারসাজি। নইলে রমলাকে কে এখানে ভুলিয়ে পাঠাল? এ কোথায় বসে আছে সে, সাহেব-মেমেদের দলের মধ্যে? এত রং, এত আলো এত সমারোহের মধ্যে, ঠোঁটে নিয়ে হাসি আর হাতে নিয়ে কর্তিত কাচপাত্রে রক্তবর্ণ সুরা। "শঙ্করদা, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছো?" হঠাৎ শঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল যেন—সেই উজ্জ্বল বীর মূর্তি। সেই জীবন্ত আদর্শ, যার ডাকে একদিন রমলার মত আরো অনেকে ছুটে

গিয়েছিল প্রাণের সমস্ত ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে। হঠাৎ রমলা যেন স্পষ্ট অনুভব করলে শঙ্করের উপস্থিতি। শঙ্কর যেন ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শঙ্করদা, বল বল,—আমি কি ভুল করেছি। পার্থকে কি দেশে রেখেই মানুষ করা উচিত ছিল? হঠাৎ রমলার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। টেবিলের উপরে হাতটা লম্বা করে দিয়ে, নিজের হাতের উপরে নয়, যেন শঙ্করের পায়ের উপরেই মাথা রাখল। আর ওর চোখভরা দু এক ফোঁটা নিঃশব্দ জল টপটপ করে টেবিলের উপরে ঝরে পড়ল।

রমলার দিকে লক্ষ্য করার মত অবস্থা তখন বিশেষ কারুরই ছিল না। শুধু মার্কাসের নৃত্যসঙ্গিনী সুসান তার কাণে কাণে ফিসফিস করে বললে,—"ঐ দেখ, তোমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে।" মার্কাস তাকিয়ে দেখল, লম্বা করে মেলে রাখা হাতের উপরে মাথা রেখে রমলা বসে আছে। ওর মুখ উল্টোদিকে ফেরানো,—বোঝা যাচ্ছে না যে, ও সত্যি ঘুমোচ্ছে কিনা। কিন্তু ওর ওই বসার ভঙ্গীটা মার্কাসের মনের মধ্যে যেন কেটে বসে গেল। আর সেই কাটার যন্ত্রণায় বুকটা টনটন করে উঠল। সেই টনটনে বুকের উপরে মুখ রেখে সুসান বললে,—"তুমি ওর মধ্যে এমন কি দেখেছো মার্কাস যে, সবাইকে ফেলে এতদিন ধরে শুধু ওকে নিয়েই মেতে রয়েছো?" সুসানের কথার জবাব দিলে না মার্কাস। শুধু ওর পিঠের উপরে নিজের আলগা করে রাখা আঙুল দিয়ে অল্প অল্প টোকা দিয়ে আদরের ইঙ্গিত জানিয়ে বললে,—"রাত কত হয়েছে বল তো?"

"কেন?" চমকে উঠল সুসান,—"রাত কত তা দিয়ে কী হবে? পালাতে চাও বুঝি এখনি? ভেঙে দিতে চাও খেলা? তোমার বান্ধবীর ঘুম পেয়েছে বলে! কেন?" সুসানের চাপা স্বরে সব দেশের সব কালের অভিমানিনী মেয়ে কথা কয়ে উঠল;—"কেন ওকে এনেছিলে এ আসরে? কেন বুঝতে পারোনি এখানে ওকে মানায় না, ও মিস্‌ফিট। এখানে ও যে শুধু নিজে আড়ষ্ট তা নয়, অন্যকেও আড়ষ্ট করে তোলে। ও এখানে একেবারে বেমানান। দেখতে পাওনা কারু সঙ্গেই তেমন করে মিশতে পারে না।"

সত্যি! মার্কাস ভাবে, রমলা কেন তেমন করে সবার সঙ্গে মিশতে পারে না। সুসান বলে, "সবার সঙ্গে চলতে ওর পায়ে পায়ে বাধা।" "কিসের বাধা"?—মার্কাস অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল। সুসান বলেছিল,

"বোঝনি ? ওটা ভারতবর্ষের বাধা। প্রাচীন ভারতের একটা বিশাল বোঝা ও সঙ্গে করে এনেছে। সেই বোঝাটা পদে পদে ওর পথ আটকে ধরছে।"

মার্কাস বললে, "কিন্তু ও ওখানে ওরকমভাবে ঘুমোলে কি ভালো দেখাবে ? সুসান রাগ করে নাচ থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে,—"বেশ যাও।"

—"আঃ কর কি, ট্র্যাফিক জ্যাম্ হয়ে যাবে যে," মার্কাস হাসল। রাগ কোর না সুসি, এ নাচটা শেষ হলে ওকে টপ্ করে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ফেলে একেবারে ওর দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে আসব।"

—"শুধু দরজার কাছে নামাবে ? বিছানায় নয় ?"

—"শস্, শস্, টাট্-টা,—"মার্কাস বললে, "চুপ চুপ, অত রেগো না, আমাকে দশমিনিট সময় দাও লক্ষ্মীটি। ওকে পৌছেই চলে আসব। ততক্ষণ তুমি কেরী কিম্বা ফিলের সঙ্গে নাচ।"

রমলার কানের কাছে নীচু হয়ে ফিসফিস করে মার্কাস বললে। "রোমালা, রোমালা!" চমকে উঠে রমলা বললে, "কি ?"

—"দেখে মনে হচ্ছে তোমার ঘুম পেয়েছে। চল, তোমায় পৌছে দিয়ে আসি।" রমলা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ওদের দিকে কেউ চাইছে না। মার্কাস দেখলে সুসানও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, ইচ্ছে করেই দেখছে না। মার্কাস বললে,—"এখন সবাই এসে নিজের গেলাসে সবে ঝাঁপ দিয়েছে। চল, এই বেলা পালাই, কেউ টের পাবে না।" রমলা একটু হেসে চুপি চুপি বললে "চল।" তারপরেই দ্বিধাভরে বললে,—"কিন্তু তুমি চলে গেলে, এরা রাগ করবে নাতো ?" "না", ভরাগলায় মার্কাস বললে,—"আমি তো এখুনি চলে আসব, তোমাকে পৌছে দিয়েই।" "ও! আচ্ছা!" মার্কাস আলগা ছোঁয়ায় একটা হাত ওর পিঠের উপর রেখে বিলিতী কায়দায় ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল। এমন ভাবে অনেক চলতে হয়, এদেশে, অনেকেরই সঙ্গে। এমন ভাবে চলাটাই এদের কায়দা। কিন্তু আজ রমলার কি জানি কেন এমন ইচ্ছে হোল। এতক্ষণের মানসিক উত্তেজনার ক্লান্তি ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে ধরল! মার্কাসের ঠিক কাঁধের কাছে ওর মাথা,—গলার নীচে। রমলার ইচ্ছে হোল, মার্কাসের যে হাতটা ওর

পিঠ ছুঁয়ে আছে, সে হাতটা ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরুক, আর রমলা তার মাথাটা রাখুক মার্কাসের কাঁধে। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ রমলা অনুভব করল,—কখন তার অবশ মাথাটা তার অজান্তেই মার্কাসের কাঁধের উপরে নেমে এসেছে, আর মার্কাসের হাত রমলার ইচ্ছেমতই তাকে জড়িয়ে ধরেছে। মার্কাসের গলার মধ্যে থেকে একটা ভীতস্বর আকুল হয়ে বলছে, 'রোমা, রোমা, রোমালা,—কি হয়েছে ? হঠাৎ অসুখ করছে নাকি ?' রমলা জবাব দিল না। কিন্তু ওর মাথাটা সরিয়ে নিতেও দিল না মার্কাস। একহাতে ওর পিঠ বেষ্টন করে অন্যহাতে মাথাটা চেপে ধরল। ওর কপালের উপরে চুলের সীমান্তে বার বার অধর স্পর্শ করে বলল—'রোমা, রোমা, রমলা।' বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না রমলার কয়েক সেকেণ্ড। ওর ইচ্ছে করছিল, এই মুহূর্তে নিজের সমস্ত ভার কোথাও নামিয়ে দিয়ে যদি কোন গভীর বিশ্রামের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যেতে পারে। এতে দোষ কোথায় ? এতে পাপ কি ? একজনের মধ্যে আরেক জনের মন যদি বিশ্রাম ও শান্তি পায় তাতে অপরাধ কি ? ভালোবাসার মধ্যে কলঙ্ক কেন ?—

ভালোবাসা ? তবে কি রমলা মার্কাসকে ভালোবাসে নাকি ? কে জানে কাকে বলে ভালোবাসা ? চেষ্টা করে নিজেকে সামলে একটু সরে এল রমলা। মার্কাসের হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে খুলে এল। অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে রমলা বললে—"দুঃখিত, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল।"

"সত্যি ! আমিও দুঃখিত," মার্কাস বললে,—"তোমার অসাবধানতার সুযোগ নিয়েছি বলে।" সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে মার্কাস বললে, —"সত্যি রোমলা বিশ্বাস কর।"

—"কি ?"

—"সত্যি রোমালা !"

"কি সত্যি ?"

—"আমি কিছু মনে করে করি নি।" ওর চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে রমলা বললে,—"কি মনে কর নি ?" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীর দরজা খুলে ওকে ভিতরে বসিয়ে, মার্কাস চালকের আসনে বসল। রমলা আবার বললে,— "কি মনে করনি মার্কাস ?" অস্ফুট স্বরে মার্কাস বললে,—"মনে করিনি যে তুমি—তুমি—যে তোমাকে ঘিরে আমার সমস্ত সত্তা অধীর হয়ে ওঠে,—

যে তোমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার কামনা উন্মত্ত হয়ে উঠতে চায়—যে তোমাকে একেবারে সমস্ত দেহমনে ব্যাপ্ত করে দেখতে চাই,—যে তুমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে আমার কাছে সম্পূর্ণ ধরা দাও,—সেই তোমাকে তুমি বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছিল, তুমি যেন একটা ছোট পাখী,—ভীরু, অসহায়! তোমাকে রক্ষা করার মহৎ দায়িত্ব আমার। মনে হচ্ছিল,—কি মনে হচ্ছিল জানি না। তবে তা কামনা নয় এটা ঠিক। তোমার প্রতি বিপুল স্নেহে আমার মন টলমল করছিল, তুমি তখন অনায়াসে হতে পারতে আমার ছোট একটি বোন।"

রমলা বললে—"জানি।"

—"কি জানো?"

"জানি তুমি আমায় ভালোবাসো"।

গাড়ীতে স্পীড বাড়িয়ে মার্কাস বললে,—"আর তুমি?"

একটু চুপ করে থেকে রমলা বললে,—"আজ বুঝতে পারছি,—আমিও বাসি। তোমার প্রেম আমার মনের মধ্যে যে স্নেহকে উদ্বেল করে তুলেছে, তাকে যে নামে খুশী ডাকতে পারো, আসলে সে ভালোবাসাই। তাতে কোন লজ্জা কোন অগৌরব নেই—কিন্তু,—" রমলা চুপ করল।

—"কিন্তু কী?"

—"কিন্তু সমাজের চোখে কালি আছে মার্কাস,—মানুষের চোখে বিষ। সত্যি বলছি মার্ক, তোমার ভালোবাসা আমার মাথার মাণিক, কিন্তু তাকে লোহার সিন্দুকে তুলে ছাড়া উপায় নেই। যদি তাকে মাথায় পরি,—তবে চারিদিকের কালি তাকে এত কালো করে ফেলবে যে, নিজেরাও হয়ত তাকে আর চিনতে পারব না।"

—"জানি তো, তোমার সমাজ, তোমার জীবন, তোমার দেশ আমার থেকে অনেক অনেক দূরে,—তুমি সে সমাজ ছাড়তে পারবে না, আর ছাড়বেই বা কেন,—সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সমাজে আর প্রেমে যদি বিরোধ বাধে, তবে সমাজেরই জয় হওয়া উচিত, তোমার একথা আমি মানি না। কিন্তু তবু আমি তোমাকে জোর করব না রমলা, যদিও আমি অন্তরে বুঝতে পারি, আমাকেই তোমার প্রয়োজন আছে,—তোমার চিরজীবনের ভার দিয়ে অনায়াসে আমাকে ধন্য করতে পারতে। কিন্তু তবু,

আমি ঠিক করেছি, তোমার মনে যদি দ্বিধা থাকে, আমি তোমায় ডাকব না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমলা মার্কাসের হাতের উপরে হাত রাখলে। মার্কাস বললে—"অনেকদিন ধরে ভেবেছি, তোমাকে বলব,—রমলা, সমাজের জন্যে তুমি জীবন দিতে পার,—প্রেমের জন্যেও অন্তত কিছু একটু দাও। স্বল্প একটু দান। তোমার সমগ্র জীবন থেকে একটি মাত্র দিন আমাকে পূর্ণ করে দাও,—আমাকে তোমার মধ্যে ডুবে যেতে দাও। তোমার প্রতি আমার প্রেম আমাকে দেহে মনে সম্পূর্ণ তোমার করে নিয়েছে,—তুমি তাকে একদিনের জন্যে গ্রহণ কর। সারাজীবন থেকে ওটুকু গেলে তুমি টেরও পাবে না, কিন্তু ওইটুকুতে আমার জীবন ভরে উঠবে।" নিজের বেদনাকে দলিত করে রমলা হাসল, "মার্ক, মার্ক, কেন বুঝতে পারছ না, ঐ একটি দিনই অমূল্য,—সেই দিনটি খুইয়ে ফেললে চিরজীবন ধরে তার ঋণশোধ করা যাবে না। কেন বুঝতে পারছ না, যে ঐ একটি দিন যদি তোমার জীবনকে স্বর্ণময় করে তুলতে পারে, তবে, সেই শূন্য দিনটিই কি চিরদিনের জন্যে আমাকে কপর্দ্দকহীন করে ফেলবে না?"

["ওগো হিসেবী,—ভালোবাসার কথা আর মুখে এনো না,—এত দরদস্তুর আর হিসেব যার মনে,—তার কাছে এত বেহিসাবীভাবে আমার সর্ব্বস্ব তুলে দিলাম কেন?"] মার্কের কথা অর্ধপথে থেমে গেল। আর একটা কথাও বললে না কেউ,—নিঃশব্দে গাড়ী এসে থামল রমলার দরজার কাছে।

গাড়ী থেকে নেমে দরজা খুলে দিল মার্কাস। রমলা দেখল লাইট পোস্টের আলো, একটা বড় গাছের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভেঙেচুরে এসে মার্কাসের এখানে ওখানে ছায়া ফেলেছে। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ রমলার মনে হোল এইবারে মার্কাসের সঙ্গে তার বিদায় আসন্ন হয়ে উঠেছে। যেতেই হবে। রমলার জীবনে যে দুজন পুরুষ এসেছিলো তারা রমলাকে ছেড়ে গেছে। এখন রমলাকেই ছাড়তে হবে,—নইলে কি হবে তা জানে না রমলা। শুধু বুঝছে যে বিদায় আসন্ন। রমলার জীবন সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত ঘরোয়া ছন্দে শুধুই স্বামী-সন্তান নিয়ে প্রেমের সুনিয়ন্ত্রিত বাঁধাপথে চলেনি।—তার জন্যে কষ্ট পেয়েছে সত্য,—প্রেমের বিচিত্র রূপের বিচিত্র

অনুভব তার জীবনে বেদনার রঙেই রঙিয়ে উঠেছে বটে,—তবু তাকে অজস্র সম্পদশালিনীও করে তুলেছে সন্দেহ নেই।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল মার্কাস। "পারো তো ক্ষমা কোর।"—ওর এই শেষ কথাটা অনেকক্ষণ ধরে রমলার মনের মধ্যে বাজতে লাগলো।

নিজের ঘরে এসে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল রমলা। কিছু করা, এমন কি কিছু ভাবার মত অবস্থাও ছিল না তার,—অসীম ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। কেন এত শ্রান্ত সে? কিসের এত ক্লান্তি? বোধহয় এ শ্রান্তি মনের,—এ ক্লান্তি মনের দীনতার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঠে দাঁড়াল রমলা, কাঁধ থেকে খসে পড়ে আঁচল লুটাতে লাগল কার্পেটের উপরে। সামনে তাকিয়ে দেখল রমলা—আয়নায় যার ছায়া পড়েছে, হঠাৎ যেন তাকে চিনতে পারল না,—তরুণী মেয়ের মত সুঠাম সুন্দর দেহ,—একি সে? বয়সের দোহাই দিয়ে যৌবন তো কোথাও ঢলে পড়ে নি। মনের এ ক্লান্তিরও তেমন ছায়া পড়ে নি। কিন্তু রমলা বিশ্বাস করল না ঐ আয়নাকে। ও ছায়া মিথ্যে বলছে আগাগোড়া,—রমলার দেহে যৌবনের ছবি আজ আর মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। ওর মনের মধ্যে এখন বাসা বেঁধেছে জরতী,—তার ভারে এ দেহ ভেঙ্গে চুরে তছনছ হয়ে যাবে শীগ্‌গিরই, এই সাদা সত্যি কথাটা কেউ বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারছে না,—আশ্চর্য্য! ওর আত্মার মধ্যে ক্রমশ জড পাষাণ জড়ো হয়ে বোঝার মতো চেপে বসেছে,—সেকথা বুঝতে পারল না মার্কাস। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না রমলা,—ক্লান্তিতে আর অবসাদে ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চাইছে শুধু।

কিন্তু তেমন করে ঘুমের মধ্যে ডুবতে পারল না রমলা। সারা রাত ধরে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে স্বপ্ন দেখল,—যেন সুশান্তর সঙ্গে খুব ঝগড়া হচ্ছে; রমলা যত রাগছে,—সুশান্ত তত হাসছে। রমলা রেগে বলছে—"তুমি রাগ করেছ।" সুশান্ত হেসে বলছে—"কই না তো!"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাগ করেছো। ঐ তোমার চিরকালের ট্রিক্স। রাগ করে ভালোমানুষীর ভান করা।"

"বাঃ।"

"বাঃ বই কী ! আমি জানি না ? মুখে বল, তুমি ভালো থাক, সুখে থাক, আর যেই আমি একটু সুখের আলো দেখলাম, অমনি তোমার মুখ গোমরা হয়ে উঠল। কেন ? কেন ?"

—"ছি ছি, ও সব কথা ভাব কেন ? তুমি সুখী হও না যত খুশী, তাতেই আমিও খুশী। আমার নিজের তো আর কোন রকমে খুশী হবার উপায় নেই।"

—"আঃ বোল না,—ঐ তো তুমি রেগেছো। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। না ভুলে কি করি ? তুমি যে কোথাও নেই—আমার দিন কি করে কাটে বল তো ? আমি নিজে যে কিছুই করতে পারি না, আমার পাশে কেউ না থাকলে।"

—"এটা বাজে কথা," সুশান্ত বললে,—"তুমি যথেষ্ট শক্তিময়ী, তোমার ঐ অক্ষম দুর্বলতা ভান মাত্র, অবশ্য ওতে তোমায় আরো আকর্ষণীয় লাগে।"

—"এ তোমার অন্যায়,—তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না তাহলে ?"

—"বিশ্বাস ? করি বই কী !"

—"মিথ্যে কথা।" জোরে চেঁচিয়ে উঠল রমলা। এত জোরে, যে,—ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখল, এতক্ষণ নিজেই সঙ্গে নিজের ঝগড়া করেছে রমলা, মাঝখানে সুশান্তকে কল্পনা করে নিয়ে ; আর তার নাম দিয়েছিল স্বপ্ন। এখন জেগে গিয়েও স্বপ্নকে থামতে দিল না রমলা,—বিস্ফারিত চোখে শুয়ে শুয়ে ঝগড়া করতে লাগল। যে সুশান্ত বেচারা কোথাও নেই শুধু দু একজনের মনের কোণেই যে মুখ ঢেকে পড়ে আছে, তাকে তার সেই নিভৃত কোণটুকু থেকে টেনে এনে সামনে দাঁড় করাল রমলা,—বললে,—"তুমি অতি হীনমনা, তুমি ক্রুর।" সুশান্ত নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। এই ধরণের কথার উত্তরে যা সে বরাবর করত। রমলা বললে,—"তুমি কেন আমার দিকটা বুঝছ না ?"

—"বুঝছি বই কী !"

—"ছাই বুঝেছ। কোনদিনই বোঝনি। আমি যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ, আমার যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বাসনা বেদনা আছে, এ কথা তুমি ভুলে গেছ। তুমি ভেবেছ, আমিও তোমার মত মরে গেছি। কিন্তু কই আমি তো মরি নি,—এই দেখ না আমার হাত। নিটোল শুভ্র হাতটা চোখের

সামনে তুলে ধরল রমলা, যেন সুকান্তর চোখের সামনে। "এ হাত আর কেউ ধরতে পারবে না, যেহেতু তুমি একদিন ধরেছিলে। কিন্তু তুমি তো একেবারে সরে দাঁড়িয়েছো আমার জীবনের পথ থেকে! তবে?"

"তবে কী?" সুশান্ত হাসে,—"ধরুক না তোমার হাত, যার খুশী সে; আমি তো আপত্তি করি নি। আমি তো একেবারেই চুপ করে আছি। তারো চেয়ে বেশী;—আমার তো কোন অস্তিত্বই নেই, অন্তত বর্তমান তো নেই, শুধু অতীতটুই, শুধু স্মৃতি মাত্র। তাও কি তুমি সহ্য করতে পারছ না?"

—"তোমার স্মৃতিতেই তো বেঁচে ছিলাম সুশান্ত। তোমার দুরন্ত জীবনধারার হাসিখুশীর ঢেউগুলি আমার কত নির্জন মুহূর্ত রোমন্থনের সুখে ভরিয়ে তুলেছে তা তো তুমি জানো সুশান্ত। তোমার কথা,—শঙ্করদার কথা, ছোটবেলার রোম্যান্টিক মুহূর্তগুলির কথা ভেবেছিলাম এই সব স্মরণের সুখই বর্তমানের কর্তব্যকে রসপূর্ণ করে রাখতে পারবে। ক্রমশ আমিও ঐ স্মৃতিতে পরিণত হব; আমার রূপ যাবে, যৌবন যাবে। আমার অস্তিত্বের এই প্রদীপ্ত মহিমা রূপকথায় পরিণত হবে। ক্রমশ বর্তমান আমাকে এড়িয়ে যাবে। অতীত আমাকে গ্রাস করবে। হয়ত তখনো বেঁচে থাকব কিছুদিন। সে জীবন হবে মৃত্যুর চেয়ে বিস্মৃত,—যেমন বিস্মৃত হয়ে পড়ে আছে কলকাতায় আমার কাঁচের আলমারীর খেলনাগুলো। কিন্তু, সুশান্ত,—তা তো হোল না। জীবন আবার আমায় ডাক দিয়েছে। স্মৃতি আর বাঁধতে পারছে না। আমার দেহমনের প্রতিকণা জীবনের রসে মাতাল হয়ে উঠেছে। শুধু স্মৃতি আর সংস্কার দিয়ে তাকে আর বেঁধে রাখতে পারছি না।"

—"কেন বাঁধতে চাইছ?" সুশান্তর গলায় সেই মসৃণ প্রশান্ত সুর, চিরকাল যা রমলাকে অধীর করে তুলত। কঠিন পরীক্ষাগুলির সময় চিরকাল সুশান্তর গলা এমনি প্রশান্ত নিরুত্তাপ হয়ে যেত। রমলা যত ক্ষুব্ধ, যত উত্তেজিত হোত, ও তত ঠাণ্ডা, তত ধীর হয়ে উঠত। ঠিক সেই ভাব নিয়ে আজও কথা বলল সুশান্ত,—"কেন মিছিমিছি নিজেকে বাঁধতে চাইছ রমলা। মৃত্যু যে জীবনকে বাঁধতে পারে না,—এ কে না জানে। তবে কেন তুমি সেই অতীতের মোহে বর্তমানের এই কঠিন সত্যকে তুচ্ছ করতে চাইছ? আজকের যুগে, এ সমস্যার সমাধান তো শক্ত নয়। সেই আদ্যিকালের একটা সংস্কারের জন্যে নিজের জীবনকে পঙ্গু করে ফেলবে, এত দুর্বল তো তুমি নও।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দুর্বল, রমলার বিস্ফারিত চোখ বুঁজে আসে, "তুমি জানতে না, আমি দুর্বল। আমার উত্তেজনাকে তুমি শক্তির স্ফুরণ মনে করতে। আমার ক্ষুব্ধ আবেগকে তেজ বা দীপ্তি মনে করতে। তুমি জানতে না অন্তরে আমি কত দুর্বল, কত অশক্ত,—তোমার শক্তিই চিরকাল আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। তাই আজ এমন করে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে—

—"হারাবে কেন? শান্ত গলায় সুশান্ত বললে, "ভালোবাসায় তো অন্ধকার নেই। প্রেম তো আলো, প্রেমের মধ্যেই তো বারবার মানুষ তার আত্মাকে আবিষ্কার করে। হারায় না তো!"

"তবে?"

—"তবে" সুশান্ত হাসল,—"ওঠো ওঠো জয়রথে তব! জীবনের জয়রথ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, উঠে পড়ো রমলা, আমি বাধা দেব না। না আমার অস্তিত্ব দিয়ে, না আমার স্মৃতি দিয়ে। তুমি যত এগিয়ে যাবে, দেখবে, স্মৃতির শুকনো পাপড়িগুলো কখন খসে খসে পড়ে গেছে। মৃত্যুর বাধা দিয়ে জীবনকে থামানো যায় না,—একথা ভুলে গিয়ে কল্পনাকে সত্য বলে যতই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, ততই তার ফাঁকি প্রকট হয়ে উঠবে।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, তোমরা ভুলে গেছ তাজমহল রচনা হয়েছিল পাষণ দিয়ে, জীবন দিয়ে নয়। তোমরা ভারতবর্ষের বিধবারা নিজেদের এক একটি জীবন্ত তাজমহল করে রখেতে চাও। কিন্তু সেটা মস্ত ফাঁকি।"

"হ্যাঁ সুশান্ত, জানি সেটা বিষম ফাঁকি, (এই যে বেঁচে আছি, এই তো মুহূর্তে মুহূর্তে জীবন দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাচ্ছি। তুমি কোথায় পড়ে আছ, কতদূরে, ক্রমশ ঝাপ্‌সা হয়ে আসবে তোমার ছবি, আর চেনা যাবে না,—তবু—")

—"তবু, ছি ছি, তবু আমার একটা মিথ্যে নামের মোহে কেন তুমি পড়ে থাকবে, অস্বীকার করবে জীবনের ডাক?"

—"কই অস্বীকার তো করতে পারি না, জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের বিরাট গ্রাসের দাবী তো মেটাতে হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে,—শুধু যাতে সর্বস্ব ভরে ওঠে,—সেই ভালোবাসার প্রয়োজনকেই কি শুকিয়ে রাখতে হবে?"

"নিশ্চয়ই না"—সুশান্তর গলায় সেই নিরুত্তাপ শান্তি।

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই না,"—রেগে কেঁদে ওঠে রমলা, উপুড় হয়ে বালিসে মাথা ঠুকতে ঠুকতে অঝোরে কাঁদতে থাকে। কেন সুশান্ত ওকে এখনো বুকে টেনে নিচ্ছে না,—আসছে না অভিমান ভাঙাতে, ওর এই বিষম লজ্জা কেন কেউ আদরে আদরে মুছে দিচ্ছে না। ওর মধ্যে যে এত ক্ষোভ, এত বিদ্রোহ, এত লোভ জমা হয়ে আছে, তাকি ও আগে জানত? লোভ? লোভ বই কি। বেঁচে থাকার লোভ, সুখের লোভ। প্রেম নয়, না এ প্রেম নয়। যদি প্রেম হোত, তাহলে মাথা তুলে গৌরবে দাঁড়াত রমলা, এত লজ্জা পেত না, এত লোভ বলেই এত লজ্জা। কিন্তু কাকে, সুশান্তকে নয়—না না, তাকে নয়, মৃতকে কে লজ্জা করবে? সে তো সরে গেছে, সেতো চলে গেছে জীবন থেকে। তবে কিসের ভয়, কাকে এত লজ্জা? পার্থ পার্থ। আশ্চর্য! ঐ এগারো বছরের বালককেই আজ সবচেয়ে বেশী সমীহ করে রমলা। সব চেয়ে ভয়। 'কিন্তু ও তো মানুষই,—মানবসন্তান', দূর থেকে যেন সুশান্তর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল। 'ওকে মানুষ হতে দাও। জীবনকে চিনতে দাও, মানুষ যে মানুষ, দেবতা নয়, একথা ওকে বুঝতে দাও।'

—না না, তা হবে না, কিছুতেই হবে না, পার্থের কাছে ও দেবতা সেজেই থাকবে। সেই বিষম লোভের জন্যেই আর সব লোভ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে ওর মন, বুঝতে পারল রমলা। অন্য যেখান থেকে খুশী জীবনের যত ইচ্ছে পরিচয় সংগ্রহ করুক পার্থ,—চিনতে শিখুক মানুষকে, কিন্তু তার কাছ থেকে নয়। পার্থর মানুষ চেনার রিসার্চ ল্যাবরেটারীতে রমলাই তার প্রথম অভিজ্ঞতা হতে চায় না। যত তুচ্ছ, যত সাধারণ মানুষই হোক রমলা, পার্থর চোখে সে চিরদিন দেবী সেজেই থাকতে চায়, চিরদিন। দেবীর সাজ যদি ছিঁড়ে যায়, রোদে জলে রং যদি মুছে যায়, তবু অন্তর থেকে রং দিয়ে সে তাকে বার বার পালিস করে ছেঁড়া সাজ রিপু করে রাখবে। কিছুতেই জানতে দেবে না যে, ও দেবী নয়, শুধু প্রতিমা। শুধু একটুখানি মোহ, একটুখানি মায়া, একটুখানি আলো, আর অনেকখানি কাদামাটি খড়।

কতক্ষণ ধরে এমনি করে নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে করে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, খেয়াল ছিল না রমলার। ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের ঘণ্টায়—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। এত ভোরে ফোন করছে কে? আলস্য মন্থর মনে যে নামটা প্রথমেই মনে পড়ল, সেই নামটা মনে পড়েই হঠাৎ বুক কেঁপে উঠল রমলার। দ্বিধা হোল ফোন ধরতে। আধখোলা পর্দ্দার ফাঁকে বন্ধ কাঁচের মধ্যে দিয়ে একখানি পাণ্ডুর আকাশের ছায়া ওর চোখের সামনে কাঁপতে লাগলো। হাতে পায়ের এক ধাক্কায় লেপকম্বল আর নিদ্রালসতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রমলা উঠে এসে ফোন ধরল। হ্যালো, হ্যালো, মিসেস রায়! আচ্ছা, কথা বল। কে আবার ডাকছে দূর দেশ থেকে। হ্যালো রমলা!...ওঃ মামাবাবু! "খুব অবাক হয়েছিস তো?" ওপার থেকে প্রবল হাসির বন্যায় এপারে রমলার সব দুঃখ যেন মুহূর্তের জন্যে ভেসে গেল। মামাবাবু ফোন করছেন প্যারিস থেকে। "হঠাৎ প্যারিসে কি করতে? ওঃ হো, তোমার সেই বক্তৃতা দেবার নেমন্তন্নটা এতদিনে পাকল? কত টাকা দেবে মামা? টাকা বেশী নয়, সম্মান পাওয়া যাবে কিছু! দেশে যা মিলল না এতকাল। যাই হোক বক্তৃতার পরে কিছু গান শোনান দরকার—প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্র্যাশন। শুধু মামার ভারী মোটা গলায় হবে না, মেয়েলী গলা চাই। রমলা কিম্বা কৃষ্ণা যে কেউ হলেই হবে, কিম্বা দুজনে হলে আরোও ভালো। অধিকন্তু ন দোষায়। "আরে Paris একবার না দেখলে তো দেখলে কী!" মামাবাবুর স্বচ্ছ রসিকতার হাসি শেষ হতে না হতে তিন মিনিট সময় পার হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল টেলিফোনের যোগ।

রমলার ফোন পেয়ে কৃষ্ণা খুশীতে উচ্ছল হয়ে লণ্ডনে চলে এল। ডীনের কাছে অনুমতি পেতে দেরি হয় নি। কৃষ্ণা আজকাল সব সময়েই খুশীতে ডগমগ করে। ও যেন হঠাৎ একজোড়া পাখা পেয়েছে, উড়ে যেতে বাধা নেই। কৃষ্ণা এসে রমলাকে জড়িয়ে ধরল। "মামী চল!" কিন্তু রমলা রাজী হোল না। প্যারিসের বদলে সে দেশে যাবার প্যাসেজ বুক করেছে। আর মাস দেড়েক মাত্র সময় আছে। "সে যখন যাবে, যাবে, আপাতত প্যারিসটা দেখে আসবে চল।" "না রে," আড়মোড়া ভেঙে রমলা বললে,—"আমার আর তাগদ নেই। তুই যা, খুব enjoy করে আয়। বুড়ী মামীকে সঙ্গে নিয়ে প্যারীতে গিয়ে তোর কী মজা হবে?"

"ঈস্, তুমি নাকি বুড়ী?" কৃষ্ণা রমলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল,—একী চেহারা হয়ে গেছে ওর। কি রকম যেন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে রোগা

রোগা, যেন মূর্তিমতী বিরহ। অন্তত কৃষ্ণার তাই মনে হোল হঠাৎ—কেন কে জানে। ফরসা মুখের মধ্যে রমলার বিশেষত্ব ছিল, কালো পক্ষ্মঘেরা কালো চোখ। খুব বড় নয়, কিন্তু খুব কালো লম্বা লম্বা বাঁকানো পক্ষ্মঘেরা। সেই চোখ ছুটো, কৃষ্ণার মনে হোল যেন হঠাৎ সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছে। সব সময়েই যেন ভিজে ভিজে। "মামী, একি চেহারা?" কৃষ্ণা অবাক হয়ে বললে, "অসুখ বিসুখ কিছু বাঁধিয়েছো নাকি ভিতরে ভিতরে?" "খুব বুড়ী বুড়ী কথা শিখেছিস তো?"—রমলা হেসেছিল। কিন্তু কৃষ্ণার মনে হোল, সে হাসি যেন কান্নার জলে ভরা। কেন, কেন অমন কান্নার মতন হাসল মামী?

প্যারিসের পথে, ছোট স্টীমারের ডেকে বসে বসে কুমারের ছবি ছাপিয়ে বার বার মামীর চেহারাটা ভেসে উঠল কৃষ্ণার মনে। কি হয়েছে মামীর? কৃষ্ণা অবাক হয়ে ভাবল, প্রেমে পড়ল নাকি হঠাৎ মার্কাসের সঙ্গে? জলের ঢেউএর সঙ্গে উড়ে উড়ে যাওয়া সমুদ্র পাখীর দিকে তাকিয়ে থাকা কৃষ্ণার মনটা হঠাৎ এই সম্ভাবনার কথায় যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর বুকের মধ্যে আর্ত একটা স্বর ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, মামা, মামা, মামা! কৃষ্ণা যে তার মামীকে এত ভালোবাসত তা আগে বুঝতে পারেনি। আজ তার চিরবিদায়ের সম্ভাবনায় মনটা আর্ত হয়ে উঠল। চিরবিদায়ই তো। এতদিন মৃত্যু হলেও তবু কোথাও যেন মামা একটু বেঁচে ছিলেন। আজ যদি রমলার স্মৃতিলোক থেকেও তাঁর নির্বাসন হয়, তবে কোথায় আর সে রইবে?

প্যারিসে এসে কিন্তু রমলাকে ভুলে গেল কৃষ্ণা। হৈ-হৈর মধ্যে ডুবে গেল। লোকজন, কথাবার্তা, গানের rehearsal, সঙ্গীত সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা, সব মিলিয়ে সম্মানের একটা ছোটখাট ঘূর্ণী হাওয়া যেন কৃষ্ণাকে হঠাৎ মাটি থেকে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। কত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হোল তার ঠিক নেই। সবচেয়ে ভালো লাগল শ্রীমতী আর্মস্ট্রংকে। ভদ্রমহিলা এক প্লেনে মামাবাবুর সঙ্গে প্যারিসে এসেছেন,—পাশাপাশি বসে। মামার এই ইণ্টারেস্টিং বক্তৃতার কথা শুনে ইংল্যাণ্ডে সোজা না গিয়ে ফ্রান্সেই নেমে পড়েছে, আর অন্য কোথাও না উঠে মামাদের সঙ্গে এই ইণ্টারন্যাশন্যাল গেস্ট হাউসেই এসে উঠেছে।

কৃষ্ণাকে এসে ওর ঘরই শেয়ার করতে হোল। ভদ্রমহিলার যেমন উৎসাহ, তেমনি শখ। এদেশের সব মেয়েরাই অবশ্য খানিকটা এইরকম। তবু কৃষ্ণার ভালোই লেগেছিল এখানে এসে একটি মেয়ে সঙ্গিনী পাওয়ায়। কিন্তু ওর ডাকনামটা শুনে চমকে উঠেছিল কৃষ্ণা,—মেরী। সেই মেরী নয়ত। হঠাৎ সেই একলহমার দেখা মেরীর ছবিটা মনে করতে চাইল কৃষ্ণা; মনে পড়ল না। না, সে বোধ হয় আরো অনেক রোগা ছিল, আরো অনেক তীক্ষ্ণ। কে জানে, কুমার যদি আসত ওর সঙ্গে, অন্তত মেরী নামটা নিয়ে ঠাট্টা করা যেত। কিন্তু এসব কথা বেশীক্ষণ ভাবার সময় পায়নি কৃষ্ণা। দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

প্যারিসে মামাবাবুর আস্তানা ছিল একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। বাড়ীটা একেবারে সাঁজেলিজার উপরে। পাশ দিয়ে চলে গেছে অন্য একটা সাধারণ রাস্তা। সেদিন সারাদিন শ্রীমতী আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এখানকার বাকী দ্রষ্টব্যগুলো সব দেখে নিয়েছিল কৃষ্ণা। সন্ধ্যে-বেলায় ফিরে এসে যখন ছোট বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়াল, তখন ক্লান্তিতে দুজনেরই দেহ অবশ হয়ে আসছিল। তবু ওরা তখনি শুতে যেতে পারল না। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণা দেখল,—বিশাল "সাঁজেলিজা" উধাও চলে গেছে নেপোলিয়ানের বিজয় তোরণ পার হয়ে। তার মসৃণ কালো রং অজস্র আলোয় ঝলমল করছে। কালো বলে চেনা যাচ্ছে না। রাস্তার আলো, পাশের বিরাট বাঁধানো পেভমেণ্টের উপরে পানশালার বিচিত্র আলো, গাড়ীর পরে গাড়ীর বিরাট মিছিল থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়া ফুলঝুরির মতন আলো,—সব মিলিয়ে দারুণ একটা চোখ ধাঁধানো সমারোহ। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কৃষ্ণার চোখ জ্বালা করে উঠল। হঠাৎ একটা অর্থহীন কথা মনে হোল,—এত সবের কি দরকার? থামের গায়ে হেলান দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল,—"কেন, কেন? এত কেন? এতসবের কি প্রয়োজন? এর চেয়ে ওয়ার্ডসোয়ার্থের সেই ছোট্ট বাড়ীটি কত বেশী সুন্দর! ওরকম দুখানা ছোট ঘরে যদি কৃষ্ণা থাকতে পেত, অমনি ছোটখাট লতাকুঞ্জ দিয়ে ঘেরা। পাশ দিয়ে বয়ে যেত নদী, আর তাতে খেলা করত হাঁস। আঃ অমনি একটা জায়গায় যদি

কুমারকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারত! যেখানে থাকত সেই—"গাছটীর স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা, ঘরে আনা গোধুলিতে সন্ধ্যাটির তারা।"

সেদিন রাতে, পাঁচতলা ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে প্যারিসের বৃহত্তম রাজপথের উপর দিয়ে দ্রুতধাবমান গাড়ীর মিছিলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কৃষ্ণার দেশের জন্যে মন কেমন করে উঠল,—সেই স্নিগ্ধ ছায়াঘন ভারতবর্ষের জন্যে। সে ভারতবর্ষ কি কোথাও আছে? নাকি শুধু কবিতায়, শুধু কল্পনায়? যে সত্যি ভারতকে কৃষ্ণা জানে, দারিদ্র্যে আর হতাশায় মর্মে মর্মে পীড়িত। যার প্রতি ত্যাগের আহ্বান, আজ আর শুধু নিরুপায় ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। সেই তেলকালি কাদা গোবরে মাখামাখি হয়ে খোলা ড্রেনের দুর্গন্ধের মধ্যে দিয়ে দুর্বিষহ জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে যে ভারত উদাসীনতার সাধনা করছে, তার জন্যে কৃষ্ণার মন কেমন করছে না। সে ভারত মিথ্যে,—তাকে কৃষ্ণা চিনতে চায় না। তবু সে ভারত যখন ভিখিরী সেজে ওকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে একটানা সুরে কাঁদতে থাকে, তখন সেই ভারতকে প্রাণপণে এড়াতে চায় ও। সে ভারত ওর জন্যে নয়, ওর কাছে সে একান্ত মিথ্যে। তার চেয়ে এই ভারতই অনেক বেশী সত্য, এই যেখানে শাশ্বত ভারতের শাশ্বত কবি ছোট একটি কুঁড়েঘরের ছবি আঁকেন। যে কুটীর ঘিরে আছে ছোট্ট একটুকরো আশা। সেই দেশ, সেই ঘর হয়ত বাস্তবে কোথাও নেই। বাস্তবের কুঁড়েঘরে হয়ত আছে শুধু অস্বাস্থ্য আর অন্ধকার; হয়ত সে ঘর আছে কেবল কবির মনে, তবু সেই দেশই কৃষ্ণার সত্য। তারি জন্যে এই মুহূর্তে ওর মন কাঁদছে।

মেরী আমস্ট্রং বোধ হয় নিজের অজান্তেই অপেক্ষা করছিল,—কৃষ্ণা কিছু বলবে; ওকে নিঃশব্দ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর চোখে সুদূরের স্বপ্ন। মেরী হেসে উঠল,—ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,—"কি ভাবছ কৃষ্ণা?" অপ্রস্তুত কৃষ্ণা বললে,—"বিশেষ কিছু নয়।" "তবু বল না শুনি,—দেখে মনে হচ্ছিল তুমি স্বপ্ন দেখছ?"

কৃষ্ণা বললে,—"স্বপ্ন? তা বটে।"

মেরী বললে,—"একদিন তোমার বয়স আমার ছিল। তখন আমিও স্বপ্ন দেখেছি। তাই মিলিয়ে দেখতে চাই আট বছরের তফাতে স্বপ্নেরও বেশ বদল হয় কিনা।"

কৃষ্ণা—"কিন্তু এ তো শুধু কালের তফাৎ নয়, দেশেরও তফাৎ। আমার স্বপ্নে হয়ত থাকবে গরম দেশের আশা।"

মেরী—"না, সত্যি বল কি ভাবছিলে?"

কৃষ্ণা—"ভাবছিলাম, এত সবের কি প্রয়োজন?"

—"কি এত সব?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মেরী। নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল কৃষ্ণা; বিশাল রাজপথের দীপ্ত রংমশালের দিকে তাকিয়ে বলল,—"ঐদেখ ঐ সব,—এত, এত? মানুষের প্রয়োজন কত কম,—তার জন্যে এত কেন? আমি তাই স্বপ্ন দেখছিলাম ছোট একটি কুঁড়েঘরের, স্নিগ্ধছায়া ঢাকা ফুলের গন্ধে ভরা। তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে নদী, আমি সেখানে ছোট উনুনে রান্না করে তাকের উপরে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখব। আর বিকেল বেলায় চাঁপা ফুল কুড়িয়ে এনে খোঁপায় পরব।"

মেরী বললে, "আচ্ছা কৃষ্ণা, তোমার কথাগুলো আমার যেন কেমন শোনা শোনা মনে হচ্ছে,—এই যে কুঁড়েঘরের স্বপ্ন—কোথায় শুনেছি বলতো? A little hope for a little hut.

—"তাই নাকি? শুনেছ বুঝি? তোমার নিজের মনের কথাই শুনেছ? সব মানুষের মনে মনেই কোন-না-কোন সময়ে এই সব ছোট আশাগুলো কথা বলে।"

—"আচ্ছা কৃষ্ণা, তোমার স্বপ্নটা সুন্দর বটে, কিন্তু কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া। তোমার স্বপ্নে কোন পুরুষ নেই?"

—"আঃ, আছে বই কি?" কৃষ্ণা হাসল, এতক্ষণের অবসন্ন বিষাদের মেঘ কেটে গেল। দূরে কোন গির্জায় কত রাত্রের সঙ্কেত হোল কে জানে। কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বললে,—"আছে বই কি? তাকে ঘিরেই তো আশা, আর ভালোবাসা,—তার জন্যেই তো ঘর।"

—"কে সে, নাম বল?"

"বাঃ," কৃষ্ণা হাসল, ওর সেই স্বপ্ন বাসরের সোনার পুরুষ ওর মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে রং ছড়াল চোখে মুখে; কৃষ্ণা বলল, "আজ থাক, আর একদিন বলব।"

ওরা মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এসে পাশাপাশি খাট দুটোতে শুয়ে

পড়ল। খুট করে বেডসুইচ টিপে কৃষ্ণা বললে, "গুডনাইট।"

হঠাৎ লেপের ভিতর থেকে মাথা বার করে মেরী বললে,—"কৃষ্ণা, জানো এইবারে মনে পড়েছে ; তোমার স্বপ্নটা এতক্ষণ ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল। আচ্ছা বলতো, ঐরকম কোন গান কি কবিতা আছে তোমাদের ?"

"কি করে জানলে যে, ঠিক এই কথাটাই একটা ছোট কবিতায় ধরা আছে ?"

"ও, তাই বল !—আমি সে কবিতা শুনেছি,—আমার সেই বন্ধুর কাছে। সেই যে, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম, যার মধ্যে আমি ভেবেছিলাম আমার ভালোবাসা সত্য হয়ে উঠেছে।"

"তবু যাকে বিয়ে করনি ?"

"হ্যাঁ সে-ই," মেরী হাসলে,—"ভাগ্যে করিনি, নাহলে হয়ত এতদিনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। তার প্রতি আমার যেমন একটা গভীর টান ছিল, তেমনি অন্যদিকে ছিল একটা দূরে ঠেলে দেওয়া। এই দুই বিপরীতের টানাটানিতে বোধ হয় আমরা দুজনেই অন্তরে অন্তরে পীড়িত হতাম।"

কৃষ্ণা বললে,—"সেদিন তো তার কথা ভালো করে কিছুই বললে না,—আচ্ছা তুমি কি এখনো তাকে ভালোবাসো ?"

—"নিশ্চয়ই, ভালোবাসা কি এতই সহজে মুছে যায় ? তবে স্বামী হিসেবে আমার স্বামীর তুলনা হয় না,—তাকেও আমি খুব ভালোবাসি। থাক্ সে কথা।"—

—"না না, বল ?"

—"কি শুনতে চাও ?"

—"কে তোমার সেই বন্ধু ? সেদিন বলেছিলে সে বিদেশী। তখন অত খেয়াল করিনি,—সেকি ভারতীয় ?"

—"শুনেই কি বোঝনি,—শুধু ভারতীয় নয়,—তোমারি মত বাঙালী।"

হঠাৎ কৃষ্ণার রাত্রিবাসপরা ক্ষীণ শরীর কম্বলের ভিতরে থর থর করে কেঁপে উঠল—একটা তীব্র আশঙ্কাকে ওর মন ভালো করে বোঝার আগেই, ওর দেহের জৈব কণারা বুঝে নিয়েছে। কষ্টে কাঁপুনি থামিয়ে কৃষ্ণা বললে,—"মেরী আজ বল,—তার নাম কী ?"

—মেরী বললে,—"বলব, বলব,—হঠাৎ আজ কেন জানি তার নাম করতে ইচ্ছে করছে,—তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেন বার বার তার

কথা মনে পড়ছে? সেকি তোমরা দুজনেই বাঙালী বলে? নাকি সে তোমার কোন আত্মীয়? তোমার কথায় তার কথায় কোথায় যেন কেমন একটা মিল আছে।

কৃষ্ণার সারা দেহ যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠল,—অধীর আবেগে কৃষ্ণা বললে,—"বল, বল, তার নাম বল।"

একটু হেসে মেরী বললে,—"বলছি বলছি,—তার নাম কুমার।"

ঠিক এই নামটাই শোনার জন্যে বোধহয় এতক্ষণ ধরে কৃষ্ণার সমস্ত সত্ত্বা উত্তেজিত হয়েছিল। যবে থেকে মেরী তার গল্প বলেছে কৃষ্ণাকে, তবে থেকেই এই নামটার ছায়া প্রেতের মত যেন কৃষ্ণাকে পেয়ে বসেছিল। স্পষ্ট করে বোঝেনি,—তবু হয়ত একদিন এই নামটা শুনতে হবে, এমনি একটা আশঙ্কা ওর অবচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল,—তাই একদিন শুনতে চায়নি নামটা। আজ কেন এ দুর্মতি হোল তার, কে জানে? কেন শুনল? কেন শুনল? নামটা শোনামাত্র কৃষ্ণার সমস্ত শরীর যেন শক্ত হয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই আধবসা শরীরটাকে আবার কম্বলের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে, কৃষ্ণা চোখ বুঝল। বাস আর কিছু করার নেই,—আর কিছু শোনার নেই। সব কথা সব শোনা একটা বোবা যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে গেছে। কৃষ্ণা বুঝতে পারল না এত কষ্ট হচ্ছে কেন? দুঃখ শোক তো মনের কষ্ট,—তার জন্যে প্রতি রক্তবিন্দু কেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে দেহের বন্ধন থেকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মেরী বলল,—"কই বললে না তো, কৃষ্ণা, নামটা তোমার কেমন লাগল?"

কৃষ্ণা বলতে গেল—'ভালো', কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। কি একটা রুদ্ধ আওয়াজ গুমরে উঠল, বোঝা গেল না। একমুহূর্তে ওর গলা ভেঙে গেছে। মেরী চমকে বললে,—"কি হোল?" রুদ্ধ আবেগ দমন করে, অনেক কষ্টে গলা একটু পরিষ্কার করে ভগ্ন স্বরে ফিসফিস করে কৃষ্ণা বললে,—"হঠাৎ কেন যেন গলা ভেঙে গেল।"

মেরীর মনে হোল,—কৃষ্ণা হয়ত রাগ করেছে। এত রাত অবধি ওকে জাগিয়ে রেখে গল্প করা অন্যায় হয়েছে। সত্যি যদি ওর গলা না সারে,—কাল কি করে গান গাইবে বেচারী,—এত আয়োজন সব পণ্ড হবে,—আঃ,

ঈশ্বর করুন যেন ভালো হয়ে যায়। কাল সকাল থেকেই ওর গলার তোয়াজ শুরু করতে হবে। মেরী তাকিয়ে দেখল, কৃষ্ণা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর চাদর ঢাকা কম্বলটা টেনে দিয়েছে নাক চোখ ঢেকে। যেন পণ করেছে আর মুখ দেখাবে না কাউকে। কপালের আধখানা খোলা, তাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হঠাৎ ওর এমন শরীর খারাপ হোল কেন? সাদা চাদরটা বিশ্রীভাবে মুখ ঢেকে পড়ে আছে, দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হোল মেরীর,—ইচ্ছে হোল ওর কপালে একটু হাতবুলিয়ে দেয়, কিন্তু ওর ওই শুয়ে থাকার মধ্যে যেন অকুল সমুদ্রের দূরত্ব নেমে এসেছে, কেমন যেন একটা কঠিন,—কঠিন ভঙ্গী। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেরী,—কৃষ্ণা জানতে পারল না সে কথা। ওর মনের মধ্যে তখন অশান্ত প্রার্থনা পাগল হয়ে উঠেছে,—একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি, একটু শুধু ঘুম চায় ও,—হে ঈশ্বর,—ঘুম দাও, শুধু একটু ঘুম,—মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে দিক সব যন্ত্রণা। মৃত্যু নয়, মৃত্যু চায় না কৃষ্ণা,—শুধু একটু ঘুম,—বাকী রাতটুকুর মত বিশ্রাম,—শুধু কিছুক্ষণের বিরতি।

কৃষ্ণার চিঠিতে প্যারিসের খবর পেয়ে কুমার ভেবেছিল দুদিনের ছুটি নেবে। হঠাৎ সমুদ্র পার হয়ে ওদের সভায় শ্রোতাদের আসনে বসে, কৃষ্ণার গান ও মামাবাবুর বক্তৃতা শুনবে, এবং সভার শেষে কৃষ্ণাকে ফুল ও কার্ড পাঠাবে। সে কার্ড পেয়ে কৃষ্ণা কেমন অবাক হয়ে ছুটে আসবে বাইরে, মনে করে, আপন মনে খানিকটা হেসে নিল কুমার। আপন মনে, কারণ সে হাসির ভাগ নেবার বিশেষ কেউ ছিল না। এডমণ্ড গিয়েছিল সমরসেট্-সায়ারে, দুদিনের ছুটি নিয়ে জোনের নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানে ভালো একটা হোটেলে জোন আছে দুটো ঘর নিয়ে। সেবারে ছুটির পরে ফিরে গিয়ে জোনের আর পড়াশুনোয় মন বসেনি। কেম্ব্রিজের ইতি করে, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকার যখন ভাবনা নেই, তখন কেন জীবনটা ভোগ করবে না ইচ্ছেমতো, এই হোল জোনের মত। সম্প্রতি সমরসেটে সমুদ্রের ধারে, একটা ভালো হোটেলে এসে আস্তানা গেড়েছে। আর পরিচিত সবাইকে ডেকে পাঠাচ্ছে। কুমারকেও অনেকবার আমন্ত্রণ করেছে যেতে। কিন্তু কুমারের সময় হয় নি। তাছাড়া কুমার যদি কখনো একদিনেরো

ছুটি পায়, তো, কষ্ট করে দূরপথ পাড়ি দিয়ে কৃষ্ণাকেই দেখতে যাবে, আর কাউকে নয়।

আশ্চর্য! কুমার অবাক হয়ে ভাবে, কৃষ্ণার কথা মনে হলেই মনটা এমন নরম কোমল হয়ে আসে কেন। স্নিগ্ধ একটা শান্তি, মুগ্ধ একটু স্নেহ মনের মধ্যে টলটল করতে থাকে। অবশ্য মেরীর কথা কখনো এমন ভাবে দূরে বসে ভাববার সময় পায়নি কুমার, মেরীর প্রভাব ওর চারিদিকে সব সময় বেষ্টন করে থাকত। আর যখন সে চলে গেল, তার তীব্রদাহে মনটা ছটফট করত। এমন মিষ্টি মিষ্টি আঙুরের মত টুপটুপে ছোট ছোট ভাবনায় রসিত হয়ে উঠবার সময় পেত না। তবু তো মেরীই ছিল মনের সবটা জুড়ে। কি করে মাত্র এই একবছরের মধ্যে সে ছবি মুছে গেল। আর সেই খালি জায়গায় ফুটে উঠল কৃষ্ণার ছবি। বোধহয় মেরী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল বলেই মন তাকে সরিয়ে দিয়েছে মন থেকে। এতই সহজে যদি ভালোবাসার ধ্বংস হয়, তবে কেন লোকে এই মিথ্যে কথা বলে যে, এ জগতে প্রেমই অমৃত। কুমার স্পষ্ট দেখ পাচ্ছে যে, অন্য সবকিছুর মতই প্রেমও নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর, মনে মনে তর্ক করতে করতে অদৃশ্য মামাবাবুর মুখের উপরে, এই রায় দিল কুমার। সেইজন্যেই এবারেও মামাবাবু শুধু প্রতিপক্ষ সেজেই রইলেন। কুমারের রায়ের উত্তরে বলতেই পারলেন না যে, প্রেম অমৃতই বটে, শুধু তার বিষয়গুলি ক্ষণিক, মানুষের বেলাতেও তো তাই। প্রতি মানুষই মর্ত্য তবু মনুষ্যত্বের অমৃতধারা।

কিন্তু প্যারিসে গিয়ে কৃষ্ণার গান শোনা এবারে আর কুমারের ভাগ্যে ঘটল না। হঠাৎ আপিসের কি একটা কাজ পড়ে গেল। কাজটা নিজে থেকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলেই বোধহয় তার প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধ দুটোই একটু বেড়ে গেছে। তাই কৃষ্ণাকে আশ্চর্য করে দেবার মত আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে কুমার একটা ট্রাঙ্ক কল বুক করে দিল। সেটা পেতে পেতে অবশ্য কৃষ্ণার দুপুর গড়িয়ে গেল। খাওয়ার পরে কৃষ্ণা একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল। এবিষয়ে মেরীর সঙ্কল্পই বেশী। কৃষ্ণাকে একটু ঘুমুতেই হবে, এই তার মত। সকাল থেকে ওর গলার পরিচর্যা করে মেরী ওকে প্রায় সারিয়ে তুলেছে। বাকী যেটুকু আছে, কৃষ্ণা ও মামাবাবু, দুজনেরই বিশ্বাস স্টেজে উঠলেই ওটুকু কেটে যাবে। কৃষ্ণা ভেবেছিল সকালে উঠে মেরীর

সামনে বেরুতে পারবে না। এমনকি তাকাতেও পারবে না। অথচ ভোর বেলা মেরী যখন স্নান গরম জল নিয়ে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল,—তখন হাসিমুখেই ধন্যবাদ দিল কৃষ্ণা। সারাদিন ও মেরীকে এড়াতে পারল না।

নিজের শক্তি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল কৃষ্ণা,—ও জানত কী যে ওর মধ্যে এত শক্তি আছে,—এত সংযম? নইলে শুধু মেরীর সঙ্গে কেন,—কারুর সঙ্গে কথা বলার মতই মনের অবস্থা ছিল না তখন কৃষ্ণার। ইচ্ছে করছিল চুপ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু তা তো হোলই না। বার বার মেরী এল সামনে। গলা ভাঙার জন্যে নিজেই ওকে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিল তাই রক্ষে। নইলে অবাক কাণ্ড। যে কোন কথা, যার সঙ্গে বলতে যাচ্ছে, অকারণে চোখে জল আসছে। সেই চোখের জল প্রতিবারই আড়াল করে, একটা বাজে বইএর মধ্যে চোখ মেলে দিল কৃষ্ণা। প্রাণপণে চেষ্টা করলে মনটাও ডুবিয়ে দিতে। এমন সময় খবর এল, ফোন এসেছে কৃষ্ণার। মেরী বললে, কৃষ্ণার সত্যি একটু ঘুমুনো উচিত এখন, ভক্তেরা কি আর সময় পেল না! কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে বিদেশী ডাক। ছুটে গেল কৃষ্ণা। মামাবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, কৃষ্ণা ফিরেও চাইল না। কিন্তু একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এল আনমনে, যেন কার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। সকাল থেকেই ওর আনমনা দীনভাব লক্ষ্য করেছিলেন মামা; এখন দেখলেন, তাতে খুশীর ঝিলিক; মামাবাবু গান ধরলেন,—"আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে?"

রাগের ভান করে কৃষ্ণা বললে,—"ভালো হবে না কিন্তু।"

—"হবে না মানে,—কত ভালো যে হয়েছে, সে তো তোকে দেখেই বুঝেছি। এক নিমেষে তোকে এত ভালো করে দিল কে রে ডাক্তারটি?"

—"যাও।"

—"যাব তো বটেই,—কিন্তু তার আগে তোর মুখে তার নামটা শুনে নিই।"

—"কি জানি!"

—"তাহলে আমিই বলি, একবার যাচাই করে নে।"

—"আঃ দাদু, ভালো হবে না বলছি।" কৃষ্ণা ছুটে এসে দাদুর মুখ চেপে ধরল।

"আচ্ছা, তাহলে নাম না হয় নাই বললি, শুধু বলে যা কি কথা বলে সে তোর সারাদিনের মান ভাঙালো ?"

—"ঈস্‌স্‌ !" কৃষ্ণা ছুটে চলে গেল ভিতরে। ঈস্‌, কৃষ্ণা কাউকে নাকি বলবে সে কথা ? কি করেই বা বলবে ? কথাগুলো না হয় বলে দিতে পারে,—কিন্তু গলার স্বরটা তো আর শোনাতে পারবে না,—যে স্বর শুনেই বুকের মধ্যে কি রকম করে ওঠে। কেমন যেন গুমগুমে গলার স্বর।

তেমনি স্বরে কুমার বলেছিল, "be brave কৃষ্ণা, মনে হচ্ছে, তুমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছ !" তেমনি ফিসফিস করে কৃষ্ণার অজান্তে কে তার গলার মধ্যে থেকে উত্তর দিয়েছিল,—"সে তোমার গলা শুনে।"

"মের্সি মাদামসেল মের্সি",—তেমনি গুমগুমে গলায় কুমার হেসেছিল। "জানো, কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্যারিসে যাব ভেবেছিলাম। সভার শেষে লুকিয়ে বসে থাকতাম,—গানের শেষে ছুটে এসে মামাবাবুর সামনে তোমায় এমন একটা কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানাতাম যে, তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যেত।" কৃষ্ণা উত্তর দিতে পারল না, অদ্ভুত একটা ভালো লাগায় ওর গলা বুজে এল, ভয় হোল, আবার পাছে স্বরভঙ্গ হয়। "কথা বলছ না কেন রাণী, কিছু বল।" সমুদ্রপার হয়ে কুমারের স্বর কৃষ্ণার কানের কাছে গুনগুন করে উঠল,—"কুমার, কুমার !"

—"কি হলো কৃষ্ণা ?"

—"কুমার, আমার ভয় করছে,—ভীষণ ভয় !"

—"সিলি, এটা তো কৃষ্ণারাণীর মত কথা হোল না।"

—"কুমার তোমার জন্যে, আমি ভারী একটা pleasant surprise ঠিক করে রেখেছি।"

—"কবে দেবে ?"

—"যত পারি দেরি করে দেব, কারণ সেটা এত ভালো যে, পেয়ে হয়ত আমাকেই ভুলে যাবে।"

—"সিলি !" কট্‌ কট্‌ করে তিনমিনিট শেষ হবার ইঙ্গিত এল ফোনের ভিতরে,—good luck কৃষ্ণা, good luck।"

কৃষ্ণার ভাগ্য সেদিন সত্যিই ভালো ছিল, গানগুলো উৎরে গেল,—বেশ একটু নাম হোল কৃষ্ণার। ক্ষুণ্ণ মনে কৃষ্ণা ভাবল, কুমার কেন

জানল না সেই কথা। তাই কৃষ্ণার খুশীর উপরে ছোট্ট একটু ছায়া দুলতে লাগল।

পার্থ লিখেছে,—"মা, তুমি যা ঠিক করেছ, তাই নিশ্চয়ই ভালো। তুমি আবার আমার মত চেয়েছ কেন? আমি বুঝি এতই বড় হয়ে গেছি? অবশ্য আমার একটু মন কেমন করবে। ছুটিতে তোমায় দেখতে পাব না। কিন্তু মাগো, এমনিতেই আমার মন কেমন করে। তুমি লণ্ডনে একা একা চাকরি করলে আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে তুমি দেশেই ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে দিদিমাকে নিয়ে থাক। একটা বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ী কোর মা। আমি তো আর সাত আট বছরের মধ্যেই একেবারে মানুষ হয়ে যাব,—তখন দেশে ফিরে শুধু তোমার কাছে থাকব! কি মজা! না মা? ও, একটা কথা জানাতে ভুলেছি। আমি একটা স্কলারশিপ পেয়েছি। তাহলে তোমার খরচ একটু কমবে। আর কিছু দিন পরেই তো আমি একটু একটু রোজগার করতে পারব। মাগো, আমার জন্যে ভেবো না। আমি সত্যি অনেক বড হয়ে গেছি। বারো বছর পূর্ণ হোলো, সোজা কথা? সেকাল হলে হয়ত আমাকে এতদিনে গুরুগৃহে গিয়ে গরু চরাতে হোত। তার চেয়ে মা, এই ভালো। এখানকার গুরুরা কিন্তু বেশ। বন্ধুর মত পিঠে চাপড় মেরে কথা বলে। একসঙ্গে সাঁতার কাটা, খেলাধুলো হৈ হৈ।

মাগো, আর চার বছর পরেই তো স্কুল থেকে বেরুব। তখন একসঙ্গে সায়ান্স আর ইলেক্‌ট্রোনিকস্‌ পড়ব। তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি পারব। আমার মাথায় পড়াগুলো যে কি করে জানা হয়ে যায়, কে জানে? ওরা অবাক হয়ে ভাবে, আমার কিছু ওরিয়েণ্টাল মন্ত্রতন্ত্র জানা আছে। বলে,—"ক্লাসের পড়া আর তোমায় পড়তে হয় না,—একবার পড়েই অমনি লিখতে পারো কি করে?" আমি চট্ করে জামার ভিতর থেকে পৈতেটা বার করে দেখাই, এর জোরে। ওরা ভয়ে ভয়ে চুপ করে যায়। মাগো আমি অনেক কিছু শিখতে চাই, অনেক অনেক কিছু,—তারপরে দেশে ফিরে যাব। কচের মত দেশের জন্যে নিয়ে যাব সঞ্জীবনী

বিদ্যা। সেই বিদ্যায় মরাদেশ বেঁচে উঠবে,—ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠবে। মা, তুমি দেখতে পাবে সেই আশ্চর্য ঘটনা। তারজন্যে তোমাকে আর আমাকে অনেক কষ্ট সইতে হবে, মা, অনেক অনেক কষ্ট। মাগো, তুমি দেশেই চলে যাও। দেশের কথা আমাকে লিখো। আর স্কলারশিপ পেয়ে যে তোমার এত টাকা বাঁচিয়ে দিলাম, তারজন্যে আমাকে মাঝে মাঝে পাঠিও বাংলা বই।

মাগো, বইএর কথায় সেই ফিলিপ সিড্‌নীর কথা মনে পড়ল। ও যাবে তোমাকে বই দেখাতে। তা না হয় গেল,—কিন্তু আমাকে যে কেন এমন চিঠি লেখেন, যত সব অদ্ভুত প্রশ্ন, কি জবাব দেব ভেবে পাইনা। মা, তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, পাগলা সায়েবকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। বেচারার হিমালয় দেখবার এত শখ যে, নিজের যা কিছু আছে বিক্রি-টিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে রাজী হয়ে যাবে। আর হিমালয়ে গিয়ে একবার সন্ন্যেসী হয়ে বসলে তো আর আমাকে চিঠি লিখতে পারবে না। না না, বেচারীকে নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। ওকে আমার ভালো লাগে, মা,—ও আমাদের দেশকেও বেশ খানিকটা ভালোবেসেছে। মাগো, আমি প্রিনসিপ্যালকে বলেছি তোমার কথা। তিনি রাজী হয়েছেন। আমি সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসে তোমাকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসব।"

চিঠিখানা হাতে করে শুব্ধ হয়ে বসে রইল রমলা। এই ছেলের জন্যে সে ভাবতে বসেছিল। মানুষ হবেই, এই যার পণ, তাকে কিনা ডানা দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিল। ছেলেকে কি চিনত না রমলা? চিনত বই কি। তবে ছেলের দোহাই দিয়ে বিলেতে থাকবার প্রয়োজন কি ছিল। নাকি ওটা একটা আধুনিকতার ঝোঁক? নিজেকে বিচার করতে চায় রমলা,—না সবটাই আধুনিকতা নয়; এই সুযোগে জীবিকার পথটাও সুগম করতে চেয়েছিল রমলা। আর সে পথ বোধ হয় এর মধ্যেই অনেকখানি খুলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি কাজের এতটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে মার্কাসের দৌলতেই। বেচারা মার্কাস এখনো জানে না রমলার প্ল্যান। তাই আজ তাকে নিমন্ত্রণ করেছে রমলা,—রীতিমতো টেলিফোন করে। ভদ্রতা করে মার্কাস বলেছিল,—"আবার চায়ের হাঙ্গামা কেন? এমনিই যাব এখন।" রমলা হেসেছিলো,—"পুরুষ মানুষরা ঘোর স্বার্থপর।

না খাওয়ালে ওদের দিয়ে কাজ পাবার যো নেই। চা তো বটেই। তারপরে গল্প করতে করতে যখন সন্ধ্যে হয়ে যাবে, একেবারে রাতের খাবার খেয়ে যাবে।"

—"ভিকিরি বিদায় করতে চাও বুঝি?" টেলিফোনের ওপাশ থেকে মার্কাসের গলা ভেসে এসেছিল।

রমলা বলেছিল,—আমাদের শাস্ত্রে বলে,—"অতিথি দেবতা।" মার্কাস বললে,—"আমি সাধারণ মানুষ। দেবতা হবার শখ নেই।" তার উত্তরে রমলা বলেছিল,—"আজ বিকেলে এসো কিন্তু!" এ অনুরোধ এড়ানো মার্কাসের পক্ষে শক্ত। তবু যেন নিরুপায়ের ভঙ্গী গলায় এনে বলেছিল,—আচ্ছা!

তবু মার্কাস আজ দেরি করছে। জানলা দিয়ে অক্টোবরের বিকেল এরি মধ্যে যাই যাই শুরু করে দিয়েছে। শীতের আমেজে হলদে হয়ে আসা পাতাগুলির কাঁপুনি যেন দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই শরতে হেমন্তে মেশামেশি দিনগুলি, এদেশে ভারী চমৎকার;—যেমন উদাস করা, তেমনি রহস্যময়! বসন্তের চেয়েও যেন এর নেশা বেশী। এমন দিনে রমলার ইচ্ছে করে মাঠে মাঠে খুব খানিকটা ঘুরে বেড়াতে। পার্কের ভিতরে, জলের ধারে,—একেসিয়া আর সোনাঝুরি গাছের নীচে নীচে;—নানা উড়ো কথা ভাবতে ভাবতে ঘুরে বেড়ানো। এ দেশের শহরগুলি ভারী মজার। যতই বাড়ীঘরে ঠাসাঠেসি, ইটপাথরে বাঁধাবাঁধি হোক না, ইচ্ছে করলেই এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়তে পারা যায়,—ছোট একটু পার্কের ফাঁকে। যেখানে কে জানে কেমন করে খানিকটা নীলাকাশ ঢুকে পড়ে আসর জমিয়ে বসেছে; আর গাছের পাতার গোড়া আলগা করে বাতাস উদাস হয়ে উঠছে।

সেদিন মার্কাসের আসতে প্রায় ছটা বাজল। "খুব দর বাড়ালে যাহোক", রমলা বললে। মার্কাস হাসল, "তা একটু না বাড়ালে, নিজের কাছেও নিজের মূল্য কমে যায়।" একটু আধটু গল্পের পরে মার্কাসের জন্যে খাবার সাজিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারে গিয়ে বসল রমলা। মার্কাস অবাক হয়ে বললে,—"তুমি খাবে না?" রমলা বললে,—"আমার খাওয়া হয়ে গেছে।"

—"বাঃ, আমাকে নেমন্তন্ন করে নিজে আগেভাগে খেয়ে বসে আছ?" রমলা হাসল। মার্কাস বললে,—"সে তাহলে অতি নগন্য কিছু খাওয়া!" রমলা বললে,—"ক্ষিদে আর লোভ দুটোই আমাদের সংযম করতে হয়।"

—"বল কি, ক্ষিদে আর লোভ, এই দুটোই যদি গেল, তবে আর রইল কী?"

—"কিছুই না।" রমলা হাসল,—"কিছু না'র সাধনা করতে করতেই ক্রমশ তার অন্তর্নিহিত 'হাঁ-টাকে দেখতে পাব,—এই আর কি!' 'নেতি নেতি' করেই সত্যের সন্ধান পাওয়া; 'না' এর অন্তরে 'হাঁ'।

মার্কাস রাগ করে বললে,—"ও সব আমি বুঝি না।"

রমলা হাসল,—"আমিও না,—শুধু আওড়াই।"

"তাতে লাভ?"

—"লাভ? তাতে অন্তত সত্য বলার দায় ঘোচে।"

—"সত্যটা কী?"

—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমলা বললে,—"সত্য এই যে, আমার মন ক্লান্ত; এই ক্লান্তি নিয়ে আবার নবজীবনের দ্বারে গিয়ে পৌঁছানো যায় না। অনেক সময়ে শখের খেয়ালে, ক্লান্ত মনও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা ফাঁকি।" ওর ক্লান্ত স্তিমিত ক্ষীণ দেহের দিকে চেয়ে পুরুষের চিত্ত মথিত হোল, প্রেমে ও করুণায়। ইচ্ছে হোল ঐ মেয়ের সব ক্লান্তি অল্প অল্প মৃদু আদরে মুছে দেয়। কিন্তু সে বাসনা সংযত করে মার্কাস বললে,—"রোমা, একদিন তুমি বলেছিলে,—তোমার জীবনকাহিনী আমায় বলবে। আজ বল।"

—"কাহিনী বিশেষ কিছু নেই মার্কাস, নেহাতই সাদাসিধে জীবন। তবে ওরি মধ্যে আর পাঁচজনের চেয়ে একটু হয়ত অন্যরকম। খুব ছোট করে, সহজ ভাষায় বলি,—ছোটবেলায় আমি একজনকে ভক্তি করতাম, তোমরা যাকে hero worship বল, অনেকটা হয়ত সেই রকম। তখন মনে করতাম ভক্তি। এখন মনে হচ্ছে, হয়ত সেটাও ভালোবাসাই। তাঁর জন্যে কিছু কাজ করতে পারলে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু তিনি আমাকে বড় সোজা সোজা তুচ্ছ কাজের ভার দিতেন। বোধহয় তিনি জানতেন আমার শক্তির পরিমাণ। রোজ আশা করতুম আজ তিনি আমাকে ডাক দেবেন—জীবন বিসর্জনের আহ্বান। রোজ সে আশা ব্যর্থ হোত। তাঁর পণ ছিল ইংরেজের হাত থেকে

মুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করবেন। কিন্তু ইংরেজের জেলখানায় তাঁকে শুকিয়ে মরতে হোল।

—"রোমালা!"

—"বল!"

—"সেইজন্যেই কি তুমি আমায় ভালোবাসতে পারো না?—আমি ইংরেজ বলে?" একটু দ্বিধা করে রমলা বললে,—"না মার্ক, ঠিক তা বোধহয় নয়। প্রথম প্রথম সেটা একটা বাধা ছিল বটে, পরে বুঝলাম, জাতের লড়াই হৃদয়ের পথে দেয়াল তুলতে পারে না। তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, তুমি ইংরেজ, তুমি সেই দলের প্রতিভূ, যারা আমার দেশের প্রতি অন্যায় করেছে।"

—"তবে?" মার্কাস বললে,—"তবে তুমি কি আমায় যথেষ্ট ভালো-বাসতে পারোনি?"

—"ঠিক তাই, মার্কাস, ঠিক তাই। তুমি ভেবো না আমি স্মৃতির দোহাই দিয়ে তোমার এই জীবন্ত বর্তমানকে অস্বীকার করতে চাইছি। আমার নিজের মধ্যেই আজ বিরোধ বেধেছে। আমার নারীধর্মে আর মাতৃধর্মে। আমার মধ্যে যে প্রিয়া আছে তার চেয়ে আমার মধ্যে যে মা আছে, সে আজ অনেক অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তোমাকে ভালোবাসি, মার্কাস, আজ স্বীকার করছি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে তোমার প্রেমের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিই। কিন্তু বার বার জয়ী হয়েছে আমার মাতৃত্ব। আমার এই ভালোবাসার দাবী সুখের লোভ অথবা বিশ্রামের আশার চেয়ে অনেক বড় মার্কাস। দেখছ না সেইখান থেকে আমার ডাক এসেছে," বলতে বলতে রমলার মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল,—"সত্যিকারের ডাক, একেবারে জীবন বিসর্জনের আহ্বান। আমাকে সুখভোগের আশা ত্যাগ করতে হবে মার্কাস,—বিশ্রামের বিলাস। এই হ্যাখ চিঠি, তুমি বাংলা বুঝবে না, নাহলে দেখতে পেতে কী আশ্চর্য সহজ ভাষায় পার্থ আমার কাছে কঠিনতম মূল্য দাবী করেছে। সে লিখেছে, আমাকে তার জন্যে কষ্ট পেতে হবে। অনেক অনেক কষ্ট আনন্দে বহন করতে হবে, তবেই তার তপস্যা সার্থক হবে। আমাকেও তার সঙ্গে সমান দুঃখ পেতে হবে।

জানো মার্কাস, একথা আমাকে কেউ বলেনি, কেউ না! শঙ্করদা-

আমাকে স্নেহ করতেন, কিন্তু আমার শক্তিকে তেমন করে বিশ্বাস করেননি নিশ্চয়ই, নাহলে কেন কিছুতেই আমাকে দেননি কোন দুঃসাধ্য কাজের ভার যা অন্য অনেককে দিয়েছেন। তারপরে সুকান্ত তো আমায় মাথার মাণিক করে রেখেছিল। কোন কষ্টের বাষ্পও যেন আমায় পেতে না হয় এই ছিল তার যত্ন। ওর আদরেই আমি নষ্ট হয়ে গেছি; জানো, তাই বোধহয় এখনো মেটেনি আদরের তৃষ্ণা। তোমার কাছেও যেন সেই জিনিসেরই আস্বাদ পেলাম। কতবার পাশে বসে যেতে যেতে মনে হয়েছে, যেন, তুমি আমার স্বামী। যেন তুমিও সুকান্তই, ভুলে গেছি তোমার জাত আলাদা, বর্ণ বিপরীত, তবু, তবু মার্কাস, তোমরা কেউ আমাকে সে জিনিস দিতে পারোনি, যা দিয়েছে আমার সন্তান। ও যে দিতে চায় না, নিতে চায়। আমার স্নেহ প্রেম, আমার কাজ-কর্ম, আমার চিরজীবনের যা কিছু সঞ্চয় সবই যে ওকে দিয়ে দিতে হবে! একেবারে দেউলে হয়ে দিতে হবে মার্কাস, কিছুই আর বাকী থাকবে না, সমস্ত উত্তরাধিকার ওর জন্যে রেখে দিয়ে নিবিয়ে ফেলতে হবে প্রাণের দাবী। বিনিময়ে ও কিছুই দেবে না,—কিছুই না!—শুধু নিয়ে খুশী হবে। খুশী মনে চলে যাবে সোনার তরী বেয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে। জানি, সে তরীতে আর আমার স্থান হবে না, তবু মার্কাস, তাতেই আমার মুক্তি। সর্বস্বপণ ছাড়া প্রেমের বন্ধন মোচন হয় না।

রমলার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল,—আর সেই জলের ছায়া মার্কাসের চোখের মধ্যে চিক্ চিক্ করে উঠল,—রমলার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে মার্কাসের বার বার মনে হোল, এ মুখ দেখার পালা শেষ হয়েছে তার। আর হয়ত কখনো দেখা হবে না। আস্তে আস্তে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে রমলা বললে,—"মার্কাস, যদি কখনো আমার জন্যে প্রার্থনা কর, তো বোল যে, এইখানে অন্তত যেন সার্থক হয় আমার জীবন, আমার প্রেম। এখানেও যেন আমি আমার স্বার্থের দাবী নিয়ে কাঁদতে না বসি। খোকার নবজীবনের তরীতে শুধুই ভরে দিই আমার ভালোবাসার পাথেয়, সেখানেও আবার নিজের বোঝাটা চাপাতে না যাই। কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে যেন ওর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে না চাই আমার দান। এই একটা জায়গায় অন্তত আমি যেন সর্বস্ব দান করতে

পারি,—একেবারে শূন্য হতে পারি। হঠাৎ আধভোলা গানের কলি রমলার মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠল।—'শূন্য করে, পূর্ণ কর, এ মোর কামনা।

বিহ্বলভাবে তাকিয়েছিল মার্কাস। যন্ত্রচালিতের মত বলল,—"রোমালা, তুমি চলে যাবে?" যন্ত্রচালিতের মত রমলা উত্তর দিল,—"হাঁ মার্ক, আমি চলে যাব।"

মা লিখেছেন কুমার যেন কৃষ্ণাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসে,—তার মুখখানা দেখবার জন্যে তিনি নাকি বেশী ব্যাকুল হয়েছেন। বিয়ে যখন ঠিক হয়েই গেছে, তখন আর কষ্ট করে মেয়ের একা পড়ে থেকে পড়া করবার দরকার কী? কিন্তু কৃষ্ণা লিখেছে,—"পাগল নাকি,—এসেছি যখন, Triposটা না নিয়ে যাব কেন?" কথাটা অবশ্য ঠিক,—কুমার নিজেও জানত। পরীক্ষাটা ওর দিয়ে যাওয়াই উচিত। তবু, তবু কৃষ্ণার চিঠির সুরটা যেন কেমন বদলে গেছে। প্যারিস থেকে ফিরে ও যেন একটু পর পর হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা লিখেছে,—এতদিন কৃষ্ণা অপেক্ষা করেছিল কুমারের জন্যে। এখন একবছর নাহয় কুমারই অপেক্ষা করুক কৃষ্ণার জন্যে। কুমার লিখলে,—"তোমার চিঠি পেয়ে আমার মন কেমন করছে কৃষ্ণা! মনে হচ্ছে এ যেন আমার কৃষ্ণারাণীর চিঠি নয়। কে তোমার মন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল কৃষ্ণা?—তোমার সেই মেয়ে ভক্তটি নয় তো?" চিঠি পড়ে কৃষ্ণা এত হেসেছিল যে, চোখ দিয়ে শেষে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল,—"ওঃ কুমার! কেন তুমি মিছিমিছি মেরীকে ভালোবাসতে গিয়েছিলে?"

কুমার লিখেছে,—কৃষ্ণার কথামত সে অনেক চেষ্টা করে জাহাজের সীট বদলে রমলার সঙ্গে এক জাহাজে বুক করেছে। আর সেই জাহাজে কৃষ্ণার দেওয়া কোন আশ্চর্য উপহার কুমারের জন্যে অপেক্ষা করে আছে —সে কথা জানতে চেয়ে রস ভঙ্গ করবেন না কুমার। কিন্তু লণ্ডনে যাবার পথে কৃষ্ণাকে চায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কুমার,—ওকে একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে তবে কৃষ্ণার ছুটি।

কিন্তু কৃষ্ণা লিখেছে,—এখন থেকেই দেখা না হবার তপস্যা শুরু করা

যাক,—তা সত্ত্বেও যদি একবছর পরে কৃষ্ণাকে কুমারের মনে পড়ে, তবেই কৃষ্ণা যাবে আবার তার পাশে। কৃষ্ণা লিখেছে,—"তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা বুঝতে পারছি না কুমার! মনে হচ্ছে,—তোমার ভালোবাসা যেন আমি কেড়ে নিয়েছি,—কার যেন শূন্য আসন জোর করে দখল করে বসেছি, —তাই সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতুম। জানো কুমার, আজ আমি নির্ভয় হয়ে গেছি। যেই সাহসে বুক বাঁধলাম অমনি সব ভয় পালিয়ে গেল। জানো কুমার, তোমাকে হারাবার ভয়ও আর নেই। শুধু কষ্ট আছে,—তোমাকে একবছর না দেখার কষ্ট!"

এর উত্তরে কুমার লিখল,—"সাত তারিখে কেম্ব্রিজে পৌছব, স্টেশনে থেকো।" কৃষ্ণা লিখলে,—"না এলেই ভালো হোত।" তবু কুমার এলো আর নেমেই দেখল কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে। কুমার একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে,—"দেখ, তোমার বারণ না শুনেই চলে এলাম।" কৃষ্ণা উত্তর করল না,—শুধু চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকাল। কুমার বললে, —"খুশী হওনি,—এসেছি বলে?" কৃষ্ণা তেমনি চুপ করেই রইল,—ও কি বলে বোঝাবে যে কত খুশী হয়েছে। "তাহলে ফিরে যাই!"—কুমার পা বাড়ালো উল্টো দিকে। "না"—এতক্ষণে কৃষ্ণার মুখ থেকে একাক্ষর কথাটা বেরুতে পারল,—"না, যেও না।" —"তবে?"

—"তোমার জন্যে ঘর ঠিক করে রেখেছি। আজ রাতটা থেকে কাল যাবে,—যেমন কথা আছে।"

—"নাঃ, ফিরেই যাই! আমাকে নিয়ে হয়ত তোমায় অপ্রস্তুতে পড়তে হবে;"

—"বাঃ, তা কেন?" কৃষ্ণা এগিয়ে এসে কুমারের হাত ধরল,—"চলে গেলে কিন্তু আমি চেঁচাব,—আর লোকেরা অবাক হয়ে তাকাবে! চাই কি পুলিশও ডেকে আনতে পারে,—তাহলে ধরে নিয়ে যাবে গারদে!"

—"সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি!" কুমার না হাসবার চেষ্টা করে।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণা, পথের পাশের গাছের গায়ে একটু হেলে, কুমারের দিকে মুখ তুলে বলে,—"শাস্তি তো তুমি আমায় অনেক দিয়েছ কুমার।" কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনা কে যেন ঢেলে দিয়েছে কৃষ্ণার মুখে। সেই সোনার আলোয় দাঁড়িয়ে,

ঈষৎ প্রসাধিত সুন্দর মুখ কুমারের দিকে তুলে ধরে গোলাপী ঠোঁট গোল করে কৃষ্ণা বললে,—"শাস্তি তো তুমি আমায় অনেক দিয়েছ কুমার!" অমনি কুমারের বুকের মধ্যে বাসনা টনটন করে উঠল,—গুনগুন করে তারা বললে,—'এ কন্যে তোমার,—এ তোমারি জন্যে ভালোবাসার পাত্র ভরে বসে আছে।' কুমার বললে,—"কি করে?" অল্প দ্বিধা অল্প হাসি দিয়ে আড়াল করে কৃষ্ণা বললে,—"আমার আগে অন্যকে ভালোবেসে।"

—"ওঃ, সে কথা বুঝি আর ভুলতেই পারছ না?" কুমারের মুখ দেখে কৃষ্ণার বুক কেঁপে উঠল। কে বলে কৃষ্ণা কুমারের সম্বন্ধে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে। এই তো শঙ্কার ছায়া ঘনাল আবার!

সারাপথ দুজনে কথা কইল না। কুমার কেন কইলো না কৃষ্ণা জানে না। কিন্তু কৃষ্ণা কথা কইতে পারল না একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়। কুমার কি রাগ করেছে? রাগ ও অনুরাগের সেই ক্ষীণ তফাৎটা এখনো বুঝতে শেখেনি কৃষ্ণা। জানে না পুরুষের চেহারায় তার কি ছাপ পড়ে। নিজের অজান্তেই পথচলতি কৃষ্ণা পথের পাশে এক বিশাল রাজপুরীর সিংহদ্বার পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে। এ পুরীর অন্ধি-সন্ধি অলি-গলির কোন খবরই রাখে না ও,—জানে না এর কোন্ ঘরে কত সুর, কত আলো, কত রং। কোথা দিয়ে কোথায় যাবে, ভেবে দেখেনি কৃষ্ণা। ভরসা ছিল, বন্ধু হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আজ হঠাৎ কেন বন্ধু সরে যাচ্ছে পাশ থেকে। কৃষ্ণার হাতখানা ধরা দেবার জন্যে কাঁপছে,—কুমার কেন হাত বাড়াল না।

ছোট একটা রেস্তোরায় ঢুকে নীরবেই খেয়ে নিল ওরা। কৃষ্ণার ইচ্ছে ছিল, আজ ও কুমারকে একটু ভালো করে খাওয়ায়। কিন্তু সাহস করল না সে কথা বলতে। নিজে নিল শুধু এক কাপ কফি। মনের কোণে হয়ত আশা ছিল কুমার একটু সাধাসাধি করবে। কিন্তু কুমার যেন নজরই করল না। কি ভাবছে কুমার?

দাসী বিল নিয়ে এলে কৃষ্ণা ব্যাগ খুলল। সেটা কিন্তু নজরে এড়াল না কুমারের—"আমি এখনো বেকার হইনি কৃষ্ণা। তবে তোমার যদি আমার কাছ থেকে কিছু নিতে ইচ্ছে না হয় তো, অনায়াসে দিতে পারো তোমার কফির দাম; এক শিলিং।" টপ্ করে দুফোঁটা জল ঝরে পড়ল কৃষ্ণার হাতের উপরে। সেদিকে তাকিয়ে দেখল কুমার। বুঝতে পারল

না, কেন মিছিমিছি ওকে এত কষ্ট দিচ্ছে সে। কোথায় যেন শুনেছিল, এমন সব সাইকোলজিক্যাল কেস আছে, যারা যাকে ভালোবাসে, তাকেই কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। বাদশারা তো নাকি শোনা গেছে, একটু বেচাল হলেই প্রিয়তমাদের উপরে বেত চালাত। কুমারের কি সেই দশা হোল নাকি। নতমুখে কৃষ্ণা উঠে এল কুমারের সঙ্গে। সেদিকে চেয়ে স্নেহ-উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইল কুমারের বুকে। তার আগেই শুকিয়ে গেল কামনার তাপে। ইচ্ছে হোল, ওকে খুব কষে নাড়া দেয়,—এত জোরে, যে ওর চোখের সব জল ঝরে পড়ে,—মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোয় আর্তনাদের মত।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে চলল কৃষ্ণার বোর্ডিং হাউসের দিকে। এতদিন ধরে যত কথা জমেছিল দুজনের মনে, হঠাৎ কখন যেন হাওয়ায় উড়ে গেছে তারা। কোন কথাই আর খুঁজে পাচ্ছে না কৃষ্ণা,—কুমারকে বলবেই বা কী? কুমারের ইচ্ছে হোল এদেশের রেওয়াজ মত কৃষ্ণার হাতে হাত জড়িয়ে পথ চলে। কিন্তু ওকে ছুঁতে সাহস করল না কুমার। হঠাৎ যেন একটা অবোধ্য তীব্রতা ওর মনের মধ্যে আগুনের তাপ ছড়াতে লাগল। কুমার ভেবেও দেখল না যে, প্রেম আর কাম এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত কেন সব সময় এত মেশামেশি হয়ে থাকে।

কুমারের ঘরের সামনে এসে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল কৃষ্ণা। ইচ্ছে ছিল ঘরে ঢুকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়,—একটু বসে গল্প-টল্প করে। কিন্তু কুমার একটা ক্লান্ত ভঙ্গী করে হাত দিয়ে হাই চাপা দিয়ে বললে,—বড্ড ঘুম পেয়েছে কৃষ্ণা,—"গুডনাইট!" "গুডনাইট!"—কৃষ্ণার গলার মধ্যে কথা বেধে গেল, আর ওর চোখের সামনে কুমারের ঘরের দরজা খট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। কত কথা ছিল, বলা হোল না। আর বলা হবে কিনা কে জানে? সেই রাতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার চোখের উপরে অন্ধকার হতাশা হাহাকার করে উঠল। যাকে মনে হয়েছিল খেলা,—তাই হয়ত সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। একবছরের জন্যে ডেকে আনা খেলার বিরহ হয়ত চিরন্তন হয়ে রইবে! কে জানে আর দেখা হবে কিনা জীবনে!

রাতে একেবারেই ঘুমুতে পারল না কৃষ্ণা। যতবারই চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চায়, ততবারই কি একটা অনিবার্য আশঙ্কা চমকে চমকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। শেষে আর মনে থাকে না আশঙ্কাটা

কিসের। শুধু একটা অজ্ঞাত চমক ওর অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিতে লাগল। সকাল বেলাও ঘুম ভাঙল এমনি একটা চমকেই। কি যেন একটা হয়ে গেছে! কি যেন একটা করার কথা ছিল! ওঃ মনে পড়েছে,—কুমার এসেছে কাল বিকেলে, সারা সন্ধ্যে ওর সঙ্গে কথা বলে নি; আর আজ চলে যাবে, এখনি,—" এতগুলো কথা একসঙ্গে মনে পড়ে গেল।

হয়ত এতক্ষণে চলে গেছে। কেজানে, হয়ত ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে কৃষ্ণার,—কুমার যখন দরজায় টোকা দিয়েছিল, টের পায়নি। কিম্বা হয়ত, দরজায় টোকা দিতেও ভুলে গিয়েছে কুমার। চট্ করে ড্রেসিং গাউনটা পরে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা। কুমারের ঘরের দরজা কাল রাতের মতই বন্ধ। ওকি চলে গেছে? ধীরে ধীরে দরজার সামনে এগিয়ে এসে সিঁড়ির রেলীং ধরে দাঁড়াল কৃষ্ণা,—আর অমনি এদিকের স্নানের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল কুমার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট্। কৃষ্ণার মলিন চেহারার দিকে চেয়ে কুমার বললে,—"এ কী কৃষ্ণা, এখনো এই বেশ? যাবে না?" "যাবে না মানে? যাবেই তো ভেবেছিল,—এত কী দেরি হয়ে গেছে?" কৃষ্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘড়ির দিকে তাকাল কুমার,—"আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী আছে, এর মধ্যে তৈরি হতে পারবে না?" হঠাৎ কৃষ্ণার গলা ধরে গেল, কুমারের গলায় স্নেহের স্বর পেল বলেই কি? ভাঙা গলায় অস্ফুট চীৎকার করে কৃষ্ণা বললে—"না।"

"কি না? অবাক হয়ে কুমার বললে,—"তৈরি হতে পারবে না?"

"না না, না," কৃষ্ণা হঠাৎ হিস্টিরিক ভাবে চেঁচিয়ে উঠল,—"না না, তৈরি হব না, কোথাও যাব না,"—ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে করতে ঢুকে পড়ল কুমার, আর সেই শব্দে তীরবেগে উঠে বসল কৃষ্ণা,—দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে সেই মুখ হাটুতে গুঁজে কৃষ্ণা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, আর সেদিকে চেয়ে কুমার ভাবতে চেষ্টা করল তার অপরাধের পরিমাণ কতটা।

বিছানার একপাশে বসে পড়ে কৃষ্ণার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কুমার। ধীরে কৃষ্ণার দুঃখের বেগ কমে এল। লজ্জিত হয়ে মুখ মোছবার জন্যে শাড়ির আঁচল খুঁজে পেল না কৃষ্ণা, বিলিতী পোশাকের এই বড়

অসুবিধা,—আঁচল একটা থাকলে কাঁধের ওপাশ দিয়ে টেনে এনে চোখও মোছা যায়,—লজ্জাও কমে। যাই হোক আঁচলের অভাবে বালিসটাই তুলে নিল কৃষ্ণা,—তার ওয়াড়ের কোণায় চোখ মুছবে বলে। কুমার একহাতে বালিসটা ধরে নিয়ে অন্য হাতে নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে বললে,—"এই নাও,"—রুমাল দিয়ে মুখ চোখ মুছতে মুছতে অস্ফুট ধন্যবাদ জানাল কৃষ্ণা। তরল কণ্ঠে কুমার বললে,—"একটিমাত্র রুমাল ছিল, তাও দিলে নষ্ট করে!" মুখ নীচু করে হাসি কান্না দুই-ই একসঙ্গে গোপন করার চেষ্টা করে কৃষ্ণা কুমারের গতকালের কথার প্রতিধ্বনি করল,—"সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!" "মাত্র এইটুকু? বল কি কৃষ্ণারাণী,—মাত্র এইটুকু শাস্তি আমার পাওনা?" কান্নাভরা ফোলা চোখে ঈষৎ হেসে কৃষ্ণা মুখ তুলে চাইল। কুমারের চোখে কিছু কৌতুক আর অনেক স্নেহ। একটা গভীর নিঃশ্বাস কৃষ্ণার সর্বাঙ্গ নিশ্চিন্ত করে বয়ে গেল। কৃষ্ণা বললে, "ট্রেন মিস্ করলে তো?" কৃষ্ণার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কুমার বললে,—"এই মিসের জন্যে দুনিয়া মিস্ করা যায়,—ট্রেন তো অতি তুচ্ছ।" "বাজে কথা!"—কৃষ্ণা হাসল,—"জানা আছে সব।"

—"থাক জানা,—বল কৃষ্ণা, আমাকে ক্ষমা করেছ?" মাথা নেড়ে হাত টেনে নিয়ে কৃষ্ণা বলল—"মোটেই না!" কুমার হাসল,—"কৃষ্ণা, তুমি জানো না তোমার মধ্যে কি যাদু আছে। এ দিয়ে তুমি অনেক বড় বড় লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারতে! ভাগ্যে তুমি জানো না সেই খবর,—তাহলে আর আমার জন্যে কাঁদতে বসে থাকতে না।" "ভাগ্যিস"—কৃষ্ণা হেসে উঠল,—"ভাগ্যিস!" কুমারও হাসল। দুজনের নির্মল হাসিতে গত সন্ধ্যার সব মেঘ কেটে গেল। কুমার বললে,—"কৃষ্ণা, মেরীর কথা নিয়ে তোমার মনে কষ্ট আছে তো?"

—"মোটেই না,—বাঃ!"

—"মোটেই হ্যাঁ—বাঃ!"

—"বেশ, তাই কী?"

—"তাই বলছি, আর কোন উপায়েই তো ও ব্যাপারটা আমার জীবন থেকে বাদ দেয়া যায় না? যা ঘটেছে, তা ঘটেইছে।"

—"আমিও তো তাই বলি,—যা ঘটেছে তা ঘটেছে, তাই নিয়ে—"

—"শোন শোন," কুমার বাধা দেয়,—"যা ঘটেছে তা আর ফেরাবার পথ নেই। কিন্তু যা ঘটেনি তা ঘটতে পারে,—অর্থাৎ তুমি আর কারো প্রেমে পড়তে পারো।"

—"বড় বাজে বকো তুমি কুমার।"

—"বাজে নয়,—সত্যি, আমি ভেবে দেখেছি,—তাই তোমার করা উচিত। নাহলে এই একটা বিষয়ে অন্তত চিরকাল আমি নিজেকে তোমার চেয়ে হীন মনে করব। শেষে একটা complex দাঁড়িয়ে যাবে আমার,—কালকের রাগারাগিটা হয়ত তারি পূর্বলক্ষণ।"

—"আঃ কি যে বল কুমার,—তোমার কথা শুনলে মনেই হয় না যে, তুমি এতবড় একজন ইঞ্জিনীয়ার।"

—"তা না হোক, আমি তোমায় অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি, কৃষ্ণা, এই একবছর তুমি কষে প্রেম করে নাও,—তাহলে আমরা সমানে সমান হব।"

"থাম,—তোমার অনুমতি নিয়ে প্রেম করতে হবে, এমন দশা হয় নি এখনো।"

বিহ্বলভাবে কুমার বললে—"তবে?"

—"তবে," কৃষ্ণা বললে, "আমায় তৈরি হয়ে নিতে দাও লক্ষীটী,—নইলে পরের ট্রেনটাও মিস্ করব,—তুমি ততক্ষণ নীচে গিয়ে শ্রীমতী স্মিথের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, দেখ না যদি কিছু লাঞ্চ যোগাড় করতে পার।"

—"তাহলে তুমি দেরি কোর না।"

—"আমার এখুনি হয়ে যাবে।" কুমারকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে কৃষ্ণা তৈরি হতে গেল।

ট্রেনে ওদের সত্যি সত্যি ভাব হয়ে গেল। অনেক হাসি অনেক অভিমান অনেক মিষ্টি কথার লুকোচুরি খেলা ভাব। তখন এক মুহূর্তের জন্যে কৃষ্ণার ইচ্ছে হোল জিগ্যেস করে,—"কুমার, আবার যদি মেরীর সঙ্গে দেখা হয়? সে যদি বলে, সে স্বামী চায় না, তোমাকেই চায়, তাহলে?" কিন্তু কৃষ্ণা সেকথা উচ্চারণ করতে পারল না। মেরীর নাম করে সুর কেটে দিতে ওর মন সরল না।

লণ্ডনে দুটো দিন ঝড়ের মত কেটে গেল। মামাবাবুও এই জাহাজে যাচ্ছেন

দেখে কৃষ্ণার মন উতলা হয়ে গেল। "ওঃ দাদু, তুমিও যাচ্ছ? তাহলে আমিও চলে যাই, পরীক্ষা টরীক্ষা সব ফেলে।" মামাবাবু কৃষ্ণার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলেন,—"এ কী চেহারা হয়েছে রে? একেবারে বিরহিনী রাধে। তোকে দিয়ে দেখছি ভগবান্ গৌরীর মত তপস্যা শুরু করিয়েছেন। এখন কর আর একবছর তপস্যা! কেন কুমার কি মহাদেব নাকি রে? আমার তো মনে হয়, ওটা নেহাত রাস্কেল।" ঘাড় বাঁকিয়ে কৃষ্ণা বলল,—"যাও।"

পার্থর যত মন কেমন করছে, তত হৈ চৈ বাধিয়ে দিচ্ছে। মার্কাস বললে, "আমি পার্থকে একটা ঘড়ি কিনে দিতে চাই, রোমালা, তোমার আপত্তি নেই তো?" মৃদু হেসে রমলা বললে,—"আছে।"

—"আছে? ও!" "রাগ কোর না মার্ক, ভুল বুঝো না। ওকে খুব সামান্য কিছু, যেমন সস্তা কোন বই কিম্বা অল্প একটু চকোলেট (তাও খুব কম) ছাড়া আর কিছু দিও না। আমি চাই না যে, ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই ব্যবহার করে।"

—"হ্যাঁ মা, সেটা বিলাসিতা হবে। আমি তো জানি, আমি ব্রহ্মচারী। আঙ্কল মার্ক, তুমি ছাখোনি বুঝি আমার এই পুরোনো ঘড়িটা কি সুন্দর চলে।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মার্কাস বললে,—"পার্থ, আমাকে তোমার ছবির প্রিণ্টগুলি দেখাবে বলেছিলে যে?" "হ্যাঁ আঙ্কল,—দেখবে চল, সেগুলো কি ভালো উঠেছে।"

মামাবাবু বললেন,—পার্থকে তো রেখে চললি এই শুক্রাচার্যের দেশে,—কচের মত সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে। কিন্তু দেবযানীর কথা ভুলে যাস নি তো?"

—"তা আর কি করব মামা?" রমলা হাসে, "দেবযানী যদি কোথাও থাকে তো আছে। তার কথা ভেবে এখন লাভ নেই। সে একেবারে অন্য নাটক। তার জন্যে বিধাতা হয়ত দুসরা মালমসলা এরি মধ্যে যোগাড় করতে শুরু করেছেন, কে বলতে পারে।"

কুমার এসে বললে,—"কৃষ্ণাকে নিয়ে একটু বেরুতে চাই, ও কোথায়?"

"কোথায় আবার? মনে," মামাবাবু গেয়ে উঠলেন,—"মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ।" কৃষ্ণা তৈরি হয়ে এসে দাঁড়াল। "ও তাই বল, আগে থেকে সব ঠিক আছে। অথচ—"

—"বাঃ, মত চাইছি, এই ঢের,—" কুমার হাসলে, "তার উপরে আবার—" কৃষ্ণা বললে, "আমার কোটটা বোধহয় ফেলে এসেছি কেম্ব্রিজেই,—কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

—"ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।" রমলা ব্যস্ত হয়ে বললে,—"কোট না নিয়ে যেও না, আমারটা নিয়ে যাও।"

কুমার তাড়াতাড়ি বললে,—"তার দরকার কী, কোট একটা কিনে নিলেই তো হবে। লণ্ডন শহরে দোকানের অভাব নেই।"

—"বাঃ," অপ্রতিভ হয়ে কৃষ্ণা বললে,—"আমার তো গোটা তিনেক কোট আছে। আবার এখন একদিনের জন্যে কোট কিনে কি হবে?"

—"বাঃ," গম্ভীর হবার ভান করে কুমার বললে,—"নতুন কোট কিনে দেব বলে পুরোনো কোটটা কায়দা করে রেখে এলাম।" কৃষ্ণা বললে,—"না সত্যি, কোটের আমার কোন দরকার নেই।" মামাবাবু আবার এক কলি গেয়ে উঠলেন,—"তোমায় কিছু দেব বলে, চায় যে আমার মন,—নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।"

অনেকদিন পরে রমলা হেসে উঠল, খোলা প্রাণের হাসি,—"বিয়ের আগেই যা পারিস আদায় করে নে কৃষ্ণা! একবার বিয়ে হয়ে গেলে আর পুরুষ মানুষরা সহজে কিছু খসাতে চায় না।"

মামা বললেন,—"তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু, দুঁহু দোঁহা পানে চেয়ে বসে থেকে সন্ধ্যেটা উতরে দিও না। তাহলে ইতরজনের জন্যে যে মিষ্টান্নটুকুর ব্যবস্থা রেখেছিস তাও যাবে।"

কুমার আজ সবাইকে খাওয়াচ্ছে। শুধু নিজেরাই অবশ্য, বাইরের বলতে একমাত্র মার্কাস। টেবিল বুক্ করা হয়েছে একটা নামজাদা হোটেলে। সবাই মিলে ওখানে জড়ো হবার কথা। কুমার বললে, যদি সাতটার মধ্যে না এসে পৌঁছতে পারে তো, ওরা দুজনে সোজা হোটেলে চলে যাবে।

তাই হোল। কৃষ্ণাদের দেরি দেখে ওরা রওনা হয়ে গেল। মার্কাসের গলায় রমলার হাতের তৈরি একটা মাফলার। বোনা রমলার আসে না, নিজের স্বামীর জন্যেও কখনও বোনেনি। শুধু পার্থকে মাঝে মাঝে বুনে দিত, সেও মাপে ছোট বলেই। এবারে অনেক চেষ্টায় একদিনের যত্নে এই মাফলারটা বুনেছে রমলা। দেখতে বেশ ভালোই মনে হয়েছে রমলার।

মার্কাস বলেছিলো,—"কি দরকার, যা ভালো লাগে না তা কষ্ট করে করবার?"

রমলা বললে,—"দরকার আছে বই কী। একটা কিছু দিয়ে গেলাম। কালের ছিন্নপত্রে আঁকাবাঁকা একটা তুচ্ছ স্বাক্ষর। জানো মার্কাস, আমার কি মনে হচ্ছে?" রমলা হেসে উঠল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনেকদিন পরে, তোমার মেয়ে পুরোনো কাপড়ের ভিতর থেকে এই মাফলারটা টেনে বার করে, তার পুতুলের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার জন্যে তার মাকে ব্যতিব্যস্ত করবে। আর সেখানে দিয়ে যেতে যেতে,—দেখতে পেয়ে তুমি হেসে বলবে—"ব্যাপার কী?" মাফলারটা দেখে তুমি একটু হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে যাবে! কে যেন ওটা দিয়েছিল,—কবে, হঠাৎ মনে পড়বে না তোমার, মেয়ে আবদার করবে, 'ছাখো বাবা, মা বলছে, এটা নাকি তোমার কোন বন্ধুর দেওয়া; আর তাই ওটা দামী; কিন্তু এখন তো এটা ছেঁড়া।' তখন তোমার মনে পড়বে,—তুমি নিঃশ্বাস ফেলে বলবে,—হ্যাঁ, এখন ওটা ছিঁড়ে গেছে, তুমি নিয়ে খেলতে পার।"

মার্কাসের চোখ জলে উঠল। বললে,—"তোমরা ভারতীয়েরা সবাই কবি? না?"

"বোধ হয়," রমলা হাসবার চেষ্টা করল,—"প্রাণে কবিত্ব না থাকলে কি এই দুর্গতির মধ্যে প্রাণ টিঁকত? অবশ্য সে একরকম হয়ত ভালোই হোত; একেবারে মরে গিয়ে জন্মান্তর ঘটত। এই না বাঁচা না মরা ক্লোরোফরমড্ জীবনের চাইতে সে ভালোই হোত।" অনেক স্নেহে মার্কাসের মন দুলে উঠল। ইচ্ছে হোল ওর পাতলা শাড়ির আঁচল ঢাকা কাঁধটা একটু নেড়ে দেয়। ওর মুখের উপরে জন্মের শোধ প্রীতির নিবিড় চিহ্ন এঁকে দেয়। কিন্তু সে দূরের কথা। ওকে যখন তখন আপনজনের মত ছুঁতেই সাহস হয় না। যতই কাছাকাছি আসুক, যতই আপনার হোক, তবু যেন ওর চারিদিকে সব সময়েই একটা দূরত্বের গণ্ডীটানা আছে। মার্কাস হেসে বললে,—"তোমার দেশভক্তির নমুনাটা খবরের কাগজে লিখে পাঠালে কেমন হয়?"

—"মন্দ কী?" ক্লান্ত গলায় রমলা বললে,—"কিন্তু কোন লাভ হবে না।"

হোটেলে পৌঁছে ওরা দেখল কৃষ্ণা ও কুমার আগেই পৌঁছেচে। কৃষ্ণার কোটের ইতিহাস মার্কাস আগেই শুনেছিল। এখন ওর গায়ের নতুন

কোটের দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপে হাসল। কৃষ্ণার মুখ লাল হয়ে উঠল। মার্কাস বললে,—"কন্‌গ্র্যাচুলেসনস্ কুমার"! ওর সঙ্গে কুমারের এই প্রথম দেখা। মার্কাস দেখল,—কুমার বদলেছে। ঠিক কিভাবে কোথায় বদলেছে বুঝতে পারল না মার্কাস। কিন্তু বদলেছে অনেক।

খেতে বসে মার্কাস হঠাৎ বললে,—"মেরীকে মনে আছে কুমার?" মার্কাস জানত, এ সভায় মেরীর কথা কেউ জানে না। তাই ও ধরে নিয়েছিল সবাই ভাববে মেরী ওদের একজন সাধারণ বন্ধু। এক মুহূর্তে কুমারের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। "মেরী? সে তো বিয়ে করেছে, জানো না?" কৃষ্ণার মুখটা শুকিয়ে গেল এক নিমিষে। কুমার এমন চম্‌কে উঠল কেন? "মেরী বিয়ে করেছে, এমনভাবে বলল, যেন, ওটা খবর নয়,—কৈফিয়ৎ। কৈফিয়ৎই তো! ভাগ্যে মেরী বিয়ে করেছে। নইলে কুমার বিয়ে করতে পারত না।

"কে মেরী?—আমাদের মেরী নয় তো?"

—"তোমার মেরী কে তা তো জানি না মিঃ রায়,—এ মেরী আমাদের বন্ধু।" মার্কাস বললে,—"বছর দেড়েক আগে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল।" "আঃ বাঁচিয়েছে মার্কাস।"—ওকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল কুমার। "তারপর?"—মামাবাবু প্রশ্ন করলেন,—নেহাত সোজাসুজি প্রশ্ন। "তারপর?" কৃষ্ণার মনে হোল সোজাসুজি প্রশ্নটা দাদুর ভান। ওর মধ্যে দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আঃ ঈশ্বর, ঈশ্বর। মামাবাবু যেন জানতে না পারে! না না,—সে বড় লজ্জার হবে;—মামাবাবু জানুক, বিশ্বসুদ্ধ সবাই জানুক, কুমার একমাত্র কৃষ্ণাকেই ভালোবেসেছে। আর কাউকেই কোনদিনই নয়। "তারপর, আর কী?" মার্কাস বললে,—"হঠাৎ সেদিন দেখা। সন্ধ্যেবেলায় কে যেন 'নক' করছে,—খুলে দেখি মেরী!" কুমারের বিবর্ণ মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। এক লহমায় কৃষ্ণার দিকে তাকাতেই দৃষ্টি মিলল। কৃষ্ণাও যে ওরি দিকে চেয়ে আছে। মার্কাস ভাবতে পারেনি যে, মেরীর কথা কৃষ্ণাকে বলেছে কুমার। মার্কাস বলে চলল,—"মেরী বললে যে, সে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে সাউথ আফ্রিকায় পাড়ি দেবে বলে ঠিক করেছিল,—কিন্তু ভাগ্যচক্র তাকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে গেছে।" মার্কাস হেসে বললে, "সে এক ভারতীয়ের প্রেমে বিফল হয়ে, সাউথ আফ্রিকায় যাচ্ছিল, শেষে এক ইংরেজকে বিয়ে করে ভারতেই গেল—মজার নয় কী?"

রমলা হেসে বলল,—"তবে আবার এল যে? সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে নাকি?"

"না না, সে স্বামী পাঁচহাজার টাকা মাইনে পায়। ফস্ করে তার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসবে, এত বোকা সাধারণতঃ মেয়েরা হয় না। ও এসেছে home-এ বেড়িয়ে, আর ওর প্রথমপক্ষের ছেলেকে দেখে যেতে। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল,—জানো কুমার?"—স্যুপ খেতে গিয়ে বিষম খেলো কৃষ্ণা। সেদিকে চেয়ে ওর পিঠে হাত রাখলেন মামাবাবু। বললেন,—"আহা ষাট্‌, ধীরে ধীরে খাও।"

রমলা বললে,—"আমার মনে হচ্ছে,—এ সেই কৃষ্ণার মেরী।"

"কৃষ্ণার মেরী?" কুমারের বিস্মিত গলা থমকে গেল,—কৃষ্ণা চোখ না তুলেই রুটির টুকরো কাটতে কাটতে বললে,—"হতে পারে।"

—"আহা, কালই নাহয় সন্দেহ ভঞ্জন কোর।" রমলা বললে।

—"কেন?" মার্কাস আর কুমার একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

রমলা বললে,"কৃষ্ণার মেরী কাল আমাদের সঙ্গে একজাহাজে বম্বে যাচ্ছে। সেও ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল,—তার স্বামীও পাঁচহাজার টাকা মাইনে পায়।"

শুনে কুমার কৃষ্ণার দিকে বারবার তাকালো, কিন্তু কৃষ্ণা চোখ তুলল না।

সেদিন খাওয়াটা আর কিছুতেই জমল না,—রমলার এমনিতেই মন খারাপ হয়েছিল; পার্থের জোর করে ডেকে আনা কৃত্রিম উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়ল। মার্কাসের হাসিও ধীরে ধীরে গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবে গেল। শুধু কৃষ্ণার ঠোঁটে লেগে রইল তার রেশ। ও কিছুতেই কাউকে জানতে দেবে না,—যে ও কিছু জেনেছে।

কিন্তু কুমারকে জানতে দিতেই হোল,—রাতে যে যার ঘরে শুতে চলে যেতেই কুমার গিয়ে রমলার ঘরে টোকা দিল।

—"কৃষ্ণা কি শুয়ে পড়েছে, একটু ডেকে দাও না রমলা।"

দরজার বাইরে মুখ বার করে ঈষৎ রাগের ভান করে কৃষ্ণা বলল,—"ব্যাপার কী?" কুমার ওর হাত ধরে টেনে আনল,—ঘরের বাইরে, সিঁড়ির কাছে, কাঁচের জানালার কাছে টেনে এনে বলল,—"কৃষ্ণা!" ক্ষীণ স্বরে কৃষ্ণা বলল—"কি?" "এ সব কী?" কৃষ্ণা চুপ করে রইল,—

"মেরীই তাহলে তোমার pleasant surprise?" কৃষ্ণা চুপ। "সত্যিই তাহলে আমাকে পরীক্ষা করবে ভেবেছিলে?" "ক্ষমা কর কুমার,—সত্যিই তাই,"—চাপা স্বরে কৃষ্ণা বললে।

"এই জন্যেই বুঝি গেলে না?" কুমার বললে, "অর্থাৎ তোমার পরীক্ষা নয়,—আমার পরীক্ষা?" কৃষ্ণার চোখে জল ভরে এল। ও নির্বাক হয়ে কুমারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলতে চাইলো,—'দোষ করেছি কুমার, শাস্তি আমার পাওনা।' কিন্তু পারল না। কুমার বলল,—"কী পরীক্ষা করবে? কি জানতে চাও? মেরীকে এখনো ভালোবাসি কিনা?" কৃষ্ণার দুরন্ত ইচ্ছে হোল, কুমারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেয়,—মেরীর নাম ওকে উচ্চারণ করতে না দেয়। কিন্তু তার বদলে নিজের মুখে হাত চাপা দিল কৃষ্ণা, কানে নয়। আর কুমারের মুখে মেরীর নাম ওর কানের মধ্যে দিয়ে জলন্ত আগুনের মত প্রবেশ করল। শিউরে উঠে কৃষ্ণা ভাবল,—এ কী হাল হয়েছে তার মনের! ঈর্ষ্যার একি রূপ! এ যে দিন দিন বেড়েই চলল।

কুমার বললে—"সত্যি কথা শুনতে চাও কৃষ্ণা? সাহস থাকে তো শোনো,—পরীক্ষার দরকার নেই। মেরীকে আমি এখনো ভালোবাসি।"

অনেকদিন পরে কৃষ্ণা-কুমারের এই নতুন নাটক রমলার মনের মধ্যে ছেলেমানুষী খুশীর ঢেউ তুলেছে। রমলা কৌতুকভরে, চুপি চুপি পা টিপে টিপে এসে, বসবার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল,—কৃষ্ণা ঊর্ধ্বমুখে কুমারের দিকে চেয়ে আছে,—আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে মুখ। চোরের মত পা টিপে টিপে ফিরে এল রমলা। কৃষ্ণার জন্যে মমতায় বুকের একটা কোণ টন্ টন্ করতে লাগল। বেদনার ভোগে সেই মুহূর্তে কৃষ্ণা যেন তার সমান পদবীতে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমলা ভাবল,—সব গোলাপেই কাঁটা আছে।

কুমার বলল,—"মেরীকে আমি এখনো নিশ্চয়ই ভালোবাসি। ও সুখে থাক তাই চাই। ওর কষ্ট দেখলে, এখনো নিশ্চিত ওকে সাহায্য করতে ছুটব। তোমার বাধা মানব না।" কৃষ্ণা বলতে গেল,—'আমিই বা বাধা দেব কেন?' কিন্তু অবান্তর কথাটা মুখ থেকে ফোটার আগেই মন থেকে ঝরে পড়ল। কুমার বললে,—"কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে মেরীর আর স্থান

নেই। ও আর আমার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারবে না, অর্থাৎ আমার জন্যে ওকে আর একবারও চাই না,—চাই না ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ঘনিষ্ঠতা করতে। আমার বাঁচার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে,—আমার জীবনের নতুন পথে সঙ্গের জন্যে এক মাস ধরে তোমাকেই আমি মনে মনে চেয়েছি।"

—"কুমার, কুমার, কুমার!"

—"কৃষ্ণা, জানিনা তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত পাবো কিনা। হয়ত মেরীর মতই তুমিও একদিন সরে যাবে আমার পথ থেকে। তখন নতুন সঙ্গের জন্যে আবার হয়ত আমাকে ঘুরতে হবে।"

—"না না, কুমার!"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণা,—আমি সাধারণ মানুষ। আমি বাঁচতে চাই। মৃত ভালোবাসার বোঝা বওয়া আমার সাধ্য নয়। মেরী যখন রাগ করে চলে গিয়েছিল,—ওকে কিছুতেই খুঁজে পাই নি,—তখন ওর জন্যে একটা তীব্র আকুলতা ছিল। কিন্তু যেদিন শুনলাম,—ও বিয়ে করেছে,—বেশ বড়লোক স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে,—সেদিন থেকে ও খুব দ্রুত সরে যেতে লাগল আমার মন থেকে। আমি আবার বলছি, কৃষ্ণা, আমি সাধারণ মানুষ; ভালোবাসার সূক্ষ্ম কোন দিক নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা-টাধনা আমি বুঝি না। আমার কাছে ভালোবাসার একটা সম্পূর্ণ রূপ আছে। দেহ, মন, আত্মা কোনটাই তাতে বাদ দেওয়া যায় না।"

কৃষ্ণার ইচ্ছে হোল, চেঁচিয়ে বলে,—'আমিও সাধারণ মেয়ে কুমার। ভালোবাসার জন্যে আমার আন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে আছে।' কিন্তু তা না বলে কৃষ্ণা শুধু বললে,—"কুমার! কুমার, আর বোল না!"

—"কি?" কুমার পূর্ণ চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে দেখল, জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে। কুমার ওর মুখ দুহাতে ভরে নিল।

কৃষ্ণা বলল,—"আর বোল না, কুমার, আর বোল না। তুমি যাকে যত খুশী ভালোবাসো, আমি জানতে চাই না। শুধু আমাকেও একটু ভালোবেসো, একটু দয়া"—

—"ওঃ! কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, বেবী—একেবারে সেকেলে মেয়ের মত কথা বলছ।"

কৃষ্ণার মন বলল,—'বাঃ তুমি সেকেলে ছেলেদের মত কাজ করছ যখন, আমার সেকেলে মেয়ে হওয়া ছাড়া উপায় কী?' কিন্তু কান্নার আবেগে ওর গলা বুজে এল। ও কিছুই বলতে পারল না।

"আ,—কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা,"—ওর মুখ আরো কাছে টেনে নিল কুমার। চোখে মিলল চোখ।

তেমনি চোখ চোখে মেলা রইল সাউদাম্পটন জাহাজের ঘাটে। জাহাজে উঠতে উঠতে দুপুর গড়িয়ে গেল। জাহাজ ছাড়ল সন্ধ্যাবেলায়। ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কুমার চোখ মেলে দিল সেইখানে, যেখানে ওপারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা। মেরী এসে দাঁড়াল কুমারের পাশে। কৃষ্ণা অবাক হয়ে দেখল,—ভয় পেল না মনে মনে। না না, কৃষ্ণার আর ভয় নেই। ভালো থেকো কুমার। তোমরা ভালোয় ভালোয় পৌছে যাও। "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ," মনে মনে এই মঙ্গল মন্ত্র উচ্চারণ করল কৃষ্ণা। মনের ভিতর থেকে আর একটা মন গুঞ্জন করে উঠল—'আর মাত্র একটা বছর।'

পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে পার্থ নিজের কান্না থামাচ্ছে। রমলার দৃষ্টি পার্থকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় চলে গেছে, ভালো করে বুঝতে পারল না মার্কাস। "আর মাত্র আট বছর। মা, তারপরে তোমায় দেখব," পার্থ গুনগুন করে বললে,—"মাত্র আট বছর।"

—"মাত্র একবছর!" কৃষ্ণা বললে মনে মনে।

"মাত্র একটা জীবন!" চাপাস্বরে হেসে উঠল মার্কাস,—"মাত্র একটা ছোট জীবন।"